মণি বাগচি

নিবেদিতা

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী • কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭



প্রচ্ছদপটে নিবেদিতার
প্রিয় প্রতীক ইন্দ্রের বজ্র।

শিল্পী শ্রীকান্তি সেন

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. কর্তৃক, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী,
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ৪১ গড়িয়াহাট রোডের শ্রীজগদীশ প্রেসে
শ্রীঅজিতচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

মানব-প্রেমিক বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বোপরি ভারত-প্রেমিক, আর তাঁর সেই ভারত-প্রেম ভারতের অতীতের গৌরব রোমন্থনের নামান্তর ছিল না, অর্থাৎ তাঁর ভারত-প্রেম নির্বীর্য ক্লীব ভীরু ভাব-বিলাস ছিল না। সমকালীন ভারতের দুর্দশা, তার পরাধীনতা, তার লাঞ্ছনা স্বামী বিবেকানন্দকে পাগল করে দিয়েছিল বেদনায়। তাঁর দুর্জয় পৌরুষ, অসামান্য আত্মিক শক্তি, অতুলনীয় ধী-শক্তি সব কিছু তিনি নিবেদন করেছিলেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে। রাজনৈতিক পরাধীনতার দুর্বিসহ অপমান ও হীনতাকে উপেক্ষা করে, কিংবা তাকে দূর করবার চেষ্টা না করে একান্তে নিভৃতে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করবার মতো কাপুরুষ ছিলেন না বিবেকানন্দ। তাঁর সাধনার প্রাণবায়ু ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি, সে-মুক্তি শুধু ধ্যানধারণার দ্বারা ব্যক্তির উপলব্ধিমূলক মুক্তি নয়, সে-মুক্তি জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি।

নিবেদিতার জীবনে যে তাঁর গুরুদেবের রাজনৈতিক সত্তার প্রবল ছাপ পড়বে, সেটি সহজেই অনুমেয়। কেল্টিক রক্ত নিবেদিতার দেহে ছিল প্রবাহিত, ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর জাতিগত সংস্কার। জাতীয় মুক্তিকে আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেখা যেমন সম্ভব ছিল না বিবেকানন্দের পক্ষে, তেমনি সম্ভব ছিল না নিবেদিতার পক্ষে। প্রখরবুদ্ধিশালিনী নিবেদিতা স্বামীজির বক্তৃতা শুনলেন লণ্ডনে, প্রশ্নও তুললেন, নির্বিচারে মেনে নিলেন না তাঁর মত। যখন শুনলেন বিবেকানন্দের মুখে বুদ্ধদেবের সেই অমৃতবাণী, তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা যে, যতদিন জগতের প্রতিটি জীব মুক্ত না হয়, ততদিন তিনি কর্ম থেকে বিরত থাকবেন না, পরিনির্বাণ গ্রহণ করবেন না; যখন বুঝলেন যে, এই সন্ন্যাসীও ভগবান বুদ্ধের সেই পথেরই অনুগামী; যখন শুনলেন রামমোহনকে স্বামীজি "নব্যভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি" বলে ঘোষণা করেছেন; যখন পেলেন বিবেকানন্দের চিঠি—"আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য,

বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো, মহাপ্রাণ। জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তোমার নিদ্রা যাইবার অবসর কোথায়?"—তখন তিনি আত্মসমর্পণ করলেন এই গুরুর কাছে। বৈদান্তিক ধারণার এমন এক অটল ভূমিতে এই গুরু তাঁর শিষ্যার মনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন যেখান থেকে একান্ত বন্ধন-বিহীন মন নিয়ে জীবনকে দেখা সম্ভব। এমন কি, গুরুগিরির অহমিকা থেকেও নিবেদিতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের কল্যাণের জন্যে নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন—"যদি আমার নিজের কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমাশক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।"

সত্তার শিখর থেকে উচ্চারিত এমন মহোত্তম বাণী ক'বারই বা উচ্চারিত হয়েছে এই পৃথিবীতে, ক'জন শিষ্যের সৌভাগ্য হয়েছে গুরুর মুখ থেকে বিশ্ব-কল্যাণের জন্যে শিষ্যকে নৈবেদ্য দেবার এমন সত্যবাণী শোনবার?

ভারতবর্ষকে নিবেদিতা প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। যা কিছু দেখেছিলেন সবই তিনি তাঁর ভালোবাসার আলোকে অপরূপ রূপে দেখেছিলেন। প্রতিটি সংস্কার, প্রতিটি আচার আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্ময় রূপ গ্রহণ করেছিল তাঁর গভীর প্রেম-দৃষ্টির সম্মুখে। নিবেদিতার মত এমন করে ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে খুব কম লোকই পেরেছেন। ভারতবর্ষের অপমানের জন্যে এমন করে জ্বলে পুড়ে মরা, এমন গভীর বেদনাবোধ, ভারতীয়দের আত্ম-অবিশ্বাস ঘোচাবার জন্যে এমন ব্যাকুলতা, ভারতের সাধনার মহত্বকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এমন প্রাণ-ঢালা পরিশ্রম ক'জনাই বা করেছেন? শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় শিল্পধারার নবযুগ প্রবর্তন করলেন, তখন বিশ্বের দরবারে সেই বার্তা পৌঁছে দেবার ভার নিলেন নিবেদিতা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি উৎসাহ দিলেন তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মত-বিরোধ সত্ত্বেও ভারতের মুক্তির জন্যে একান্ত-আত্মনিবেদনের দ্বারা রবীন্দ্র-নাথের গভীর শ্রদ্ধা লাভ করলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিলেন

তিনি। ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্যে অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, পি. মিত্র, সতীশ মুখোপাধ্যায়—এই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিবেদিতা গুপ্ত সমিতির পরিচালনার ভার নেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা তাঁকে ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলন থেকে এক নিমেষের জন্যেও সরিয়ে নিতে পারে নি। এই কাজ তাঁর গুরুর কাজ বলে তিনি ঘোষণা করলেন। মিশন তাঁকে ত্যাগ করলেন বটে, ভারতবর্ষ কিন্তু তার এই সেবিকাকে বুকে টেনে নিলো।

মহৎকে ভোলাই হোলো সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য—ব্যক্তির ও জাতির পক্ষে। নিবেদিতাকে আমরা ভুলেছি। তাঁকে শুধু একটি 'নাম' হিসেবে স্মরণ করে রেখেছি। তিনি যে কি ছিলেন, কি করেছেন আমাদের দেশের জন্যে তার কোনো ধারণাই বেশী ভাগ লোকের নেই। মণি বাগচির লেখা 'নিবেদিতা' সেই লজ্জা থেকে আমাদের ত্রাণ করবে, এই ভারত-সেবিকার জীবনী ভারতের নিপীড়িত জনগণের সেবায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে।

মণি বাগচি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদিতার জীবন-শতদলের প্রতিটি পাপড়ির রঙ ও রূপ আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। অধিকাংশ স্থলে ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃত করে কিম্বা সংগোপন করে ভক্তির পাত্রকে নিখুঁত মানুষ হিসেবে দেখাবার চেষ্টা হয় ভক্তির আতিশয্যে। সত্যই আনন্দের কথা যে, মণি বাগচি কোথাও এই ভক্তি-আবিলতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। নিবেদিতার ব্যক্তিত্বের সব দিক তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ইতিহাস কোথাও ভক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হয়নি। এই বই বাঙালির ঘরে ঘরে স্থান লাভ করুক। এই মহীয়সী নারীর জীবনী আমাদের নিশ্চয়ই সহায়তা করবে মানব-প্রেমের ও নিষ্কাম কর্মের অপরাজেয় শক্তি উপলব্ধি করতে।

পয়লা আশ্বিন, ১৩৬২

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ এক ॥

লণ্ডন।

জড়বাদী য়ুরোপীয় সভ্যতার নবীন পীঠস্থান লণ্ডন।

জ্ঞানের সাধক, বিজ্ঞানের সাধক, শক্তির সাধক, ক্ষিপ্রকার্যকুশল পাশ্চাত্ত্যের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডন।

সেই লণ্ডনে আসিয়াছেন এক হিন্দু যোগী। অসাধারণ বীর্যবান পুরুষ।

দেবদূতের মতন সুন্দর সৌম্য উজ্জ্বল মূর্তি এক যুবক সন্ন্যাসী। অদ্বৈত-বেদান্তের সিংহনাদ তাঁহার কণ্ঠে।

অতলান্তিকের পরপারে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় বেদান্তের মহিমা প্রচার করিয়া, অবশেষে এই সন্ন্যাসী আসিলেন য়ুরোপে মিস্ হেনরিয়েটা মূলার ও ইংরেজ-বন্ধু মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডির সাদর নিমন্ত্রণে। ইহা ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসের কথা।

ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিজিত জাতির এই প্রচারককে জানাইল সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা। শীঘ্রই তাঁহার যশোগানে ইংলণ্ডের আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল। চারিদিকে হিন্দুযোগীর নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। ক্রমে এই হিন্দুযোগীকে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে লোকের আগ্রহের সীমা নাই। তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে সকলেই ব্যগ্র। তাঁহার বক্তৃতা ও ধর্মোপদেশ শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ।

২২শে অক্টোবর। স্থান; পিকাডিলির 'প্রিন্সেস হল'। সময়ঃ অপরাহ্ণ। আজ এইখানে সেই হিন্দুযোগী প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিবেন। লণ্ডনের বহু চিন্তাশীল লোকের আজ এইখানে সমাগম হইয়াছে। লেডি ইসাবেল মার্গসন প্রমুখ অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক মহিলাও উপস্থিত। লণ্ডনে এমন দৃশ্য বিরল। সেই শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন এক তরুণী। বিদুষী, সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী এই তরুণীর সর্বদেহে উদ্ভাসিত প্রখর ব্যক্তিত্ব। তাঁহার এক বান্ধবীর কাছে তিনি লণ্ডনে নবাগত এই হিন্দুযোগীর কথা শুনিয়াছেন এবং কতকটা কৌতূহলভরেই আজ শীতের এই অপরাহ্ণে, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে এইখানে আসিয়াছেন। নিরুদ্ধ আগ্রহে শ্রোতারা বসিয়া আছেন। যথাসময়ে সেই হিন্দু-যোগী আসিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইলেন। সকলের দৃষ্টি অমনি তাঁহার উপর গিয়া নিবদ্ধ হইল। তরুণীও চাহিয়া দেখিলেন। দেখিবার মতন আকৃতি। শরীরের রঙ গৌরবর্ণ। মুখটি ফুটন্ত পদ্মের মত সুশ্রী। সেই মুখ হইতে গাম্ভীর্য ও প্রফুল্লতার লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে। স্নিগ্ধোজ্জ্বল ললাট। চক্ষু দুইটি দীর্ঘ ও আয়ত। পদ্ম-ফুলের পাঁপড়ি যেন। সেই চক্ষের দৃষ্টি আনন্দস্নাত। সমস্ত মুখখানিতে উদ্ভাসিত তপস্যা, পবিত্রতা ও সংযমের জ্যোতি ও সৌন্দর্য। চক্ষু, নাসিকা ও মুখের গঠন পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি এবং প্রতিভা-ব্যঞ্জক। মস্তকে গৈরিক রঙের পাগড়ী, সন্ন্যাসীর সর্বদেহে গৈরিক রঙের সুন্দর একটি লম্বা জামা। যেন অভ্রভেদী হিমালয়ের উচ্চ শিখরে অরুণদীপ্ত তুষারের সজ্জা। আয়ত চক্ষু দুইটি হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে তেজ ও আকর্ষিণী শক্তি। এমন দেদীপ্যমান মূর্তি, এমন দৃপ্ত পৌরুষ-মণ্ডিত রূপ তরুণী কখনো দেখেন নাই। তাঁহার মনে হইল, সেই গৈরিকবাসের অন্তরাল হইতে যেন এক সঙ্গে কার্লাইল ও নেপোলিয়ঁ উঁকি মারিলেন।

বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আত্মজ্ঞান। বক্তৃতা আরম্ভ হইল। মধুর, গম্ভীর স্বর। কী চমৎকার সন্ন্যাসীর কথাগুলি। তত্ত্ব ও তথ্যের কী আশ্চর্য বর্ণনা ও ব্যাখ্যান। এমন কণ্ঠস্বর তরুণী কখনো শোনেন নাই। এমন কুশাগ্র বুদ্ধির দীপ্তি কখনো দেখেন নাই।

"শিবোঽহম্" "শিবোঽহম্"।

বক্তৃতার মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে যখনই এই সুমধুর শব্দ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, তখনই শ্রোতারা উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেছেন। মেঘের মত গুরুগম্ভীর সেই কণ্ঠস্বর। ভাষা যেমন ওজস্বী তেমনি স্বচ্ছ ও গতিশীল আর তেমনি ছন্দের ভঙ্গিতে আশ্চর্য সব শব্দের সমাবেশে সরল ও কবিত্বময়। আর সব শ্রোতার মত তরুণীরও মনে হইল, ধর্মের শুষ্ক উপদেশ ত নয়—এ যেন সমুদ্রের তরঙ্গের সফেন নৃত্যময়ী গতি। আর কী আশ্চর্য যুক্তি, কী আশ্চর্য মনীষা, কী জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ছটা। আর কী প্রচণ্ড শক্তি সেই কথার—কানের ভিতর দিয়া একেবারে মর্মে পৌঁছায়—শ্রোতার মনকে কোন্ এক সুদূর অজানিত আনন্দের শান্তির লোকে লইয়া যায়। এমন অভিজ্ঞতা তরুণীর জীবনে এই প্রথম।

জলপ্রপাতের মত সন্ন্যাসীর কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছে অবিরাম বক্তৃতার ধারা। কথার ফাঁকে ফাঁকে উচ্চারিত হইতেছে সুমধুর সংস্কৃত শ্লোক। শ্রোতারা সকলেই মুগ্ধ—উৎকর্ণ। শুনিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেহমন পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।
যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আশৈশব ধর্মে আস্থা ছিল বলিয়াই হউক কিংবা বিশ্বাসপ্রবণ-চিত্ত বলিয়া হউক, শীতের সেই অপরাহ্ণে অপরিচিত এই হিন্দুযোগীর বক্তৃতা সেই তরুণীর মনে ও চিন্তায় এক গভীর রেখাপাত করিল।

এই হিন্দুযোগী স্বামী বিবেকানন্দ।

এই তরুণী মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্।

পরবর্তিকালে ইনিই ভগিনী নিবেদিতা।

এই নিবেদিতার কথাই আমরা বলিতেছি।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের টাইরন অঞ্চলের ডাংগানন শহর। এই শহরের নোবল্-পরিবারের মেয়ে এই মার্গারেট। ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর তাঁহার জন্ম। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বহুকাল আগেই স্কটল্যাণ্ড হইতে এইখানে আসিয়া বসবাস করেন। আয়াল্যাণ্ডের সুদীর্ঘ ইতিহাসে টাইরন হইতে একাধিক নেতা ও বিপ্লবী নায়কের অবির্ভাব ঘটিয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে টাইরনের বহু বীর রক্তদান করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়াছেন। সেই সব জাতীয়তাবাদী আইরিশ বীরের নামের তালিকায় কুমারী মার্গারেট নোবলের পিতামহ রেভারেণ্ড নোবলের নামও আছে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে যে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি ও উগ্র দেশাত্মবোধ এই রেভারেণ্ড নোবলের ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে পৌত্রী মার্গারেট তাহার সবটাই লাভ করিয়াছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের আকাশে-বাতাসে যখন মুক্তির হাওয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, সেই আগ্নেয় পরিবেশের মধ্যেই মার্গারেটের জন্ম। তাঁহার ধমনীতেও তাই বিপ্লবের অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইত এবং জীবনের আরম্ভেই বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ পথে তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ।

পিতা—স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল্‌; মায়ের নাম—মেরী হ্যামিলটন নোবল্‌। মেরীর ডাকনাম ছিল ইসাবেল। ইসাবেল পরমাসুন্দরী। মার্গারেট তাঁহার প্রথম সন্তান। মায়ের রূপলাবণ্য লইয়াই মেয়ের জন্ম। ইসাবেল যখন গর্ভবতী তখন তাঁহার বয়স ছিল অল্প। প্রথম মা হওয়ার আনন্দ ও ভয় দুই-ই ছিল ইসাবেলের। আসন্ন মাতৃত্বের স্নেহাতুর প্রতীক্ষা লইয়া সর্বদাই তিনি ভগবানের কাছে সমস্ত অন্তর দিয়া এই প্রার্থনা করিতেন: "প্রভু, যদি নিরাপদে আমার সন্তানের জন্ম হয়, তাহা হইলে তোমার কাজেই আমি তাহাকে সমর্পণ করিব।" নারী-জীবনের পরম কাম্য মাতৃত্ব। মা সবই পারে, পারে না শুধু সন্তানের মায়া কাটাইতে। সন্তানের মুখ দেখিবার পূর্বেই ইসাবেল তাহাকে দেবতার চরণে আন্তরিক ভাবে নিবেদন করিলেন। গর্ভাবস্থায় মায়ের মনোভাব গর্ভস্থ সন্তানের উপর ক্রিয়া করে। আজ কে বলিবে, অন্তঃস্বত্বা নোবল্‌-গৃহিণীর গর্ভে যে ভবিষ্য মহাজীবনটি পুষ্টিলাভ করিতেছিল, জননীর মনোভাবের দ্বারা তাহা কতটুকু প্রভাবিত হইয়াছিল? আজ কে বলিবে, যে-নামটি পরবর্তি-কালে কুমারী মার্গারেটের জীবনে চরমভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল, সেই নিবেদিতা-নামটি দিবার প্রেরণা তাঁহার গুরুদেব কোথায় পাইয়াছিলেন? মার্গারেট ও তাহার পর আর একটি কন্যার জন্মের কিছুকাল পরেই রেভারেণ্ড স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল্‌ ১৮৭৩ সালের কাছাকাছি ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। মার্গারেটের পিতা তাঁহার পিতার মতনই প্রোটেস্ট্যান্ট শ্রেণীর ধর্মযাজক ছিলেন এবং তাঁহার পিতার মত তিনিও আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি আন্দোলনে পার্নেলের নেতৃত্বে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বড় হইয়া মার্গারেট যখন আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রায় শতবর্ষব্যাপী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস পাঠ

করিলেন এবং ইংলণ্ডের শাসন ও শোষণের ফলে আইরিশদের শোচনীয় দারিদ্র্য ও দুর্গতির কথা জানিতে পারিলেন, তখন হইতেই তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে আইরিশ জাতীয়তার অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ করেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৮৭৯, ১৮৮০ ও ১৮৮১—এই তিনটি বৎসর বিশেষভাবে স্মরণীয়। চার্লর্স ষ্টুয়ার্ট পার্নেল ও মাইকেল ডেভিডের যুগ্ম নেতৃত্বে সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ড তখন বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী তখন গ্লাডষ্টোন। একদিকে আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা না দিবার জন্য গ্লাডষ্টোনের অনমনীয় মনোভাব ও স্বৈরাচারী শাসন, অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভের জন্য নব-জাগ্রত আইরিশ জাতির দুর্দমনীয় আকাঙ্খা—ইহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া পার্নেল 'হোমরুল' আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। সশস্ত্র বিপ্লব তখনো দূরে অপেক্ষা করিতেছে এবং সিন্ ফিন্ তখনো ইতিহাসের জঠরে। আয়ার্ল্যাণ্ডের এই 'হোমরূল' আন্দোলনে পিতা-পুত্রী দুইজনেই এক গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, আইরিশ বিপ্লবের মধ্যাহ্ন-কালেই মার্গারেটের ছাত্রী জীবনের আরম্ভ ও শেষ।

রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করিলেও, বিদুষী মার্গারেট এই সময়ে পার্নেলের স্বদেশপ্রেমে এতদূর উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, আয়ার্ল্যাণ্ডের এই সময়কার স্বাধীনতা-আন্দোলনে কোনো-না-কোনো বিষয়ে তিনি পরোক্ষে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লণ্ডনে থাকিয়া যতটুকু কাজ করিতে পারা যায়, তাহা তিনি নিরলস ভাবেই করিতেন।

১৮৯১ সালে পার্নেলের মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে আইরিশ জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক অধ্যায়ের শেষ হইয়া নূতন

অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। রাশিয়ার বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী পিটার ক্রোপোটকিন তখন লণ্ডনে। মার্গারেটের সহিত ক্রোপোটকিনের আলাপ-পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারই নিকটে রাশিয়ায় স্বৈরাচারী জারের বিরুদ্ধে রুষ জনগণের ধূমায়িত অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কাহিনী শুনিয়া মার্গারেট ভাবিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীন করিতে হইলে কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে হইবে না, সশস্ত্র বিপ্লব দরকার। পার্নেলের একটি কথা তখনো পর্যন্ত মার্গারেটের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত ছিল: "আমরা এমন একটি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি যে কেবল একটিমাত্র যুক্তি বুঝিতে পারে—ক্ষমতার যুক্তি।"

গ্লাডষ্টোনের পর লর্ড স্যালিসবারি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের মোড় ফিরিল। এই পর্বে আর্থার গ্রিফিথ প্রভৃতি চরমপন্থীগণের নেতৃত্বে আয়ার্ল্যাণ্ড সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইল। সবেমাত্র লণ্ডনে আইরিশ বিপ্লবের দুই একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং মার্গারেট নোবল্ ঐগুলির সংগঠন ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন, এমন সময়ে লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শুধু লণ্ডনে নয়, মার্গারেটের জীবনেও।

শৈশবে মার্গারেট তাঁহার ঠাকুরমায়ের কাছেই মানুষ হইয়াছিলেন। ঠাকুরমায়ের নামে নাম মিলাইয়াই তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল মার্গারেট এলিজাবেথ। ঠাকুরমায়ের বাগানঘেরা বাড়িটিতে বড় আনন্দেই মার্গারেটের শৈশবের দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছিল। মার্গারেট তাঁহার ঠাকুরমাকে দেবীর মতন ভালোবাসিতেন; তিনিও ছিলেন তাঁহার চক্ষের মণি। মার্গারেট ঠাকুরমাকে কখনো চক্ষের

আড়াল হইতে দিতেন না ; সব সময় তাঁহার পায়ে-প্যায়ে ঘুরিতেন। ঠাকুরমায়ের অতি প্রিয় ছিল বাইবেল—সুন্দর মরক্কো-চামড়ায় বাঁধানো একখানি বাইবেল ছিল বৃদ্ধার নিত্যপাঠ্য। সেই বাইবেল হইতে বর্ণ-পরিচয় হইয়াছিল মার্গারেটের ঠাকুরমায়ের কাছেই। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় বৃদ্ধা বাইবেলের ভজন অনুচ্চস্বরে গাহিতেন ; আদরের নাতনীর তাহাই শুনিয়া শুনিয়া মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল ; ঠাকুরমায়ের সঙ্গে সেই ভজনগুলি আওড়াইতে মার্গারেটের ক্লান্তি ছিল না। জীবনের প্রথম চার বছর মার্গারেট তাঁহার ঠাকুরমায়ের কাছে মানুষ হইয়াছিলেন। চার বছর বয়সেই সেণ্ট জনের 'সুসমাচার' মার্গারেটের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল—এমনি ছিল তাঁহার স্মরণশক্তি। চার বৎসর পরে মার্গারেটের পিতা তাঁহাকে ওল্ডহ্যামে লইয়া গেলেন। ওল্ডহ্যামে আসিবার পর একটু বড় হইলেই মার্গারেট ও তাঁহার ছোটবোনকে স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। মার্গারেটের যখন সাত বছর বয়স, তখন দেশ থেকে একদিন সংবাদ আসিল যে ঠাকুরমায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ঠাকুরমায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মার্গারেট এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেন না, কেবল বুকের ভিতরটা যেন পাথরের মত ভারী হইয়া রহিল। চার বৎসর পরে স্যামুয়েল ওল্ডহ্যাম ত্যাগ করিয়া আসিলেন ডেভনের গ্রেট টরেণ্টন্ গ্রামে। গ্রামের স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে আসিয়া মার্গারেটের মনে হইল তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন। মার্গারেটের বয়স এখন দশ বছর এবং এই অল্প বয়সেই পিতার প্রতি কন্যার ভক্তি দেখিয়া মেরী হ্যামিলটন পর্যন্ত মুগ্ধ হইতেন। বাহিরে বেড়ানো বা খেলাধূলা ছাড়িয়া মার্গারেট সর্বক্ষণের জন্য তাঁহার পিতার সঙ্গী হইয়া উঠিলেন। যখনই স্যামুয়েল গির্জায় ভাষণ দিতে যান, মার্গারেট চলেন সঙ্গে সঙ্গে। পিতার উপাসনায় বালিকা কন্যার মন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া

যাইত ; পিতার নিকট আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে মার্গারেট তন্ময় হইয়া যাইতেন। নির্জনে পিতার কথা বলিবার ধরণ-ধারণ পর্যন্ত মার্গারেট অনুকরণ করিতেন। কথায় জোর দিবার জন্য অল্প একটু মাথার ঝাঁকি দিতেন স্যামুয়েল, সেই ভঙ্গিটি পর্যন্ত মার্গারেটের রপ্ত হইয়া গেল। পিতার সহজ নেতৃত্বের ভাবটি নকল করিয়া মার্গারেট তাহা খাটাইতেন তাঁহার ছোট বোন আর স্কুলের সঙ্গীদের উপর। এই বয়স হইতেই তাঁহার স্বভাবে প্রকাশ পাইত একটু গর্বিত আর একরোখা ভাব।

মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে স্যামুয়েল পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন। ভারাক্রান্ত মন লইয়া দুই বোন—মার্গারেট আর মে—হ্যালিফ্যাক্সের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিলেন। এই স্কুলের বেশীর ভাগ ছাত্রীই তাঁহাদের মতন ধর্মযাজকের মেয়ে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস ল্যারেট। যেমন তাঁহার কঠিন শাসন, তেমনি সতর্ক দৃষ্টি ছাত্রীদের উপর। নীতিশিক্ষার উপর তাঁহার বেশী অনুরাগ ছিল। সকল ছাত্রীকেই তিনি সযত্নে শিক্ষা দিতেন দুইটি জিনিস—স্বার্থত্যাগ আর সংযম। স্বার্থত্যাগ আর সংযমের কঠিন পথেই গড়িয়া উঠিয়াছিল মার্গারেটের চরিত্র জীবনের প্রারম্ভেই। মিস ল্যারেট যেদিন নীতিশিক্ষার ক্লাসে ছাত্রীদের বলিলেন—'চরিত্রই মানুষের নিয়তি'—সেদিন হইতেই এই উপদেশটি মার্গারেটের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। ছাত্রীজীবনে তাই মার্গারেটের মনে মিস ল্যারেটের প্রভাব খুবই পড়িয়াছিল। মিস ল্যারেটও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন মার্গারেটের প্রতি—এই অল্প বয়সে এই ছাত্রীটির প্রতিভা ও মেধা, পাঠে মনোযোগ এবং কিছু জানিতে বা শিখিতে অনুরাগ ও আগ্রহ—তাঁহাকে স্বভাবতই প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর প্রিয়পাত্রী করিয়া তুলিয়াছিল। স্কুলে মার্গারেট আদর্শ

ছাত্রীর গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। তেরো বছরের মেয়ে মার্গারেটের চিন্তাশক্তি দেখিয়া তাঁহার সহপাঠিনীরা বিস্মিত হইত। বিস্মিত হইত তাঁহার স্বাধীন চিন্তা আর নিজস্ব মতামত গঠনের দুঃসাহস আর তাঁহার সহজ ব্যক্তিত্বের দ্যুতি দেখিয়া।

সাফল্যমণ্ডিত ছাত্রীজীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল মার্গারেটের কর্মজীবন। পিতা নাই, মা, বোন আর না-বালক ভাই—ইহাদের দায়িত্ব যে তাঁহার উপর—এই কথা মার্গারেট সেই বয়সেই উপলব্ধি করিলেন। অল্প চেষ্টার পর কেসউইকের একটি নামজাদা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইলেন মার্গারেট। তিন বছর পরে রাগবির এক অনাথ আশ্রমে তিনি কাজ লইলেন। উদ্দেশ্য, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়া তিনি দেখিবেন, তাঁহার আত্মত্যাগ আর বৈরাগ্যের জোর কতটুকু। এক বৎসর অনাথ আশ্রমে কাটাইয়া মার্গারেট রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে আবার শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইলেন। শিক্ষয়িত্রী হইয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করিবেন—ইহাই ছিল তাঁহার সংকল্প। এই সময় হইতেই মার্গারেটের মনে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কৌতূহল জাগিল। নব্য শিক্ষারীতির প্রবর্তক পেস্তালোৎসি আর ফ্রোয়েবেলের নাম শুনিলেন তিনি। শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রগতিবাদের জনক ইহারাই। শিশু-মনস্তত্ত্বকে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করেন ইঁহারাই। শিক্ষয়িত্রী মার্গারেটের সম্মুখে জাগিল একটি নূতন জগৎ। নবশিক্ষার এই দুই বিখ্যাত পুরোধা তাঁহাকে যেন পথ দেখাইয়া দিলেন। লিভারপুলে আসিয়া ফ্রোয়েবেলের শিষ্যা, মিসেস ডি-লীউ-এর সঙ্গে মার্গারেট আলাপ করিলেন এবং তাঁহার নিকট এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সযত্নে পাঠ গ্রহণ করিলেন। লিভারপুলে কিছুদিন কাটাইয়া মার্গারেট উইম্বল্‌ডনের একটি শিশু-বিদ্যালয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর চাকরী গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে

নবীন আশা আর বিশ্বাসে ঝলমল শিশুদের গড়িয়া তোলাই হইল মার্গারেটের জীবন-ব্রত। নিজের মুক্ত মনের প্রবেগ তিনি শিশুদের মনে সঞ্চারিত করিলেন সহজভাবেই। শিক্ষার সঙ্গে চলিত উপাসনা; শিশুদের মনে ধর্মপিপাসা জাগ্রত করিয়া দিতেন তিনি। উপাসনা আর প্রার্থনার ভিতর দিয়া তিনি শিশুদের নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিতেন। শিক্ষাব্রতী মার্গারেট অল্পদিনের মধ্যেই আদর্শ শিক্ষিকা হইয়া উঠিলেন। ফ্রোয়েবেল-পদ্ধতিতে তিনি পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। উইম্বলডনের ছোট্ট স্কুলটি মার্গারেটের জীবন আনন্দে ভরিয়া তুলিল। জীবনে এই প্রথম এমন কাজ পাইলেন, যাহার মধ্যে মার্গারেট তন্ময় হইয়া গেলেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লণ্ডনের 'আধুনিক শিক্ষা-সমিতির' প্রধান কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগ রাখিয়া চলিলেন এবং এই সমিতির বৈঠকে মার্গারেট মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন। এই সময় হইতেই তিনি লণ্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় রাজনীতি সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটি প্রবন্ধ লণ্ডনের বিদগ্ধমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

অবশেষে মার্গারেট লণ্ডনে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন এবং এইখানেই তিনি একদিন স্বদেশ হইতে নির্বাসিত বিদ্রোহী প্রিন্স পিটার্ ক্রোপোট্‌কিনের সহিত পরিচিত হইলেন এবং 'ফ্রী আয়র্ল্যাণ্ড' নামক বিদ্রোহী সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। উইম্বলডনে তিনি 'রাস্কিন স্কুল' নাম দিয়া একটি নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিলেন। মার্গারেটের স্কুলটি অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। লণ্ডনে আসিবার পর হইতে এখানকার বিদগ্ধসমাজ আয়ার্ল্যাণ্ডের দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্‌কে সাগ্রহে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করিয়া লইল। লণ্ডনের শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে লেডি রিপনের তখন খুব নাম। তাঁহার স্কুলের মধ্যে অন্যতম শিক্ষক

মিঃ এবেনজার কুকের মাধ্যমে মার্গারেট লেডি রিপনের সহিত পরিচিত হইলেন। লেডি রিপনের 'সেলুনে' মার্গারেটের আসা-যাওয়া নিয়মিত হইল। এখানে শিল্প ও সাহিত্য লইয়া আলোচনা হইত। প্রথমে এই 'সেলুনের' সভ্য-সভ্যা কমই ছিল। পরে মার্গারেট এবং 'সেণ্ট জেমস্ গেজেট'-এর সম্পাদক মিঃ ম্যাকনীলের চেষ্টায় অল্প-দিনেই লেডি রিপনের 'সেলুন' পরিণত হইল 'সিসেম ক্লাবে'। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৯৬) লণ্ডনের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ও আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এই 'সিসেম ক্লাব'। ডোভার স্ট্রীটের স্বনামধন্য পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটির বিভিন্ন বৈঠকে সমবেত হইতেন লণ্ডনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখকবৃন্দ। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন বার্ণার্ড শ ও হাক্সলী। এই ক্লাবেরই এক সম্মেলনে একদিন মার্গারেটের সঙ্গে লেডি ইসাবেল মার্গসনের দেখা হইল। শিশু-শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহারও খুব আগ্রহ ছিল। বিদ্যালয়ে, সমাজ-জীবনে এইভাবে মার্গারেট যখন প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার জীবনের পরিধির মধ্যে আসিয়া পড়িলেন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহারই জীবন-দেবতা—স্বামী বিবেকানন্দ।

২৩শে অক্টোবরের লণ্ডনের বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলিতে হিন্দুযোগীর বক্তৃতার বিবরণ বাহির হইল। প্রত্যেকটি কাগজের সমালোচনা মার্গারেট গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়িলেন। "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" লিখিয়াছেন: "রাজা রামমোহনের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনো ইংলণ্ডের বক্তৃতা-মঞ্চে দেখা যায় নাই।" প্রত্যেকটি সমালোচনাই তাঁহার বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছে। মার্গারেটও ঐ বক্তৃতার দার্শনিক যুক্তির নূতনত্বে

কম বিস্মিত হন নাই। তিনি বিদ্বান ও বিদুষীদিগের সংসর্গে বাস করিতেন এবং আধুনিক জগতের সর্বপ্রকার মতামত ও চিন্তা-প্রবাহের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল। হিন্দুযোগীর কথাগুলি তাঁহার নিকট নূতন ও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। সব কথা যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে এবং বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ তাৎপর্য যে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও নহে। তথাপি ঐগুলি মনের মধ্যে বারবার গভীরভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখনো তাঁহার কানে সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন ধ্বনিত হইতেছিল। কিছু না বুঝিলেও এইটুকু তিনি বুঝিলেন— এই সন্ন্যাসী অসাধারণ।

সেইদিন হইতে মার্গারেট লণ্ডনে এই হিন্দুযোগীর প্রত্যেকটি রবিবাসরীয় বক্তৃতা ও ঘরোয়া বৈঠকে তাঁহার ধর্মোপদেশ শুনিতে লাগিলেন। ঘরোয়া বৈঠকে যোগদানের জন্য তিনি নিয়মিত নিমন্ত্রণও পাইতে লাগিলেন। এই সব দিনের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"স্বামিজী যেন আমাদিগের নিকট কোন্ এক দূর দেশের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। ...তিনি আমাদিগকে সেই বিস্ময়কর প্রতীচ্য সুরসহযোগে যে-সকল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহা কখনো ভুলিবার নহে। ...তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে, খৃষ্টধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্মেও প্রেমই ধর্মভাবের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকৃত হয়।... তিনি কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান — এই তিনটিকে আত্মা তিনটি পথ বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, সকল ধর্মের একমাত্র শিক্ষা এই : 'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।'

"তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, তৎকালে পাশ্চাত্ত্যে বহুল প্রচারিত কতিপয় ধর্মসম্প্রদায় কাঞ্চনে আসক্তি বশতঃ অচিরেই বিনষ্ট হইবে। তিনি আরো ঘোষণা করিলেন যে, মানুষ ভ্রম হইতে ভ্রমে অগ্রসর হয় না, সত্য হইতে

সত্যেই অগ্রসর হইয়া থাকে।··· আমার মনে হইল যে, এক অপরিচিত দেশের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে পুষ্ট, একজন নূতন রকমের চিন্তাশীল ব্যক্তি যে বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহা সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই হিন্দুযোগী সম্বন্ধে গর্ব ও উদাসীনতার সহিত নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেও আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার প্রত্যেকটি মতের প্রতিধ্বনি বা তাহারই মতন আর একটি মত ইতিপূর্বে শুনিয়া বা ভাবিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ইহার পূর্বে আমার ভাগ্যে এমন কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির দর্শনলাভ ঘটে নাই, যিনি সামান্য এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে, আমি এ পর্যন্ত যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্টতর বলিয়া জানিতাম, সে সমস্তই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"যখন তিনি বলিতেছিলেন, 'জগৎ মাকড়সার জালের মত, আর মনগুলি সব মাকড়সা; কারণ মন এক, আবার বহু'—তখন তিনি আমার দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিলেন আমি লিখিয়া লইলাম, উহা আমার নিকট ভাল লাগিল, কিন্তু আমি সে বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না — মানিয়া লওয়া ত দূরের কথা।"

প্রথম দিনই যে এই হিন্দুযোগীর বক্তৃতা শুনিয়া কুমারী মার্গারেট মুগ্ধ বা অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। ধর্মপ্রচারকের বক্তৃতা তিনি ইতিপূর্বে দুই-একবার শুনিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক বা মুক্তিফৌজের ভাড়াটিয়া বক্তারা যেমন পৃথিবীর লোককে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আহ্বান করেন, মার্গারেটের মনে হইল, প্রাচ্য দেশের এই তরুণ প্রচারকও হয়ত সেই রকম একজন। সবাইকেই তিনি ধর্মের নামে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু ইঁহার আহ্বানে সমস্ত দেহ মন সাড়া দেয়। প্রথম দিন বক্তৃতা শুনিয়া বাড়িতে ফিরিয়া রাত্রির নিস্তব্ধ অবসরে হিন্দুযোগীর কথাগুলি আর একবার মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া দেখিলেন মার্গারেট। সত্যই

কি তাঁহার কথার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই? অপ্রত্যাশিত এমন কি ছিল যাহাতে তিনি বিস্ময় বোধ না করিয়া পারেন নাই। ইনি ত কেবল বড় বড় ভাবের ব্যাখ্যা করিলেন না, ইঁহার মুখের কথাগুলি ত মুখস্থ করা কথা বলিয়া মনে হইত না?

একদিন ঘরোয়া বৈঠকে মার্গারেট যখন সোজাসুজি সন্ন্যাসীকে বলিলেন—"আপনার সব কথা যে বুঝিতে পারি কিংবা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি, আমার প্রকৃতি সে রকম নয়।" উত্তরে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কি বলেন নাই?—"বিচার না করিয়া আমি কোনো কথাই কাহাকেও গ্রহণ করিতে বলি না। বিষয়ের মূলে প্রবেশ করিবার ইহাই ত লক্ষণ।" তাঁহার সঙ্গে তিনি তর্কও করিয়াছেন, মনের সংশয় খুলিয়া বলিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার মনের এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই সন্ন্যাসী কি তাঁহার এক বান্ধবীর কাছে বলেন নাই?—"এই রকম সংশয় ভালো। যাচাই করিয়া পরীক্ষা করিয়াই ত সত্যকে গ্রহণ করিতে হয় এবং এইভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেই উহা স্থায়ী হয়।"

পরপর কয়েকটি রবিবার তিনি আরো বক্তৃতা শুনিলেন। নভেম্বর মাসের এক রবিবারের অপরাহ্ণ। স্থান—ওয়েষ্ট এণ্ডের একটি বৈঠকখানা। এই দিনের বক্তৃতায় হিন্দুযোগী পাঁচ রকম উপাসনা-প্রণালীর কথা বলিলেন। এমন আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে তিনি এই তুলনামূলক আলোচনা করিলেন যে, শ্রোতারা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উহা শুনিল। আজ তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় চিন্তার নূতনত্ব ও গাম্ভীর্যে মার্গারেটও বিস্মিত হইলেন।

একজন শ্রোতা প্রশ্ন করিলেন—"ধর্মরাজ্যের সব কথা আপনি জানেন?"

উত্তর হইল—"হ্যাঁ। আমি রাস্তার কোথাও কি আছে; তাহা তন্ন তন্ন করিয়া জানি, এতটুকুও আমার অজ্ঞাত নাই।"

এ কী শুধু কথার কথা? কিন্তু বলিবার ভঙ্গিতে প্রত্যয় যেন উদ্ভাসিত। মার্গারেট বুঝিলেন, এই বক্তা প্রাচ্য দেশ হইতে ধর্মের নামে বাণিজ্য করিতে এই দেশে আসেন নাই কিংবা 'ধনাঢ্য ও অলস উচ্চ শ্রেণীর লোকদের তৃপ্তির জন্য কবিতা ও তর্কযুক্তির সৌখীন ভোজ্য সামগ্রী' তাঁহাদের সম্মুখে ধরিয়া দিতে আসেন নাই। অল্প কথায় বড় বড় ভাব ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি জলের মত সহজ করিয়া বুঝাইতে তিনি আর কাহাকেও দেখেন নাই।

আর একদিনের বক্তৃতার আরম্ভে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে তিনি যখন শুনিলেন:

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

তখনি মার্গারেটের চেতনায় এক নূতন অনুভূতির সঞ্চার হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, এই হিন্দু সন্ন্যাসী বীরোচিত উপাদানে গঠিত; তাঁহার অন্তরে-বাহিরে এক নূতন জীবন-দর্শন উদ্দীপ্ত; য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে তিনি এই জিনিস পান নাই।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।
যো বৈ ভূমা তদমৃতময়ং যদল্পং তন্মর্ত্যম্।

—যাহা অনন্ত অসীম তাহাই অমৃত, শাশ্বত ও নিত্যানন্দপ্রদ; এ ছাড়া জাগতিক সবই স্বল্প, ক্ষণস্থায়ী ও পরিণামে দুঃখপ্রদ।

প্রকৃতিলব্ধ ভোগৈশ্বর্য যতই রমণীয় ও সুন্দর হউক না কেন উহা অন্তিমে দুঃখদায়ক—ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া ভারত ভোগ্যবস্তুনিচয় বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তরাজ্যে পরমানন্দাস্পদ আত্মার সন্ধানে ছুটিয়াছিল।

হিন্দুযোগীর বক্তৃতায় এই কথা শুনিয়া মার্গারেটের মনে হইল, য়ুরোপীয় দর্শন ত এমন কথা কখনো বলিতে পারে নাই। যখন তিনি সন্ন্যাসীর মুখে শুনিলেন—"কেবল ভারতবর্ষেই মানব-হৃদয় বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত পশুপক্ষী, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ্-জগৎকেও প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছে এবং সমগ্র বিশ্বের একত্ব ও অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করিয়া বিশ্বচরাচরের হৃৎস্পন্দন আপন হৃদয়ের স্পন্দন বলিয়া অনুভব করিয়াছে"—তখন এই নূতন জীবন-দর্শন স্বমহিমায় মার্গারেটের চেতনায় উদ্ভাসিত হইল।

এই জীবন-দর্শন তাঁহার জীবনের উদয়াচলে যেন এক নব-সূর্যোদয়। যেন তিমিরবিদার এক উদার অভ্যুদয়।

এই জীবন-দর্শনের বক্তাকে মার্গারেট মনে মনে তাঁহার জীবন-দেবতা বলিয়া স্বীকার করিলেন। প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, এমন মহাপুরুষ তিনি জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ করেন নাই।

তিনি বরণ করিলেন তাঁহাকে গুরু ও আচার্য বলিয়া।

॥ দুই ॥

১লা এপ্রিল, ১৮৯৬ সাল।

বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আসিলেন।

আতিথ্য গ্রহণ করিলেন অনুরাগী বন্ধু ষ্টার্ডির বাড়িতে। সঙ্গে আছেন বিশ্বস্ত সেবক গুডউইন আর গুরুভাই সারদানন্দ। গুডউইন স্বামীজির ক্ষিপ্র লিপিকার; তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার ভাণ্ডারী তিনি।

মে মাস হইতেই বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বাড়িতে ঘরোয়া আলোচনা, বাইরে বক্তৃতা। স্বামীজি লণ্ডনে আসিয়াছেন শুনিয়া মার্গারেট একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। স্বামীজি স্মিতহাস্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

মার্গারেট দেখিলেন—বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভ সেই মূর্তি।

জ্ঞানে প্রদীপ্ত,

প্রেমে স্নিগ্ধ,

বৈরাগ্যে মধুর,

করুণায় বিগলিত,

আনন্দে উজ্জ্বল সেই সৌম্য শান্ত ধ্যানগম্ভীর মূর্তি।

আর তেমনই উদ্দীপনাময়ী কথা যাহা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, পূর্ণ হয়। মার্গারেটও আজ মুগ্ধ, তৃপ্ত ও পূর্ণ।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের বিবরণ মার্গারেট এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনরূপ হিন্দুগণের যে বিশ্বাস, তিনি আমাদের নিকট তাহারই প্রচারক হিসাবে আসিয়াছিলেন এবং এই ধর্ম সত্য কিনা তাহা তিনি আমাদের সকলকে নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বিশেষ কোনো ধর্মের পক্ষ সমর্থন করিতে তাঁহাকে শুনি নাই। বক্তব্য বিষয়গুলির উদাহরণ স্বরূপে তিনি অসঙ্কোচে ভারতীয় ধর্মমতের উল্লেখ করিতেন বটে, কিন্তু ভারতীয় চিন্তা-প্রণালীতে যে দর্শন সকল ধর্মমতেরই ভিত্তিস্থানীয়, তদ্ভিন্ন তিনি অপর কিছুই কখনো প্রচার করেন নাই। বেদ্, উপনিষদ্ ও গীতা ব্যতীত তিনি অপর কোনো গ্রন্থ হইতে কোনো কিছু উদ্ধৃত করিতেন না। সকলেই তাঁহার দার্শনিক জ্ঞানের অসাধারণ গভীরতা স্বীকার করিল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্র তাহাদিগের হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব ধর্মভাবের উন্মেষ করিয়া দিল।"

সারা লণ্ডন যখন হিন্দুযোগীর বক্তৃতায় উদ্বেল, লণ্ডনের বিদগ্ধসমাজ যখন তাঁহার আলোচনায় মুখর, ঠিক সেই সময়ে বিরুদ্ধবাদী খৃষ্টান পাদ্রীদের কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে কুৎসা রটিল—ভারতবর্ষ হইতে একজন নাস্তিক ধর্ম প্রচার করিতে লণ্ডনে আসিয়াছে, কিন্তু সে ধর্ম মানে না। ইহাতেও তাঁহার প্রতি মার্গারেটের মন কিছুমাত্র বিরূপ হইল না, অনুরাগ হ্রাস পাইল না। তিনি যতই তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন, মার্গারেট ততই উপলব্ধি করিলেন, এই সন্ন্যাসী যেমন স্বদেশপ্রেমিক তেমনি মানবপ্রেমিক।

পিকাডিলির রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ পেণ্টার্সের গ্যালারী, প্রিন্সেস হল, বিভিন্ন ক্লাব, সোসাইটি—যখন যেখানে স্বামীজির বক্তৃতা হইত, শত কাজ ফেলিয়া মার্গারেট সেখানে উপস্থিত থাকিবেনই। এইবার লণ্ডনে স্বামীজি কত বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন—'ভক্তিযোগ' 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'সার্বজনীন ধর্ম' 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা'—

এমনি কত বিষয়ে যে বক্তৃতা ও আলোচনা তিনি শুনিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু কি বক্তৃতা শুনিতেন, অবসর পাইলেই স্বামীজির কাছে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। স্বামীজি দেখিলেন, এই একটি জ্বলন্ত শিখা।

একদিন একটি সভায় বক্তৃতা শেষ হইলে পরে একজন প্রাচীন পলিতকেশ দার্শনিক পণ্ডিত সম্মুখে আসিয়া বিবেকানন্দকে বলিলেন — "আপনি বড় সুন্দর বলিয়াছেন, কিন্তু নূতন ত কিছু বলেন নাই।" এমন অদ্ভুত কথা শুনিয়া অন্যান্য শ্রোতারা সকলেই বিস্মিত হইল। তাহাদের মধ্যে মার্গারেটও ছিলেন। তিনি শুধু ভাবিলেন, ইহার উত্তরে স্বামীজি কি বলিবেন। কিন্তু তখন সকলের বিস্ময়কে বিস্মিত করিয়া মধুর কণ্ঠে ও প্রশান্ত হাস্যে সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "বন্ধু, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আর কিছুই নহে—সত্য। এই সত্য হিমাদ্রির ন্যায় প্রাচীন, মনুষ্য জাতির ন্যায় প্রাচীন, সৃষ্টির ন্যায় প্রাচীন এবং স্বয়ং পরমেশ্বরের ন্যায় প্রাচীন। যদি আমার এই কথা আপনার মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিতে সমর্থ হইয়া থাকে এবং আপনি সেই মত জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে কি আমি উহা ভাল করি নাই?" প্রশ্নকর্তা আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিলেন না, শ্রদ্ধায় তাঁহার মস্তক অবনত হইল। চারিদিক হইতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা-ধ্বনি ও করতালি শোনা গেল। মার্গরেটের হৃদয় তাঁহার জীবন-দেবতার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল।

লুটাইয়া পড়িতে চাহিল সত্য, কিন্তু স্বামীজিকে বুঝিতে গিয়া মার্গারেট এখনো ধাঁধায় পড়িয়া যান। দিন যায়—তথাপি সন্ন্যাসীর অন্তরের প্রকৃত রূপ তিনি যেন ঠিকমত উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারেন না।

একদিন লণ্ডনের এক অভিজাত গৃহে বৈঠক বসিল। মার্গারেট সেই বৈঠকে উপস্থিত। বক্তৃতার শেষে স্বামিজী আরম্ভ করিলেন নানা দেশের নানা শহরের আলোচনা—আলোচনা করিলেন কত দেশ, কত জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন মার্গারেট। কথায় কথায় উঠিল ভারতের কথা—ইহার প্রাচীন তীর্থ ও বিখ্যাত শহরগুলির কথা। বলিলেন ভারতের উন্নতি-অবনতির ইতিহাস। আগের চেয়ে সংকোচ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, তাই মার্গারেট বিবেকানন্দকে বলিলেন—"কিন্তু লণ্ডনের মত শহর পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। যেমন সুন্দর, তেমনি ইহা শিক্ষা-সভ্যতা ও শিল্পসম্পদের কেন্দ্র।"

স্বামীজি বুঝিলেন ইহা নিছক স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসার কথা, ভারতকে ছোট করিবার উদ্দেশ্যে মার্গারেট ইহা বলেন নাই। তথাপি কোথায় যেন আঘাত লাগিল সন্ন্যাসীর অন্তরে, মুহূর্তে দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন তিনি। বলিলেন—"হ্যাঁ, নিশ্চয় স্বীকার করি, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। অতুলনীয় শহর তোমাদের লণ্ডন। কিন্তু ভুলিয়া যাও কেন যে তোমাদের এই শহরকে সুন্দর করিবার জন্য পৃথিবীর কত দেশ কত নগরের সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের মূলে আছে ভারতের অপরিমিত সম্পদ যাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের সময় দশ হাতে লুণ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের জন্যই তো আজ ইংলণ্ডের এই সমৃদ্ধি, লণ্ডনের এই সৌন্দর্য।"

স্বামীজি চুপ করিলেন। মার্গারেট এই নিদারুণ কশাঘাতে চমকিয়া উঠিলেন। এই ক্ষুব্ধ দৃপ্ত বাক্যের অন্তরালে ইতিহাসের যে মর্মান্তিক সত্য রহিয়াছে তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সকলেই সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীর আরক্তিম মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরিশেষে প্রশান্ত স্বরে স্বামীজি বলিলেন—"তোমরা মনে রাখিও,

একটিকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য আর পাঁচটিকে ধ্বংস করা সৃষ্টি নয়, কৃতিত্ব নয়, নির্মম পরিহাস।"

মার্গারেটের সমস্ত অন্তর সন্ন্যাসীর চরণে লুটাইয়া পড়িল। আর কোনো সংশয় রহিল না এই মানুষটি সম্পর্কে।

আর একদিন। সেণ্ট জনস্ উড, এ্যাভিন্যু রোড। শ্রীমতী য়্যানি বেসান্তের ভবন। বিবেকানন্দকে তিনি বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার বাড়িতে আজ একটি বক্তৃতা দিবার জন্য। বক্তৃতার বিষয়: ভক্তি। লণ্ডনের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও দার্শনিকগণ এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য। তাঁহাদের মধ্যে মার্গারেটও ছিলেন। "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়", এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া বক্তা যখন উপসংহারে বলিলেন, "সমস্ত মানুষের মধ্যে যিনি রহিয়াছেন, তিনি পরম এক এবং এই এককে যিনি সকলের মধ্যে সমভাবে দেখিয়াছেন, তিনিই ভক্তির অধিকারী— ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ—এই মহাবাণীর মধ্যেই নিহিত আছে ভক্তির মর্মকথা"—তখন সকল শ্রোতাই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিলেন।

আর একদিন। ১৭নং হাইড পার্ক গেট। মিসেস মার্টিনের বাড়ি। বক্তৃতার বিষয়ঃ "আত্মা সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ধারণা।" যথাসময়ে স্বামীজি আসিলেন। পরিধানে কালো রঙের ইজের, কালো রঙের ভেষ্ট, আলপাকার লম্বা চোগা, গলায় কলার কিন্তু টাই নাই, মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি লক্ষ্ণৌর তাজের মতন কালো মোটা কাপড়ের টুপি। মার্গারেট দেখিলেন, শ্রোতারা যেন সকলেই নয়ন-মন হইয়া দেবদূতের মতন সুন্দর সৌম্য উজ্জ্বল মূর্তি সেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইল। কণ্ঠস্বর সেই রকমই গম্ভীর, তেজঃপূর্ণ ও শব্দস্রোত

বহুদূরগামী। আজ তিনি নচিকেতার গল্প দিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। অনন্ত স্বর্গসুখ-কামনায় ঋষি গৌতম বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্বদানের জন্য ব্রতী। হোমগন্ধ পরিপূরিত যজ্ঞভূমি ঋত্বিক্ কণ্ঠোচ্চারিত সামগানে মুখরিত। ঋষিপুত্র বালক নচিকেতা পিতার নিকট বসিয়া। ঋত্বিক্‌গণকে যখন দক্ষিণাস্বরূপ জরাজীর্ণ কঙ্কাল-বিশিষ্ট গাভী দান করা হইল, বালক তখন পিতার এই অশাস্ত্রীয় কার্যের প্রতিবাদ করিল। নিজেকেও পিতার অন্যতম সম্পত্তিজ্ঞানে বিনয়নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, আমায় কাহাকে দান করিবেন ?" একবার, দুইবার, তিনবার বালক এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। বিরক্ত গৌতম রাগের মুখে বলিয়া উঠিলেন, "মৃত্যবে ত্বা দদামীতি—তোমায় মৃত্যুকে দিব।" অমনি বালক অকুতোভয়ে মৃত্যুর সন্ধানে চলিল। ভারত-প্রতিভা আজ যেন ত্যাগমূর্তি নচিকেতার রূপ ধরিয়া আত্মজ্ঞানের সন্ধানে অনন্ত পথের পথিক হইল।

বালক যথাসময়ে যমভবনে উপনীত হইল। গৃহস্থ অনুপস্থিত। তাঁহার প্রতীক্ষায় নচিকেতা তিন দিন তিন রাত্রি অভুক্ত অবস্থায় বসিয়া রহিল। বালকের অন্তরে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা দেদীপ্যমান। নির্মল মুখমণ্ডল স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জিজ্ঞাসু চক্ষু দুইটিতে প্রতিভার ভাস্বর দ্যুতি। যম গৃহে ফিরিলেন। কমনীয়কান্তি বালককে দেখিয়া বিবস্বৎপুত্র যম আনন্দে পুলকিত। পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাহার সৎকার করিলেন এবং তিন রাত্রি অনাহারে থাকার জন্য তিনটি বর-প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একে একে দুইটি বর প্রার্থনা করিয়া তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্মজ্ঞান চাহিল। বালককে পরীক্ষা করিবার জন্য যম তাহার সম্মুখে ভোগৈশ্বর্যের নানাবিধ প্রলোভন উপস্থাপিত করিলেন, কিন্তু বালকের তপঃপূত প্রাণ সে প্রলোভনে সাড়া দিল না। বালক বলিল—"হে যম, তুমি যে-সব

ভোগ্যবস্তুর কথা বলিতেছ, ইহারা কল্য থাকিবে কিনা, সন্দেহ। তোমার অশ্ব, নৃত্যগীতাদি ভোগ্যবস্তুনিচয় তোমার থাকুক; তুমি আমাকে আত্মতত্ত্ব বল। পবিত্র রক্তিম উষায় প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে জ্ঞানবৃদ্ধ গুরু ধ্যানগম্ভীর শিষ্যের কর্ণে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কোটিকল্প দুর্লভ আত্মতত্ত্ব প্রকটিত করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন, "তত্ত্বমসি—তুমিই সেই, হে মানব, তুমিই সেই।" এই দিনের বক্তৃতা শুনিয়া বক্তাকে নচিকেতার মতই তেজস্বী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু বলিয়া মার্গারেটের মনে হইল।

লণ্ডনের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সিসেম ক্লাবের পক্ষ হইতে মার্গারেট একদিন স্বামীজিকে অনুরোধ করিলেন তাঁহাদের ওখানে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য। তিনি সম্মত হইলেন। এইখানে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শিক্ষা'। এইদিনের বক্তৃতায় ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনা করিয়া বিবেকানন্দ বলিলেন—"শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করা নয়, মানব-চরিত্র গঠন করাই প্রকৃত ও একমাত্র উদ্দেশ্য। জগতে চরিত্রবলেরই প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বারা সেই চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইবে। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা নিহিত আছে তাহাকে প্রকাশ করার নামই শিক্ষা।" ক্লাবের মহিলারা সকলেই বিদুষী, কিন্তু তাঁহারাও একবাক্যে স্বীকার করিলেন, শিক্ষা সম্বন্ধে এমন সুন্দর কথা তাঁহারা আর কখনো শোনেন নাই।

এই সময়কার একদিনের একটি ঘটনা মার্গারেট এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

"একদিন প্রশ্নোত্তর-ক্লাসে কথায় কথায় কিছু বাদানুবাদ হইল। সহসা স্বামীজি বজ্রপাতের ন্যায় শ্রোতাদের চমকিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আজ জগতে কিসের অভাব জান? জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী, যাহারা

সদর্পে ঐ রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, আমাদের ঈশ্বর ভিন্ন আপনার বলিতে আর কিছুই নাই।' কে কে যাইতে প্রস্তুত? বলিতে বলিতে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন এবং সেই অবস্থায় শ্রোতাদের দিকে একে একে চাহিয়া দেখিতেছেন, যেন তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সহিত যোগদান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। বলিলেন—'কিসের ভয়?' তারপর বজ্রগম্ভীরনাদে অচল অটল বিশ্বাসের সহিত যে কথাগুলি বলিলেন তাহা এখনো আমার কানে বাজিতেছে—'ইহাই যদি সত্য হয়, তবে অন্য কিছুতে আর কি প্রয়োজন? আর ইহা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে আমাদের জীবনেই বা ফল কি'?"

সঙ্গে সঙ্গে মার্গারেটের মনে প্রতিধ্বনি উঠিল—"জগৎ চায় এমন বিশজন নরনারী—" ভাবিলেন, এই বিশজনের মধ্যে তিনি একজন হইতে পারেন কি না? ভারতের অলৌকিক অধ্যাত্মসাধনার প্রবাহ, অমৃতত্বলাভের এই আহ্বান কুমারী মার্গারেটের অন্তর স্পর্শ করিল। হিন্দুযোগীর মুখে উপনিষদের যে-বাণী শুনিয়াছেন—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—তিনি তাহা তাঁহার জীবনে রূপায়িত করিতে চাহিলেন। এই সন্ন্যাসীর মুখে শোনা বুদ্ধের সেই গল্পটি মার্গারেটের আবার মনে পড়িল। যতদিন না জগতের শেষ ধূলিকণাটি পর্যন্ত মুক্ত হয়, ততদিন পর্যন্ত বোধিসত্ত্ব নিজে নির্বাণ গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বুদ্ধের মতই মার্গারেট স্বামিজীর চিন্তায় উদ্‌বোধিত হইয়া তাঁহার সমগ্র জীবন মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করিতে চাহিলেন।

মনের এই ভাব লইয়া একদিন তিনি হিন্দুযোগীর সঙ্গে একাকী সাক্ষাৎ করিলেন। সব শুনিয়া স্বামীজি তাঁহাকে বলিলেন—"আমার স্বদেশীয় নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সঙ্কল্প আছে। আমার মনে হয়, উহাদিগকে কার্যে পরিণত করিতে তুমি বিশেষভাবে

সাহায্য করিতে পার।" মার্গারেট জানাইলেন—"আপনার কার্যে আমি যোগদান করিতে সম্মত আছি।" স্বামিজী বলিলেন, "শুধু সম্মত হইলে চলিবে না, ইহার অধিক কিছু দরকার।" মার্গারেট বলিলেন—"হ্যাঁ, আমি ইহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত।"

ইহার পরই মার্গারেট নিজেকে তাঁহার এই জীবন-দেবতার আদর্শের বেদীমূলে নৈবেদ্য হিসাবে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন।
নির্মাল্য হইয়া সন্ন্যাসীর নির্মল দুইটি চরণে মার্গারেটের সমস্ত সত্তা আজ যেন লুটাইয়া পড়িতে চাহিল।
মনে পড়িল সেই ২২শে অক্টোবরের কথা।
সেই প্রথম স্বামীজিকে দেখিলেন। দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, তিনি কেমন যেন হইয়া গেলেন। তারপর হইতেই কেমন একটা অদ্ভুত ভাব জাগিল মনের মধ্যে—এক বিচিত্র অনুভূতি। বুঝিলেন, এমন একজনের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তিনি, যাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তাঁহার সমগ্র প্রকৃতি, আত্মা এমন কি, সম্পূর্ণ সত্তাকে পর্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত। যে-জীবনে বাহিরের কোনো প্রভাব কোনো দিন প্রশ্রয় পায় নাই, সেই জীবন আজ কোন্ এক মহাজীবনের সান্নিধ্যে আসিয়া এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল! তিনি স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ, চিরদিনই তিনি নিজের কর্ত্রী। কিন্তু আজ বুঝিলেন, এই হিন্দু-সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে যেন অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার উপদেশ তাঁহার চিন্তাধারায় আনিয়া দিয়াছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—জীবনের এখন তিনি সেই রূপ দেখিতে পাইলেন যাহার রহস্য এতকাল তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল। আত্মা ও দেহের অপূর্ব ঐক্যতান।
একটি দ্যোতনা।

একটি প্রেরণা।

জীবনের আশ্চর্য সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি।

জীবনের এক বিচিত্র আস্বাদ।

তাই বুঝি মার্গারেট এই মহাজীবনের বেদীমূলে নৈবেদ্য হিসাবে নিজেকে আজ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইংলণ্ডের সভ্যতার উদ্যানের একটি অনুপম ও অনাঘ্রাত কুসুম সেদিন এমন করিয়াই বুঝি ভারতের বেদীমূলে নিজেকে সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। কুমারী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল্‌কে আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্ত্য বুঝি সেদিন এমন করিয়াই প্রাচ্যকে চাহিয়াছিল।

॥ তিন ॥

৭ই জুন, ১৮৯৬ সাল।

মার্গারেটের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন।

তাহার এই উনত্রিশ বৎসরের বহুভঙ্গিম জীবনে অনেক স্মরণীয় দিনের মধ্যে একটি চিরস্মরণীয় দিন। সেইদিন সকালে বাড়ির কাজকর্ম সারিয়া মার্গারেট স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময়ে স্বামীজির বিশ্বস্ত সেবক গুডউইন স্বামীজির নিকট হইতে একখানি পত্র আনিয়া মার্গারেটের হাতে দিলেন।

"আজ বক্তৃতা আছে নাকি?" জিজ্ঞাসা করেন মার্গারেট।

"না, বক্তৃতা নয়। স্বামিজী একখানি চিঠি দিয়াছেন আপনাকে। আজ সেই পত্রের বাহক হইয়া আসিয়াছি।"

"বক্তৃতা আবার কবে হইবে?"

"এখন আর হইবে না।"

"কেন?"

"শীঘ্রই আমরা লণ্ডন হইতে চলিয়া যাইতেছি?"

"কোথায়?"

"আপাতত ফ্রান্স। তারপর জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ড যাইবার কথা আছে আমাদের।"

"আবার কবে লণ্ডনে ফিরিবেন?"

"রোম দেখিয়া ভারতে ফিরিবার পথে স্বামীজি হয়ত আর একবার লণ্ডনে আসিতে পারেন দুই-চারি দিনের জন্য।"

"স্বামীজিকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতে ভুলিবেন না। নমস্কার।"

"নমস্কার, মিস্ নোব্‌ল্।"

গুডউইন চলিয়া যাইবার পর স্বামীজির চিঠিখানি হাতে লইয়া মার্গারেট কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে চিঠি লিখিবেন, ইহা যে মার্গারেটের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। স্কুলে আর যাওয়া হইল না। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন।

"প্রিয় মিস্ নোবল্,

আমার আদর্শ দুই একটি কথায় বলা যাইতে পারে। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে মনুষ্য সমাজে তাহা প্রকাশ করা এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এই দেবত্ব কি ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় তাহার উপায় নির্ধারণ করা।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সংসার। পুরুষ হউক, নারী হউক, অত্যাচারিতের প্রতি আমি দয়া বোধ না করিয়া পারি না; আবার যে অত্যাচার করে তাহার প্রতিও আমার তেমনি করুণা।

আমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখিতেছি যে, অজ্ঞতা হইতেই মানুষের যত দুঃখ কষ্ট, অন্য কিছু হইতে নয়। পৃথিবীতে আলোর দিশারী কে হইবে? অতীতে আত্মোৎসর্গ ই ছিল নীতি। হায়, কত যুগ পরে আমরা আবার তাহা ফিরিয়া পাইব? এই পৃথিবীর কল্যাণ সাধনের জন্য যাঁহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাহসী, তাঁহাদেরই আত্মোৎসর্গ করিবার দিন আজ। অনন্ত করুণা ও মৈত্রীতে পূর্ণ অসংখ্য বুদ্ধেরই আজ প্রয়োজন।

বর্তমানে পৃথিবীর সকল ধর্মই প্রাণহীন, অসার। জগতে এখন চরিত্রবলেরই প্রয়োজন। জগৎ এমন সব মানুষ চাহিতেছে যাহাদের জীবন জলন্ত, নিষ্কাম প্রেমের পূর্ণাহুতিস্বরূপ। সেই প্রেমের শক্তিতে উচ্চারিত বাক্যে বজ্রের মত কার্য করিবে।

আমার এই নিশ্চিত ধারণা হইয়াছে যে, তোমার মন সর্বসংস্কারমুক্ত; তোমার মধ্যে সেই শক্তি নিহিত আছে যাহা এই পৃথিবীকে নাড়া দিতে পারে।

এই রকম আরো অনেক মানুষ আসিবে। আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ। জাগো, জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ যন্ত্রণায় জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। তোমার নিদ্রা যাইবার অবসর কোথায়? যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আহ্বানে নিদ্রিত দেবতা জাগিয়া উঠিয়া সাড়া না দিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আহ্বান চলিবে। জীবনে আর কী দরকার? ইহা অপেক্ষা মহৎ কাজ পৃথিবীতে আর কি আছে?

আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করি না, কাজ করিতে করিতে কাজের খুঁটিনাটি ঠিক করি। পরিকল্পনার কথা ভাবি না। উহা আপনা হইতেই ঠিক হইয়া যায়। আমার কথা শুধু জাগো, জাগো!

আমার আশীর্বাদ সর্বক্ষণের জন্য তোমাকে ঘিরিয়া থাকুক।

স্বামী বিবেকানন্দ"

চিঠিখানি মার্গারেট বার বার পড়িলেন। সেই চিঠির প্রত্যেকটি কথার ভিতর তিনি যেন এই সন্ন্যাসীর অন্তরের আবেগ ও উত্তাপ অনুভব করিলেন। অনুভব করিলেন—পৃথিবীর নর-নারীর কল্যাণের জন্য, তাহাদের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য এই মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসীর হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষা। ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম ও মানুষের দেবত্ব সম্বন্ধে এই হিন্দুযোগীর নিকট হইতে তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে, মার্গারেটের মনে হইল, তাঁহার চিন্তাপ্রবাহ সম্পূর্ণ নূতন খাদে বাহতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভারতের সহিত, ইহার আধ্যাত্মিক ইতিহাসের সহিত মার্গারেটের পরিচয় খুবই অল্প; কিন্তু যীশু, বুদ্ধ প্রভৃতি যে সব মহাপ্রাণদের কথা তিনি ইতিহাসে পড়িয়াছেন, ভারতের এই তরুণ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীটির মধ্যে তাঁহারাই কি আজ নূতন করিয়া জন্ম লইয়াছেন? "জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে"—আন্তরিকতায় উদ্দীপ্ত কী সুন্দর এই কথাগুলি! এমন ভাবগর্ভ কথা

তিনি ত ইহার আগে শোনেন নাই। চিঠির কথাগুলি লইয়া যতই তিনি মনের মধ্যে আলোচনা করিলেন, মার্গারেটের চিন্তায় এই হিন্দুযোগীর মহিমা ততই ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সহসা মার্গারেটের মনে পড়িল একদিনের একটি বক্তৃতার কথা। সেদিন বক্তৃতার শেষে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"আমার ধারণা, যিনি এক সময়ে বুদ্ধরূপে আসিয়াছিলেন, তিনিই পরে খৃষ্টরূপে আসিয়াছেন।" কুমারী নোবলের অন্তর বলিয়া উঠিল—"ভারত হইতে আগত এই সন্ন্যাসী যেন একাধারে সেই বুদ্ধ ও খৃষ্ট।" সেই তিনি বুদ্ধের মত প্রশান্তভাবে বক্তৃতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত আর তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই আধুনিক পৃথিবীতে সুদূর অতীতের সেই বাণী পুনরায় উচ্চারিত হইতেছে—চিঠি-হাতে মার্গারেটের মানসপটে মুহূর্তের জন্য কে যেন এই ছবিখানি আঁকিয়া দিল।

আবার মনে পড়িল আর একদিনের বক্তৃতার সময়ে স্বামীজি বলিয়াছিলেন, "মানুষ ততদিনই মানুষ যতদিন সে প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই মানুষের জন্ম, তাহার বশীভূত হইবার জন্য নয়।" প্রকৃতির উপরে যিনি মানুষ ও তাহার ভাগ্যকে স্থাপন করিতে প্রয়াসী, সেই বীর সন্ন্যাসী আজ এই চিঠির ভিতর দিয়া যে আহ্বান তাঁহাকে জানাইয়াছেন, মার্গারেটের মনে হইল, তাহা উপেক্ষা করিবার জিনিস নয়।

এই সুসভ্য লণ্ডন শহরে কত বিদেশীকে তিনি আসিতে দেখিয়াছেন; কিন্তু এমন অনন্যসাধারণ আকৃতি ও প্রকৃতির মানুষ মার্গারেট আর কখনো দেখেন নাই—এমন মানুষ তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই যিনি নাম, যশ ও পার্থিব সুখভোগের বাসনা বিসর্জন দিয়াছেন, যিনি স্বাধীন চিন্তাদ্বারা সকল ধর্ম হইতেই কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। এমন উদার ও প্রশস্ত হৃদয়, এমন প্রেমরূপী প্রচারক মার্গারেটের

জীবন-পথে আর কখনো আসেন নাই যিনি জগৎকে নূতন কথা শুনাইবার জন্য আসিয়াছেন এবং যাঁহার বক্তব্য বিষয়ের স্থূলমর্ম "সার্বজনীন ধর্ম"। এইভাবে চিঠিখানি হাতে লইয়া মার্গারেট এই সন্ন্যাসী ও প্রচারক সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই তিনি তাঁহার চারিত্র্য-সৌন্দর্যে ও তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈত-তত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া জগৎ সংসার বিস্মৃত হইলেন। নিস্তব্ধ অন্তরে পরিপূর্ণ হৃদয়ে তিনি জ্ঞানের এই মূর্তিমান বিগ্রহের ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। আজ তাঁহার গৃহ, তাঁহার পরিবেশ, তাঁহার ভুবন নূতন অর্থে ব্যঞ্জনাময় হইয়া মার্গারেটের নিকটে প্রতিভাত হইল।

তিন মাস পরে বিবেকানন্দ আবার লণ্ডনে ফিরিলেন।

এইবার বিদায়ের পালা।

মন তাঁহার এখন ভারতমুখী।

কিন্তু লণ্ডন তাঁহাকে তাহার সকল আগ্রহ দিয়া আরো কিছু দিন ধরিয়া রাখিতে চাহিল। সেখানকার বিদগ্ধ-সমাজ যেন এই সন্ন্যাসীর নিকটে আরো জ্ঞানের কথা, প্রেমের কথা, আলোর কথা শুনিতে চাহিল। আবার তিনি কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। সেই বক্তৃতা, উপদেশ ও আলোচনা চলিতে লাগিল অনবরত। সেই শ্রোতাদের সমাগম, অধ্যাপক ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের আসা-যাওয়া। স্বামীজি আবার আগের মতন কর্মব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমতী মূলারের বৈঠকখানায়, ৩৯ নম্বর ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের হলঘরে, গ্যালারীতে—সর্বত্র আবার বেদান্তের শিক্ষা-দীক্ষা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচারিত হইতে লাগিল। জ্ঞানের মূর্তিমান বিগ্রহ এই সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করিয়া লণ্ডনের ভাব-জীবন আবার স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সেই স্পন্দন মার্গারেটও অনুভব না করিয়া পারিলেন না। আবার

তিনি আগের মতন স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন, নিয়মিতভাবে ক্লাস-লেকচারে যোগদান করিতে লাগিলেন। এইভাবে সন্ন্যাসীর জীবন-দর্শনের প্রতি মার্গারেটের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রবল ও প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

১৩ই ডিসেম্বর। রবিবার। স্থান—লণ্ডনের চিত্রশিল্পীসঙ্ঘ-মন্দির। স্বামীজির বিদায়-সভা। শত শত লোক এই বিদায়-উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছে। মার্গারেটও আসিয়াছেন। বিপুল জনসমাগমে গ্যালারী ভরিয়া গেল, দাঁড়াইবার জায়গা পর্যন্ত রহিল না। ভারতের এই সন্ন্যাসীর প্রতি ইংলণ্ডের ভালবাসার ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া মার্গারেটের মনে আনন্দ আর ধরে না। এই নবীন প্রচারক যে তাহাদের অনেকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাহা বিদায়-সভায় এই জনসমাগম দেখিয়া মার্গারেটের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সুসজ্জিত গ্যালারী। চারিদিকের দেয়ালে চিত্রশালার ছবিগুলি টাঙানো। যে-মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া স্বামীজি ইংরাজ জাতির নিকট তাঁহার শেষ বাণী উচ্চারণ করিবেন, তাহার চারিদিক পত্রপুষ্পলতায় বেষ্টিত। সুমধুর সঙ্গীতলহরী এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। আসন্ন বিচ্ছেদব্যথায় সকলেই মুহ্যমান। সকলেই নিস্তব্ধভাবে অপেক্ষা করিতেছে। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে পরিপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীজি সভায় প্রবেশ করিলেন। সেই সৌম্য মূর্তি—সর্বাঙ্গে ত্যাগের মহিমা, ললাটে দিব্য শান্তি, নয়নে জ্ঞানের বিমল আভা। বক্তৃতা ও বিদায় অভিনন্দনের গান শেষ হইল। অনেকেই মনোবেদনায় মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। অনেকের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। মার্গারেটের অবস্থাও সেই রকম। সূর্যের ন্যায় ভাস্বর মূর্তি স্বামীজি অতি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে সেই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান

করিলেন। বক্তৃতা শেষে তিনি যখন ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ইংলণ্ডের এই আতিথেয়তা আমার মনে থাকিবে। আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবে"—তখন সভাগৃহ আনন্দের করতালিতে মুখর হইয়া উঠিল।

মার্গারেটের হৃদয়েও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল।

সহসা তাঁহার হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল দুইটি কথা—ত্যাগ।

সেদিন গভীর রাত্রে মার্গারেটের সুপ্ত কর্ণে কে যেন শুনাইল—ত্যাগ। চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল সন্ন্যাসীর সেই বৈরাগ্যদীপ্ত মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে সেই ত্যাগের আহ্বান।

ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ।

পরম শ্রেয়ের জন্য পরম প্রিয়ের ত্যাগই প্রয়োজন।

সহসা মার্গারেটের অন্তর যেন বলিয়া উঠিল—স্নেহময়ী মা, জীবন, যৌবন সব ত্যাগ করিয়া আমি পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ-সাধনের ব্রতই গ্রহণ করিব।

॥ চার ॥

মার্গারেটের স্বাধীন প্রকৃতি ও আইরিশ-প্রীতির সহিত মিলিয়াছিল বিবেকানন্দের স্বাধীন প্রকৃতি ও স্বদেশ-প্রীতি। পরবর্তিকালে এই মার্গারেটের ভিতর হইতে যখন নিবেদিতার আবির্ভাব হইল, তখন স্বামীজির ভারত-প্রীতি শিষ্যার মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই সংক্রামিত হইয়াছিল। বিবেকানন্দের প্রতি মার্গারেটের আকৃষ্ট হইবার ইহাই মুখ্য কারণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ধর্মভাব গৌণ 'কারণ। অদ্বৈত বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দের নূতন জীবন-দর্শনই এই বিদুষী আইরিশ কুমারীর চিন্তাপ্রবাহকে এক সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত করিয়া দিয়াছিল। "আমি স্বাধীন এবং চিরদিন স্বাধীনই থাকিব, আর আমি চাই সকলেই স্বাধীন হউক"—স্বামীজির এই উদার চিন্তা তাঁহার মনোজগতে এক নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছিল। তাই না তিনি তাঁহার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ লইয়া এই তরুণ সন্ন্যাসীকে তাঁহার জীবন-দেবতা বলিয়া নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন। যে-প্রেম তখন বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ পথে আপনার চরিতার্থতা খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, সেই প্রেমই যে মানব-প্রেমিক বিবেকানন্দের বিশ্ব-মানবতার মধ্যে লীন হইয়া যাইবে, মার্গারেটের পরবর্তী জীবনেতিহাসই তাহার সাক্ষ্য বহন করে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যেমন একটি অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা তেমনই একটি অখণ্ড বিপ্লবের দুই রূপ। নিবেদিতাকে বুঝিতে হইলে সকলের আগে বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন

বুঝিতে হয়। এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে মার্গারেট একদিনেই বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই ; যেমন নরেন্দ্রনাথ একদিনেই রামকৃষ্ণকে গুরুত্বে বরণ করেন নাই। অন্ধভক্তিতে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিকাইয়া দিয়া শিষ্য হইবার দুর্বলতা উভয়েরই ছিল না। গুরু ও শিষ্যার প্রকৃতিতে এই সাদৃশ্যটুকু আশ্চর্যজনক।

সত্য সর্বত্র বিরাজমান—ঋগ্বেদের এই বাণী।
এই বাণীর প্রতিধ্বনি শ্রীরামকৃষ্ণ।
সর্বধর্মের রসাস্বাদন ও সর্বধর্মসমন্বয়—ইহাই রামকৃষ্ণ।
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনের সমন্বিত বিগ্রহ রামকৃষ্ণ।
বেদান্তের মূর্তিমান সার-নিষ্কর্ষ রামকৃষ্ণ।
এই রামকৃষ্ণের মানস-সন্তান বিবেকানন্দ।
জাতীয়-জীবনের সার-নিষ্কর্ষ স্বামী বিবেকানন্দ।
নীলকণ্ঠ-সন্ন্যাসী ও বীর্যবান স্বদেশ-প্রেমিক।
প্রেমে ও পৌরুষে অদ্বিতীয়।
অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি তিনি।
বুদ্ধ দিলেন—সর্বভূত হিতে রতি।
শঙ্কর দিলেন—জ্ঞান এবং বৈরাগ্য।
রামমোহন দিলেন—বেদান্ত, স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রীতি।
রামকৃষ্ণ দিলেন—যত্র জীব তত্র শিব।
ইহারই সমন্বিত এবং সার্থক প্রকাশ বিবেকানন্দ।

পারলৌকিক মোক্ষমার্গের মহিমা প্রচার করিবার জন্য এই জন্মবিপ্লবী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব নয়। রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া নূতন কোনো ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। আর্যজাতির

উদার সার্বভৌমিক অধ্যাত্ম সাধনাকে তিনি বহু শতাব্দীর বিকৃতি হইতে উদ্ধারের জন্য অদ্বৈত-বেদান্তের দৃঢ়ভূমির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের এই ভয়াবহ বৈষম্য হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য বেদান্তের তত্ত্বগুলি কর্মজীবনে প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক বোধ ছিল তীব্র ও তীক্ষ্ণ। কি ধর্মচিন্তা ও সাধনা, কি সামাজিক ব্যবস্থা কোনোটাকেই তিনি সনাতন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। সামাজিক অধঃপতন ও ধর্মসাধনার বিকৃতি এই দুইকে তিনি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন।

ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত বিবেকানন্দ কেবল কবির উদ্দাম ভাবাবেগ লইয়া তাঁহার জাতিকে ভালবাসেন নাই, সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি বর্তমান ভারতের সমস্ত স্তরের প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কত উত্থান-পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া এই জাতি বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে ; সে সম্বন্ধে তাঁহার যেমন ঐতিহাসিক চেতনা ছিল, তেমনি ভাবী পুনরুত্থান সম্বন্ধেও তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না। ভারতের অধ্যাত্মজগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সহিত এইখানেই বিবেকানন্দের পার্থক্য। একের সাধনায় একের যোগবলে বহুর উন্নতি সম্ভব, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না, অপরকেও বিশ্বাস করিতে বলিতেন না। সমষ্টির দ্বারা সমষ্টি মুক্তি ইহাই ছিল তাঁহার সাধনা।

বিবেকানন্দ প্রাচ্যের শিক্ষা ও আদর্শের সহিত পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও আদর্শের তুলনামূলক বিচার করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের স্থবিরত্বের অচলায়তন ভাঙিবার জন্য প্রয়োজন য়ুরোপের চিন্তা, কর্মকুশলতা ও বুদ্ধির জঙ্গমশক্তি। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন, "তিনি ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বামদিকে রাখিয়া

তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরদিন সংকীর্ণতার মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের সেতু রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।" তাঁহার পূর্বাচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হিন্দুর অতলস্পর্শ অতীতের অন্তহীন শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া বিবেকানন্দ যেভাবে লোকশ্রেয়ঃ তত্ত্ব আমাদের উপহার দিয়াছেন, তাহা যে কত বড় দান তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন। মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণা একদিন এই ভারতবর্ষে অসংশয়িত বাণীতে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই বাণীকে পুনরায় নূতন করিয়া নির্মল করিয়া বহন করিয়া আনিলেন বিবেকানন্দ, আর সেই বাণীকেই অর্ঘ্য হিসাবে বহন করিয়া লইয়া তিনি বিশ্বক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন সমুন্নত মস্তকে। মানব-সত্যকে তিনি সমগ্র করিয়া দেখিয়াছিলেন বেদান্তের উদার দৃষ্টির দ্বারা। তাই তাঁহার জীবন-দর্শনের মধ্যে নিখিল-মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা জমিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে আর সত্যের বহুভঙ্গিম প্রকাশের বিচিত্র মিলন ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবন-দর্শনের মধ্যেই অভিব্যক্ত মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্ত কল্পরূপ।

বিবেকানন্দের জীবনে উদগ্র স্বদেশপ্রেম ও তীব্র স্বাজাত্যাভিমানের সহিত উদার অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রীতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। দেশপ্রেমের দাবানল বক্ষে লইয়া তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ও পৃথিবী ঘুরিয়াছেন। "এস মানুষ হও। নিজেদেব সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতই কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি নিজের দেশকে ভালবাস? তাহলে এসো, আমরা সকলে ভাল হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেওনা—

অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক। এগিয়ে যাও, সাম্‌নে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।” স্বামীজির এই জ্বালাময়ী উক্তিই বাংলার যুবকদের হৃদয়ে স্বাদেশিকতা জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং সেদিন ছিল ইহাই বিপ্লবের গোড়ার কথা। নবীন ভারতকে প্রধানত তিন দিক দিয়া তিনি স্বদেশসেবায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। প্রথমত—কর্মযোগ, বলিয়াছিলেন, “রজোগুণ ও কর্মযোগ না হইলে এই জীবন্মৃত জাতি বাঁচিবে না।” দ্বিতীয়ত—ত্যাগ ও সেবার সাধনা। তৃতীয়—ছুৎমার্গ পরিহার। স্বামীজির এই বিরাট আহ্বানে ঘুমন্ত জাতি সাড়া দিয়াছিল—কঙ্কালে প্রাণের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ও বিংশ শতকের আরম্ভে বিবেকানন্দই জাতিকে নবজীবনের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতেন, মানুষের জন্য মানুষের, সম্প্রদায়ের জন্য সম্প্রদায়ের, জাতির জন্য জাতির অগ্নিময় সহানুভূতিই শুধু ভেদবুদ্ধিতে জর্জরিত পৃথিবীকে কল্যাণের স্বর্গে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। “আর কিছুতেই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবন-গতি নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু, জীবন থাকিতেও উহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ।” সমস্ত মানুষকে ভালবাসা, সমস্ত মানবজাতিকে আত্মার আত্মীয় বলিয়া অনুভব করা—ইহাই স্বামীজির জীবন-দর্শন। “ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।” তিনি আরো বলিলেন—“কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই

মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে।" তাই তো তাঁহার কণ্ঠে অদ্বৈতবাদের শঙ্খনির্ঘোষ, বেদান্তের উচ্ছ্বসিত জয়গান। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ব্যক্তিত্বকে গৌরবদান করিবার এই যে মহানুভবতা—এই মহানুভবতাই তাঁহার জীবনের ও বাণীর বৈশিষ্ট্য। তিনিই ভারতের প্রথম সন্ন্যাসী যিনি দুই বাহু বাড়াইয়া মানুষকে দেবতা আর দরিদ্রকে নারায়ণ বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। ভারতের সমাজ ও মানব-সমাজের এমন সেবক মানুষের ইতিহাসে বুদ্ধের পর আর কখনো দেখা যায় নাই।

বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় রামানুজ। সমাজের অন্ধি-সন্ধিতে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জঞ্জালস্তূপ অপসারণ বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী সংস্কারকগণের সামর্থ্যে কুলায় নাই। এজন্য এক উদ্দাম ঝঞ্ঝনার প্রয়োজন ছিল। স্বামীজির কণ্ঠোচ্চারিত অদ্বৈত বেদান্তের হুঙ্কারে ভারতের আকাশে বাতাসে যে আলোড়ন উপস্থিত হইল, তাহার উন্মত্ত আবেগে ভারতের অচলায়তন সমাজ-জীবনের সমস্ত আবর্জনা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ভারতবাসীর, বিশেষ করিয়া বাঙালির অবরুদ্ধ জীবনস্রোতে যে পঙ্কিল আবিলতার উদ্ভব ঘটিয়াছিল, যে শ্বাস-রোধী প্রাণঘাতী বিষবাষ্পের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিবেকানন্দের বিপুল করুণার প্রবল প্লাবনে সেই বদ্ধজলার অবরোধ ভাঙিয়া গেল—যেমন একদা ঘটিয়াছিল চৈতন্যদেবের সময়। বাঙলার শ্রীচৈতন্য একদিন যেমন বাঙালিকে মানবধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন, বাঙলার বিবেকানন্দও তেমনি বাঙালিকে, ভারতবাসীকে সাম্যবাদের ভিত্তিতে নূতন করিয়া মানবধর্মে দীক্ষা দিলেন। রামকৃষ্ণের ইষ্ট ছিলেন কালী, কিন্তু বিবেকানন্দের ইষ্ট ছিলেন ভারত—পাপে পুণ্যে, দৈন্যে, ক্ষমতায় ও দুর্বলতায় মিশ্রিত পরিপূর্ণ ভারত। তাই না সেই তরুণ সন্ন্যাসী

ভারতবাসীর বক্ষে এমন এক স্রোতোবেগ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, যাহার কুলপ্লাবী বন্যা হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য ভাসাইয়া দিয়া তাহাকে নিষ্কলুষ করিয়া তুলিল। এক কৌপীন-সম্বল সন্ন্যাসীর প্রেরণার আগ্নিমন্ত্রে জাতির চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। বনের বেদান্তকে তিনি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে রূপায়িত করিতে চাহিলেন। তাঁহার নূতন জীবন-দর্শনের অমৃতপান করিয়া ভারতের জনজীবন এক অনিন্দ্য নির্মলতায় অনাময় হইয়া উঠিল। তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত মানবপ্রেমের কীর্তনে ঘুমন্ত দেশ সহসা যেন সঙ্গীতময় হইয়া উঠিল। এক অভিনব জঙ্গম কল্পতরুর আবেগ-বিহ্বল সঞ্চরণে জাতির জীবনে ছন্দ জাগিল। বিশ্বের পটভূমিকায় এই মহৎ অভ্যুদয়ের ইতিহাস আজিও রচিত হয় নাই!

অদ্বৈতের প্রচারক ছিলেন বিবেকানন্দ; কিন্তু তাঁহার ধর্মের বাণীর মধ্যে নিহিত থাকিত বিশ্বের কল্যাণ ও উন্নতিমূলক শান্তির বাণী। ধর্মের আলোকবর্তিকা দিয়া তিনি প্রদর্শন করিতেন প্রকৃত কর্মের পথ। কর্মযোগী বিবেকানন্দের নিকট কর্মকে বাদ দিয়া ধর্মের কল্পনা ছিল বিড়ম্বনা মাত্র। অদ্বৈতবাদকে অবলম্বন করিয়া মানুষ কিরূপে সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবনকে অনুভূতির শিখরে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে স্বামীজি তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতবাদকে তিনি মননের ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই—তাহার সত্য শক্তিকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নহে, সমাজ-জীবনেও তাহার অসীম কল্যাণকরী শক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে অদ্বৈতবাদ শুধু একটি বিজ্ঞান বা দর্শনরূপে প্রতিভাত হয় নাই। ইহা ছিল তাঁহার কাছে জীবনের কর্মভিত্তি, দৃঢ় শক্তি এবং

অভী মন্ত্রের পরম বিকাশ। বিবেকানন্দের সমস্ত শক্তির মূল এইখানে। জীবনের যত স্পন্দন তাহাতেই ব্রহ্মানুসন্ধান—ইহাই ছিল তাঁহার পথ। তাই তিনি নিখিল বিশ্বের আনন্দ-মূর্তির দিকে মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছেন আর দুঃখ-জরা-ব্যাধি-দারিদ্র্যকে আনন্দে বরণ করিয়া লইতে তিনি মানুষকে উদ্‌বোধিত করিয়াছেন। এই জন্যই বিবেকানন্দ সংসারকে ত্যাগ করিয়া আবৃত চক্ষু হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিযুক্ত হইতে উদ্‌বোধিত করেন নাই। তিনি কঠিন হইতে কঠিনতমকে, এমন কি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে আদেশ করিয়াছেন।

তাঁহার মানব-সেবার মূলে ছিল এই দৃষ্টি। এই দৃষ্টি যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর ছিল। মানুষের অন্তর সমাজের সমস্ত বিষয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে ঠিকভাবে জাগ্রত হয় না। অথচ মানুষকে ব্রহ্মরূপে দেখিয়া সেবা করিতে পারিলে তাহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়—হৃদয়ের প্রকাশ ব্যাপক হয়। স্বামীজির লোকসেবা—মানুষকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা। এই সেবাই উপাসনা। এই উপাসনার আশ্রয়েই হৃদয় ব্যাপকজীবনে ব্রহ্মানুভূতির স্পর্শ পায়। এইরূপ বেদান্তভিত্তিতে বিবেকানন্দ কর্মজীবনে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই কর্ম শুধু নিষ্কাম কর্ম নয়, দৃষ্টি এখানে ভিন্ন। এই দৃষ্টি সমস্ত সঙ্কোচকে দূর করিয়া সেবার অনুভূতিকে গরীয়ান করিয়া তুলে এবং ইহার ফলে প্রেমের স্পন্দনে বিশ্বসত্তার অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায়। অদ্বৈততত্ত্বকে জীবনে গ্রহণ করিবার এমন পথ আর নাই। প্রাণের সঙ্কোচ নষ্ট করিতে হইলে এবং মহাপ্রাণ আকর্ষণ করিতে হইলে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত মার্গ শ্রেষ্ঠ মার্গ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

স্বামীজির প্রেম ছিল শাশ্বত জ্ঞানোপলব্ধির শান্ত মহিমময় বিকাশ—হৃদয়-বৃত্তির ভিতর দিয়া অদ্বৈতের ভাববিনিময়। স্বামীজি বাঙালি জাতির মেধা ও মনীষা লইয়া বেদান্তকে এক নূতন মূর্তি দিয়া গিয়াছেন। জীবনের সর্বদিক তিনি স্পর্শ করিয়াছেন বেদান্তের তত্ত্বদ্বারা এবং জীবনের প্রতি ধারাকে ক্ষিপ্রতর করিয়া ব্রহ্মানুভূতির দিকে অগ্রসর করিয়াছেন। বেদান্ত কিরূপে মানুষের সমস্ত অধিকারকে অব্যাহত রাখিয়া মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিতে পারে তাহা বিবেকানন্দের প্রতিভা দেখাইয়াছে। তাঁহার বেদান্ত-দৃষ্টি নিঃসন্দেহে তাঁহার নূতন সৃষ্টি। মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাসে এমন জিনিস কখনো দেখা যায় নাই। তিনি নিজের জীবনে যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বিবেকানন্দের বাণী শক্তির, বিশ্বের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর প্রভুত্বের, গোষ্ঠী ও ব্যষ্টির স্বাধীনতার, কাপুরুষতাকে চূর্ণ করার সাহসের এবং বিশ্ববিজয়ের। জার্মান দার্শনিক নীট্‌সে বাইবেলে বর্ণিত জীবন-দর্শন অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষ মানবীয় ও আনন্দময় জীবন-দর্শনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখমাত্র করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে অকস্মাৎ সেই আনন্দময় জীবন-দর্শন ব্যক্ত হইল। ভারতের এক অজ্ঞাত তরুণ সেই বাণী শুনাইলেন। নীট্‌সে শুধু সমালোচনাই করিয়াছিলেন, কিন্তু পথ দেখাইলেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের সমস্ত চিন্তা ও কার্যকলাপ শক্তিযোগেরই প্রকাশ। বিশ্বামিত্র বা প্রমিথিউসের মত তিনি নূতন বিশ্বসৃষ্টি করিতে এবং সুখ, স্বাধীনতা, দেবত্ব ও অমরত্বের আগুন ছড়াইতে চাহিয়াছিলেন। এই শক্তিযোগের বলেই তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে স্বদেশ

ও বিশ্বের জন্য এত কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। অবতার ভিন্ন এমন অসাধ্য সাধন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। "শক্তি, উপনিষদের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমি এই শক্তির কথাই দেখি……আমি তাই বলি, হে মানুষ, উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত।" বিবেকানন্দের দর্শন প্রকৃতির বন্ধনের সর্বপ্রকার দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা। তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

বিবেকানন্দের সক্রিয়বাদের মধ্যে আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি'র নীতি দেখিতে পাই। তাঁহার বিরামহীন সংগ্রাম শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক হইতেই চিরগতিশীল। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রেরণা। কাজই ছিল তাঁহার জীবন। তিনি সর্বদাই গতিশীল। বিবেকানন্দের দর্শনকে অনুসরণ করিতে হইলে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে, এক আদর্শ হইতে অন্য আদর্শে, এক প্রথা হইতে অন্য প্রথায় বিচরণ করিতে হয়। ক্লৈব্যের নীতি দূর করিয়া তিনি মানুষের নব-জন্মের, প্রকৃতি ও মানুষের স্থানে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার দর্শনের মধ্যে ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহারই কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া প্রাচীন যুগের অথর্ব বেদের মানুষ এই যুগে আমাদিগকে নূতন করিয়া শুনাইলেন: "পৃথিবীতে আমিই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও সর্বজয়ী।" পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন ভারতের নূতন দিগ্বিজয় বিবেকানন্দের জীবন-দর্শনকে চিরদিনের মত চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার প্রচারিত বেদান্তের বাণী দ্বারা তিনি আত্মার অবমাননা, কাপুরুষতা এবং নেতি ও নৈরাশ্যমূলক চিন্তার ধারাকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

রামকৃষ্ণের সাধনার মধ্যে বিবেকানন্দ একটি নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন—অনুন্নত শ্রেণী আর স্ত্রীজাতির উন্নতি। ভারত-

সন্তানের মাতৃ-মহিমা-বিস্মৃতির অনিবার্য ফলস্বরূপে দেখা দিল স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্পর্কে তাহার দারুণ উপেক্ষা। নারীর প্রতি যে পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গী আবহমান কাল হইতে ভারত-সংস্কৃতিকে প্রভূত শক্তি ও উচ্চপ্রেরণা দিয়া আসিয়াছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বেদান্তের অধ্যয়ন হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। ফলে আত্মবিস্মৃতি আমাদের স্বার্থপরতা আর দুর্বলতার আকর করিয়া তুলিল। বিবেকানন্দ তাই চাহিলেন নূতন গার্গী-মৈত্রেয়ীর উদ্বোধন করিতে যাঁহারা কেবল বেদান্ত-বিচারে ক্ষান্ত থাকিবেন না, বেদান্তের প্রচার ও অনুশীলনও করিবেন। তিনি বলিলেন—"রজোগুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণ উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।"

এই জীবন-দর্শনের সমুন্নত মহিমার নিকটেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া মার্গারেট নোবল্ সেদিন নিবেদিতা হইয়াছিলেন। এইবার আমরা সেই নিবেদিতার কাহিনী বলিব।

॥ পাঁচ ॥

মার্গারেটের চিন্তায় এখন শুধু একটি নাম—ভারতবর্ষ। বত্রিশ নাড়ীর টানের মতই তিনি যেন ভারতভূমির আকর্ষণ বোধ করিলেন। অভীঃস্বরূপ বিবেকানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর, আমরা দেখিয়াছি, মার্গারেটের মনে সে কী প্রবল আলোড়ন, দিব্যভাবে সমস্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন, তরঙ্গরাজির মত সমস্ত চিন্তাধারা কুমারী-হৃদয়ে তীব্র আঘাত করিতেছে। তাঁহার জীবন-কাব্যের সে এক মধুরতম অধ্যায়। কে এই গৈরিকধারী, মূর্তিমান বীর্য, যাহার দুই চক্ষে দিব্যভাবের কমনীয়তা আর র‍্যাফেল-অঙ্কিত দিব্য বালকের দৃষ্টি! সেই দৃষ্টি তাহার জীবনে যেন প্রলয় ঘটাইয়া দিয়াছে। বিবেকানন্দকে শেষবারের মত চিঠি লিখিয়া মার্গারেট তাঁহার মনের ইচ্ছা অকপটে জানাইলেন। উত্তর আসিল।

মার্গারেটকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া বিবেকানন্দ লিখিলেন:

"এখন আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্য-লাভ হবে। ভারতের জন্য বিশেষ করে ভারতের নারী-সমাজের জন্য পুরুষের চেয়ে নারীর, একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহিয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না; তাই অন্য জাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্ত, তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করিয়াছে।"

চিঠি পাইয়া মার্গারেট যেন কৃতকৃতার্থ। জীবনের উদয়াচলে যেন শুভ অরুণোদয়। একদিন মায়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন:

"মা, আমি ভারতবর্ষে যাব। তুমি মত দাও।"

"বেড়াতে যাবি? বেশ তো, এর জন্য আবার জিজ্ঞাসা কেন?"

"না, মা, বেড়াতে নয়। আমি সেই দেশে গিয়ে চিরকালের মত বাস করব, সেই দেশে গিয়ে আমি নতুন করে জন্ম নেব, সেই দেশের সেবায় আমি জীবন উৎসর্গ করব। তুমি আশীর্বাদ কর, মা।"

"কার সঙ্গে যাবি?"

"স্বামীজির সঙ্গে—আমার গুরু, স্বামী বিবেকানন্দ।"

"ও, সেই হিন্দুযোগী! এ যে আমার কতবড় সৌভাগ্য, মার্গারেট। তিনি তোকে তাঁর দেশের সেবার জন্যে গ্রহণ করেছেন, এ-কথা তো বলিসনি আমাকে?"

"বলিনি পাছে তুমি কষ্ট পাও, রাগ কর।"

"কষ্ট! রাগ! কি যে বলিস্ তুই। তবে বলি শোন্। তোর জন্মের আগে থেকেই আমি তোকে ভগবানের চরণে দিয়ে রেখেছি! আর ভারতবর্ষ ত শুনেছি ভগবানেরই দেশ। সেই দেশে তুই যাবি, এ যে আমার কতবড় আনন্দ, মার্গারেট! শুধু একটা কথা আমাকে দিয়ে যা।"

"কি?"

"যেখানেই থাকিস, আমার অন্তিম সময়ে একটিবার এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাস, লক্ষ্মী, মা-টি আমার।"

ইসাবেল সর্বান্তঃকরণে কন্যাকে ভারতে যাইতে অনুমতি দিলেন। মার্গারেট সেই প্রথম শুনিলেন যে, মাতৃগর্ভে থাকিতেই তাঁহার জীবনের গতি নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

১৮৯৮। ২৮শে জানুয়ারী।

মার্গারেট ভারতবর্ষে আসিলেন।

এখন তিনি আর মিস্ এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল্ নহেন, ভারত-দুহিতা নিবেদিতা। গুরুর দেওয়া এই নাম। এই নামের মধ্যেই তাঁহার নবজন্ম। সেই নবজন্মের ক্ষণে গুরু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন :

জননী-হৃদয় আর সংকল্প বীরের,
মধুময় সুখস্পর্শ মৃদু মলয়ের,
দীপ্ত শিখা বাধাহীন আর্যবেদী মাঝে
যে পুণ্য মাধুর্য রাজে যে শক্তি বিরাজে,
ভাষাতীত স্বপ্নাতীত যাহা আছে আর—
তোমাতে বিলীন হোক—হউক তোমার।
ভবিষ্য ভারত যেন তোমা মাঝে পায়
একাধারে শিক্ষা-গুরু সেবক সখায়।

গুরুর এই আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। বিবেকানন্দের ভারতমন্ত্রই এখন হইতে নিবেদিতার জপমন্ত্র হইল। অরুণ-রাগে যেমন করিয়া ফুল পাঁপড়ি মেলিয়া দেয়, তেমন করিয়া নিবেদিতার হৃৎপদ্ম ফুটিয়া উঠিল গুরুর স্পর্শে।

নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিলেন। পিছনে পড়িয়া রহিল আত্মীয়-স্বজন, সম্পদ, ইংলণ্ডের সুসভ্য সমাজ, প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন জীবন। স্বদেশের স্বজন গৃহ-পরিবারের সুখময় ও নিরুদ্বেগ আশ্রয় ছাড়িয়া নিবেদিতা আসিলেন ভারতবর্ষে, আলিঙ্গন করিলেন দুঃখ-দারিদ্র্যকে, নিন্দা-অপমানকে। তাঁহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া গেল লণ্ডন, মুছিয়া গেল সুখ-সৌভাগ্য ও আভিজাত্যের গৌরবান্বিত জীবন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনাময় জীবন এক কথায় পিছনে ফেলিয়া নিবেদিতা আসিলেন ভারতবর্ষে ; এখানকার এক দরিদ্র পল্লীতে আরম্ভ হইল তাঁহার নূতন জীবন।

সেবা ও তপস্যার ভিতর দিয়াই সেই জীবন দিনে দিনে সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল।

কেমন করিয়া তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল? বিদুষী বুদ্ধিমতী, লোকচরিত্র অধ্যয়নে সুনিপুণা মার্গারেট নোবল্ কেমন করিয়া সর্বত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিয়া নিবেদিতা হইয়া ভারতের মাটিতে তাঁহার তপস্যার আসন পাতিলেন?

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?"

"পণ আমার জীবন-সর্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি।"

এই ভক্তি মার্গারেট নোবলকে পথের নির্দেশ দিয়াছিল। দীর্ঘ ঊনত্রিশটি বৎসর পার হইয়া মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্-এর জীবনে আসিয়া পৌঁছিল বিবেকের অভ্রান্ত ইঙ্গিত—জাগ্রত সত্তার অভ্রান্ত উত্তর। রাত্রির স্তব্ধতাকে মথিত করিয়া, নিদ্রাতুর পৃথিবীর ঘুমঘোরকে ধিক্কার দিয়া, মার্গারেটের সুপ্ত চেতনায় আঘাত হানিতেছে সন্ন্যাসীর সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর—"জাগো, জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, তোমার নিদ্রা যাইবার অবসর কোথায়?"

সেই ১৮৯৬ সালের ৭ই জুনের চিঠি!

সেই চিঠিতে এই আহ্বান তাঁহার কাছে পৌঁছিয়াছিল।

ধিক্কার, বিদ্রূপভরা কী নিদারুণ সেই জিজ্ঞাসা!

মার্গারেট দিশাহারা। কি উত্তর দিবেন তিনি?

অন্তর হইতে উপলব্ধি করিলেন, এই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার পরম ইপ্সিত জীবন-দেবতা। মার্গারেটের সমস্ত জীবনকে যেন দাবী

করিয়া আসিয়াছেন আজ তাঁহার দ্বারে—"মার্গারেট তুমি প্রস্তুত ?" এই আহ্বান তো উপেক্ষা করা যায় না। মনে পড়িল এক বক্তৃতায় গুরুর সেই অগ্নিক্ষরা বাণী—"জীবন কি ? সংগ্রামই জীবন। জীবনের অভ্রান্ত লক্ষণ—আত্মবিকাশ, এবং আত্মপ্রসার,—ইহাই ধর্ম ; আমি অন্য ধর্ম মানি না।" সেই জীবন-পথের তিনি পথিক হইতে চলিয়াছেন।

কিন্তু গুরু তাঁহাকে সহজে গ্রহণ করিলেন না। প্রথমে বলিলেন—"তোমাকে তোমার পূর্ব জীবন, পূর্ব সংস্কার, পূর্ব অভ্যাসের স্মৃতি পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে, দেহের ও প্রাণের প্রতি তন্তুতে অনুভব করিতে হইবে যে, তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, ভারতবাসীই তোমার জাতি। আমার ভারত-মন্ত্র আজ হইতে তোমার জপমন্ত্র হউক। তুমি প্রস্তুত ?"

আর দ্বিধা নাই।

পরম শ্রেয়ের জন্য এই চরম আহ্বান—জীবনে তো ইহা বার বার আসিবে না। আর সংশয় নাই। জাতিগর্ব, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অতি আপন জন্মভূমি আর স্নেহ-প্রেমদাত্রী পরিজন—সব কিছু মার্গারেট ত্যাগ করিলেন পরম শ্রেয়ের জন্য। এ শুভলগ্ন জীবনে একবারই আসে। বিবেকানন্দের স্পর্শে মার্গারেটের অন্তরে মহাপ্রাণ জাগিয়া উঠিল। নব-জীবনের তপস্বিনী হইতে চলিলেন তিনি।

নবজন্মের সেই মুহূর্তে আত্মসৃষ্ট এই কন্যাকে ভারতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিয়া বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিলেন—"যদি আমার নিজের কোনো অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তোমাকে আমি বলিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই বলি বৃথা হউক ; আর যদি ইহার মূলে সেই পরমাশক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি সার্থক হও, তোমার জয় হউক।"

জন্মান্তর হইল মার্গারেটের।

একই দেহে দুইবার জন্ম।

১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আয়ার্ল্যাণ্ডের কোলে মার্গারেটের জন্ম। আর ১৮৯৮ সালের ১৬ই মার্চ ভারতের মাটিতে নিবেদিতার জন্মলাভ। পূর্বজন্মের পিতা স্যামুয়েল রিচ্‌মণ্ড। নিবেদিতার স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ।

ভক্তির শ্বেতপদ্ম হাতে লইয়া আরাধ্য দেবতা স্বামী বিবেকানন্দের আরাধনায় বসিলেন তিনি। অন্তরলোক হইতে যেন বাহির হইয়া আসিল—শুদ্ধ হৃদয়ের পবিত্রতা। তপোলোক হইতে যেন ঝরিয়া পড়িল তপস্যার রসনিঃস্যন্দ। তাঁহার জীবনের বীণায় বাজিয়া উঠিল বৈরাগ্যের রাগিণী। বিবেকানন্দের আরাধনা ভারতেরই আরাধনা। কারণ বিবেকানন্দের ভিতর দিয়াই নিবেদিতা পাইয়াছিলেন সেই ভারতবর্ষকে যে ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ সত্য ছিল, স্বর্গ ছিল।

সেই ভারতের আরাধনায় বসিলেন তিনি যেন তাপসী অপর্ণা।

কুসুমের মত সেই সুকুমার নবীন বয়সেই নিবেদিতা হইলেন ব্রতচারিণী। তিনি স্বয়ং অর্ঘ্য।

ফুল হইয়া তিনি ভারতমাতার চরণে তিলে তিলে শুকাইয়া যাইবেন।

ধূপ হইয়া পলে পলে নিজেকে জ্বালাইয়া করিবেন তাঁহার আরতি।

দীপ হইয়া দিনে দিনে নিঃশেষ করিয়া দিবেন নিজের অস্তিত্বকে।

তিনি নিবেদিতা।

নিবেদিতা আসিলেন ভারতবর্ষে। পরাধীন, অশিক্ষায় তমসাচ্ছন্ন সে ভারতবর্ষ। নিবেদিতার মনে পড়িল তাঁহার জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডকে। সে দেশও এমনি পরাধীন, এমনি উৎপীড়িত। নির্যাতিতের তো কোনো জাতি নাই। তাহার একটি পরিচয়—

সে দুঃখী, সে হতভাগ্য। আর এই হতভাগ্যের দুঃখ দূর করাই তো তাঁহার আবাল্যের স্বপ্ন। নিবেদিতার ভারত-প্রীতির মর্মকথা ইহাই। ইহার মূলে ছিল সেই মন্ত্র যাহা তাঁহার গুরু একদা তাঁহার কর্ণে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"। এখন হইতে তিনি এই মন্ত্রের সাধিকা। এই মন্ত্রের গুণেই আইরিশ-দুহিতা মার্গারেট হইলেন ভারত-দুহিতা নিবেদিতা।

বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষিত কণ্ঠে একদা ধ্বনিত হইয়াছিল—"নারী অনন্ত শক্তির আধার। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না।"

ভারতে সেই মহাশক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিবার প্রয়োজনেই নিবেদিতার সৃষ্টি। তাঁহার মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম গার্গী, মৈত্রেয়ী ও সঙ্ঘমিত্রাকে। বৈদিকযুগের ব্রহ্মবাদিনীর প্রতিচ্ছবি তিনি। বিবেকানন্দ জানিতেন ভারতের অলৌকিক অধ্যাত্মসাধনার প্রবাহ, অমৃতত্বলাভের আহ্বান চিরদিন ভারতীয় নারীর অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। অধীর আবেগে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে পরম শ্রেয়ঃ লাভের উদ্দেশ্যে।

"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—উপনিষদের এই বাণী বিবেকানন্দ নূতন করিয়া ভারতের নারীর জীবনে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন। নিবেদিতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করিয়াছেন। নিবেদিতা তাই নবীন ভারতের হোমাগ্নিশিখা। ভারতীয় নারীর আদর্শ এই বিদেশিনী নারীর চরিত্রে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিল কেমন করিয়া?

এই দেশ, এই জাতি ও এই সমাজে নিজেকে এমন করিয়া বিলাইয়া দেওয়া তো কেবল ইচ্ছা ও সঙ্কল্পমাত্রেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

বাঙালি হিন্দু-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তিনি তাহার উঠানে একপাশে একটা স্থান করিয়া লইয়াছিলেন ; সেজন্য নিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে করিতেন না ; সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ না করিলেও নিবেদিতা তাহাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতার বয়স তখন উনত্রিশ বৎসর। তিনি য়ুরোপীয় ভাব-চিন্তা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব উত্তমরূপে অধিগত করিয়াছেন। তাঁহার ধীশক্তি ছিল আশ্চর্য আর সেই সঙ্গে ছিল স্বাধীন চিন্তা। এ সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ করিতে সক্ষম হইলেন কেমন করিয়া ? জন্মান্তর-গ্রহণের রহস্যভেদ করিতে হইলে তাঁহার গুরুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়।

নিবেদিতার সমগ্র জীবনই নিরবচ্ছিন্ন গুরুমন্ত্রের সাধনা।

তাঁহার আত্মবিলোপ গুরুতেই আত্মবিলোপ।

তাঁহার ভিতরে সত্য ছিল। ছিল অসামান্য ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি। নিঃসন্দেহে তাহা বিবেকানন্দকে বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল। সেই শক্তিকে এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে একমাত্র তিনিই পারিয়াছিলেন।

যাহার প্রকৃতি ও প্রয়োজন যেমন, তাহার সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহা সত্য। কিন্তু সর্ব সত্য নয়। বাহিরের কোনো অসাধারণ ব্যক্তি-পুরুষের সংস্পর্শেই ভাগ্যবান নর বা নারীর জীবনে আশ্চর্য রূপান্তর সম্ভব। আমাদের শাস্ত্রেও তাই শুধুই 'মনুষ্যত্ব' এবং 'মুমুক্ষত্ব' যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তাহার সঙ্গে 'মহাপুরুষ-সংশ্রয়' অত্যাবশ্যক বলা হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতার জীবন-কাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনি স্বামীজির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের পূর্ব ও পরবর্তী জীবন তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার কেবল ঐ মহাপুরুষ-সংশ্রয়টাই যেন বাকী ছিল।

যেমন তাহা ঘটিল, অমনি তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ণ করিয়া আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। সেই লগ্নের সেই অনির্বচনীয় আনন্দের প্লাবন-বেগ তাঁহাকে কিরূপ বিহ্বল করিয়াছিল—তাহা তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

যে মুহূর্তে সর্বত্যাগ—সেই মুহূর্তেই সর্বপ্রাপ্তি।

সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতেই ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন করিয়া না পাইলে, এমন করিয়া দান করিতে কেহ পারে না

নিবেদিতা নিজেই বলিয়াছেন—"ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম ; এবং তাঁহার স্বজাতি-প্রেমের নিকট আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য-স্বীকার, ইহা শুধু তাঁহার চরিত্রের নিকটেই।...তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্যে অতীব মুগ্ধ হইয়াই আমি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলাম।" গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই সূক্ষ্ম সম্পর্কটি তলাইয়া বুঝিবার মত।

বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা—গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক এমনই অপূর্ব যে, তাহা চিন্তা করিলে দেহধারী আত্মার অনন্তলীলা একটি নূতন রসরূপে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। একদিকে বীর-সন্ন্যাসীর সেই সুকঠিন চরিত্র ও দৃপ্ত পৌরুষ—যে-পৌরুষ সকল মমতা, সকল দুর্বলতাকে নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, আর একদিকে তেমনই সুকঠিনা চরিত্রা ও তেজস্বিনী নারী—সে তেজও যজ্ঞবেদীর হোমানল শিখার মত। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্জ্বলন্ত পৌরুষই সেই তেজস্বিনী নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই যে তেজ, চিত্তের এই দুর্দমনীয়তা—ইহাই ছিল তাঁহার জন্মগত প্রকৃতিগত সম্পদ ; ইহাই ছিল নিবেদিতার নিজ আত্মার মূলধন।

বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বলে, এই বস্তুটিকে তাঁহার মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং ইহা যে হোমাগ্নির মতই পবিত্র, তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই ইহা তো কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিবে না, কোনো বন্ধন মানিবে না। বিদ্রোহী নরেন্দ্রকে একদা রামকৃষ্ণ তাঁহার অদ্ভুত প্রেম দিয়া জয় করিয়াছিলেন। বিপ্লবী মার্গারেটের ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের ছিল দুর্দ্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম।

পর্বতেরমত অটল।

পাষাণের মত কঠিন।

সেই পুরুষের অন্তরে যে প্রেমের সুধানিঃস্যন্দিনী নিত্য প্রবাহিত ছিল তাহা সকলের বোধগম্য হইত না।

আইরিশ কুমারী মার্গারেট যেদিন ভগিনী নিবেদিতা হইলেন, সেইদিন হইতে তিনি সেই প্রেমের স্পর্শ নিবিড় ভাবে লাভ করিয়াছিলেন—তেমন করিয়া বোধ হয় আর কেহ লাভ করে নাই। কারণ সে প্রেম এমনই যে, তাহাকে অনুভব করিতে হইলে, অগ্নিশিখায় দেহ স্পর্শ করিয়া তাঁহার জ্বালা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হয়।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর প্রতি যে প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহার মূলে যদি নারীপ্রকৃতিসুলভ কোনো আকুতি মর্মান্তিকরূপে বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, গুরু বিবেকানন্দ তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন; নিবেদিতা নিজেরই পুণ্যবলে গুরুর সেই ব্যক্তিত্ব-সম্পর্কহীন মহাপ্রেমের অপূর্ব রস আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যে নারী-প্রকৃতি ছিল, তাহাকে বিবেকানন্দ কন্যারূপে, কল্যাণীমূর্তিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরম স্নেহে তাহাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই যে স্নেহ—ভগিনী নিবেদিতা

তাহাতেই তাঁহার নারী-হৃদয়ের গভীরতম পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনেতিহাসের ইহাই মর্মকথা।

সর্বত্যাগিনী তপস্বিনী নারী গুরুর চরণমূলে, গুরুর আদর্শের বেদীমূলে কেবলমাত্র সেইটুকুর আশ্বাসে নিজের জীবন, নিজের রূপ, যৌবন ও প্রতিভা পবিত্র পুষ্পাঞ্জলির মত নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

নিবেদিতা তাই নিকষিত হেম।

প্রোজ্জ্বল এবং পূত তাঁহার চরিত্র।

নিবেদিতা তাই চিরস্মরণীয়া ও বরণীয়া।

এইখানে আর একটি কথা বলিব। ১৮৯৫ সালে মার্গারেটের সহিত লণ্ডনে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ আর ১৮৭৯ সালে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সহিত নরেন্দ্রনাথের মিলন—এই দুইটি ঘটনাই ভবিষ্য যুগের অমরকাব্যের দুইটি মধুরতম অধ্যায়। কুমারী মার্গারেট যেমন সবিস্ময়ে ভাবিয়াছিলেন—"কে এই গৈরিকধারী, মূর্তিমান বীর্য, যাঁহার দুইচক্ষে দিব্যভাবের কমনীয়তা আর র‍্যাফেল-অঙ্কিত দিব্য বালকের দৃষ্টি!"—তরুণ ও সন্দিগ্ধচিত্ত নরেন্দ্রনাথও তেমনি ভাবিয়াছিলেন—"কে এই উন্মাদ, দিব্যভাবময় পুরুষ, যাঁহার স্পর্শে মর্মস্থল পর্যন্ত এমন আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে।"

সেই মার্গারেট আজ নিবেদিতা হইলেন—মুকুল যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হইল—যেমন নরেন্দ্রনাথ পরিণত হইয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দে। রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখিয়াছিলেন জ্ঞানসূর্য, তেমনি বিবেকানন্দ মার্গারেটের মধ্যে দেখিয়াছিলেন এক সিংহিনীকে। নরেন্দ্রনাথকে যে কারণে বিবেকানন্দ হইতে হইয়াছিল, মার্গারেটকেও ঠিক সেই একই কারণে নিবেদিতা হইতে হইয়াছিল—সেই 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়'—আদর্শকে সার্থক করিয়া তুলিবার

জন্য সকলের মাঝখানে থাকিয়া যুগচক্র ঘুরাইতে হইয়াছিল ইঁহাদের দুইজনকেই। ইহাই ছিল ইতিহাস-বিধাতার নেপথ্য-বিধান। বিবেকানন্দের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ভারতের সাধারণ মানুষ আর নারীজাতির উন্নতি। মার্গারেট প্রকাশ করিলেন গুরুর সেই আকাঙ্ক্ষার বেদীমূলে আত্মনিবেদনের সংকল্প। পূর্ণ রজোগুণ-সম্পন্না মার্গারেট নোবল শুদ্ধসত্ত্বগুণ-মণ্ডিতা নিবেদিতারূপে, তেজস্বিনী কল্যাণীরূপে ভারতের নারীসমাজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে অগ্রসর হইলেন। এক মহাজীবন আহ্বান করিল, আকর্ষণ করিল আর এক মহাজীবনকে। মার্গারেট হইলেন নিবেদিতা। এই নামটির মধ্যেই আছে এক বিদেশিনী নারীর নীরব আত্মোৎসর্গের এক আশ্চর্য ইতিহাস।

॥ ছয় ॥

গঙ্গার তীরে বেলুর মঠ তখনো নির্মিত হয় নাই। সবে মাত্র মঠের বাইশ বিঘা জমি কেনা হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে মার্গারেট নোবল্ আসিবার পর আমেরিকা হইতে আসিলেন মিসেস ওলি বুল ও মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড। ইঁহারাও স্বামীজির শিষ্যা। মার্গারেট আসিয়াছেন স্বামীজির আহ্বানে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার-ব্রতে জীবন সমর্পণ করিতে আর ইঁহারা আসিয়াছেন ইঁহাদের আচার্যদেবের জন্মস্থান দেখিতে ও আরো ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার পূতসঙ্গ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে। ইঁহাদের থাকিবার জন্য গঙ্গার তীরে মঠের জায়গার উপরে ছোট ছোট কুটীর নির্মিত হইল। অদূরেই নীলাম্বর বাবুর বাগান। স্বামীজি থাকেন সেই বাগানে।

স্বামীজি নিজ দেশে নিজ জনের মধ্যে কেমন ভাবে থাকেন, মার্গারেণ্ট তাহা দেখিবার সুযোগ পাইলেন। এখন হইতে স্বামীজি মার্গারেটকে একান্তভাবে ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা-বিধানের উদ্যোগ করিলেন। প্রত্যহ কুটীরে কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তাঁহার পদার্পণে মার্গারেটের কুটীরখানি যেন তীর্থের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিত। সেইখানে গাছের ছায়াশীতল পাদমূলে বসিয়া গুরু তাঁহার এই কন্যাটিকে শিক্ষা দিতেন—তাঁহার নিকট অজস্র বচন-ধারায় ভারতবর্ষের গভীরতম তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিতেন। ভারতের আচার, অনুষ্ঠান, ইতিহাস, উপকথা, জাতি, জাতীয়ভাব, রীতিনীতি

সবই আলোচনা করিতেন আর মার্গারেট তাহা একাগ্রচিত্তে নিবিষ্টমনে শুনিতেন। ছাত্রীর উদ্যম ও নিষ্ঠা লইয়াই তিনি গুরুর নিকট হইতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; যাহা শুনিতেন তাহাই হৃদয়ে গাঁথিয়া যাইত।

শুধু যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন তাহা নহে, এই সময়ে তিনি নিবেদিতাকে নানা বিষয়েই শিক্ষা দিতেন। এইসব আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যোয়ান অব্ আর্ক অথবা ঝাঁসীর রাণী যেমন স্থান পাইত, তেমনি কার্লাইলের 'ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব'ও ছিল। স্বামীজি কার্লাইলের এই উদ্দীপনাময়ী বই হইতে অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করিয়া শিষ্যাকে শুনাইতেন। এইভাবে ধর্মের সহিত দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রও তিনি নিবেদিতার কর্ণে নিয়ত বর্ষণ করিতেন। কারণ, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিবলে স্বামীজি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার এই কন্যাকে আরো মহত্তর এবং ব্যাপকতর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে।

ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিবেকানন্দের নখদর্পণে, সকল শাস্ত্র তাঁহার জিহ্বাগ্রে, তাই তিনি এমন অপূর্ব ভাষায় নিপুণ কবি ও নাট্যকারের মত ঐ সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিতেন যে মনে হইত যেন ভারতের প্রসঙ্গ একখানি পুরাণ—সকল পুরাণের শেষতম এবং যে রূপেই উহার আরম্ভ হউক না কেন, উপসংহারে উহা সসীম বস্তুতন্ত্র ছাড়িয়া অসীমের প্রান্তে উপনীত হইত। বিবেকানন্দের শিক্ষা-প্রণালীও ছিল নূতন ধরণের। ভারতবর্ষের অনেক কথাই তিনি উল্লেখ করিতেন না, কিম্বা নামমাত্র উল্লেখ করিতেন, কিন্তু যতটুকু বলিতেন তাহাতে এমন তুলিকাস্পর্শ থাকিত যে, মার্গারেট নিজের কল্পনার সাহায্যে সেই অব্যক্ত অংশ পরিস্ফুট করিয়া লইতেন—রঙে ও রেখায় সম্পূর্ণ হইয়া সেই চিত্র তাঁহার

মনশ্চক্ষে উজ্জ্বল ভাবেই ফুটিয়া উঠিত; স্বামীজির প্রত্যেক কথায় ভারতবর্ষের প্রতি একটি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত—সেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা শিষ্যার অন্তরে সহজেই সঞ্চারিত হইত। কখনো কাব্যের দুই এক পদ, কখনো বা পুরাণের অস্ফুট চিত্রে তিনি তাঁহার এই শিষ্যার মনে হিন্দুর অতীত ও বর্তমান জীবনের সনাতন ভাবটি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন—তাহাতে কখনো হর-পার্বতী কখনো কালী, তারা কখনো বা রাধাকৃষ্ণের স্থান থাকিত। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস লইয়া তিনি সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোনো বিষয়ের অবতারণা করিতেন, তাহার ভিতর হইতেই অদ্বৈত অনুভূতির সাহায্যে এমন সব মীমাংসায় উপস্থিত হইতেন যে তাহার ভিতর নিবেদিতা চরম সত্যের আভাস পাইতেন। সে দৃশ্য দেখিলে মনে হইত যেন আবার প্রাচীন যুগ ফিরিয়া আসিয়াছে, যেন ব্রহ্মার মানসপুত্রের ন্যায় নির্মল-সংস্কার এক অসামান্য পুরুষ ভারতের ভাগ্যবিধাতার নির্দেশে ইহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিবার ইচ্ছায় বিদেশিনী এই শিষ্যার সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে আপন মর্মবাণী ব্যক্ত করিতেছেন।

অদ্ভুত শিক্ষক বিবেকানন্দ, নিবেদিতা অল্পদিনেই বুঝিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার মনে যত ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহা নির্মমভাবে চূর্ণ করিতে তিনি যেমন কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না, তেমনই আবার হিন্দু সমাজের ভিতরে যেমন বৈষম্য, বিভ্রাট বা আবর্জনা হিন্দু-জীবনকে বিষাক্ত ও পর্যুষিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারও কঠোর সমালোচনা করিতে পশ্চাদপদ হইতেন না। একদিন বলিলেন—"দেখ, আমি সমস্ত রকমের বন্ধনকে প্রাণের সঙ্গে ঘৃণা করি, সে বন্ধনের আকার যেমনই হউক না কেন। পায়ের শৃঙ্খল ফুল দিয়া ঢাকিলেও শৃঙ্খল তো বটে!"

গুরুর চরণ-প্রান্তে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতে করিতে মার্গারেটের মনে হইত—দ্বিতীয় বুদ্ধের মতন এই সন্ন্যাসীও চান ধর্মের রাজ্য সকলের নিকট সুগম হউক। মার্গারেটের নিকটে হিন্দুধর্মের যে অংশ দুর্বোধ্য বা অর্থহীন বোধ হইত, তিনি নিঃসঙ্কোচে গুরুকে উহা জানাইতেন। গুরু সূক্ষ্ম বিচার ও উদাহরণ দ্বারা সেই সকলের নিগূঢ় ভাব শিষ্যার মনে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেন। যে বিষয়টি পাশ্চাত্ত্য ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতগামী, তিনি সর্বাগ্রে সেইটারই যুক্তিযুক্ততা দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। হিন্দুর ধর্মাদর্শ, উপাসনা-পদ্ধতি এবং জীবনের গতি ও সেই সম্বন্ধে বিশ্বাস মার্গারেটের নিকট দুর্বোধ্য মনে হইত। তিনি সরল মনে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন আর বিবেকানন্দ দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ বিষয়ে শিষ্যাকে সযত্নে শিক্ষা দিতেন। অধীর হইতেন না, অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন না, এমন কি বিরক্তও হইতেন না কিংবা অপ্রাসঙ্গিক ও অকিঞ্চিৎকর মন্তব্যের প্রতি অবহেলা বা ঔদাসীন্য দেখাইতেন না বা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতেন না। পাশ্চাত্ত্যের ভাব প্রাচ্যের ভাব হইতে এতই বিভিন্ন, একের জন্ম-কর্ম, শিক্ষাদীক্ষা, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অপরের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কার হইতে এতই বিপরীত যে, বিবেকানন্দ প্রত্যেক সামান্য কথাও বিশেষ ধৈর্যসহকারে বারে বারে বুঝাইতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এইরূপেই তিনি মার্গারেটকে 'নিবেদিতা' করিয়া গড়িয়াছিলেন, এইরূপেই তাঁহার মনের সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতার মূল উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন। এইরূপেই তিনি প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্ত্যকে মিলাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কখনো শিক্ষার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। তিনি শিষ্যাকে নিজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে এবং প্রতিপদে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিতে এবং নিজেরই তাহা সংশোধন করিয়া লইতে উপদেশ দিতেন।

এই ভাবে মার্গারেটের মন প্রাচ্য ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিবার একটা বিশেষ হেতু ছিল। স্বামীজি জানিতেন এ কার্যের দায়িত্ব কতদূর গুরুতর এবং কত সুদূরপ্রসারী। তিনি জানিতেন, শিষ্যার দ্বারা এদেশে কোনো কার্য সম্পাদন করাইতে হইলে এ দেশের প্রতি তাহার আস্থা ও মমত্ববুদ্ধি জন্মান আবশ্যক; নতুবা তাহার পক্ষে এদেশে কাজ করা সম্ভব হইবে না। বেদান্ত ও হিন্দুধর্মের প্রতি মার্গারেটের আকর্ষণ একটি সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস বা অসার ভাবুকতা মাত্র কি না, ইহা স্বামীজি যাচাই করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই রকম কঠিন শিক্ষার ভিতর দিয়া তিনি নিবেদিতাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কারণ, দূর হইতে অদ্বৈততত্ত্বের মাহাত্ম্য যতই গৌরবময় ও তাহার জন্য প্রাণ সমর্পণের ইচ্ছা যতই লোভনীয় হউক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশের লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ও শতসহস্র বাধা, বিঘ্ন ও অসুবিধার পরিচয় লাভ করিয়া, সেই আদর্শের জন্য প্রাণপাত করিতে স্বীয় সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকা বড় সামান্য কথা নহে। এইজন্যই তিনি নিবেদিতার মনে ভারতীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুদক্ষ গঠন-শিল্পী ছিলেন বিবেকানন্দ, তাই না তিনি বিদেশী উপাদান দিয়া ত্যাগ, সেবা ও কর্মের এমন একটি সার্থক প্রতিমা নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন।

সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার তীরে গুরু ও শিষ্যা বসিয়া আছেন। গুরু বলিলেন—"যদি তোমাকে ভারতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয় তবে তোমাকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে চলিতে হইবে, এমন কি আহার-বিহার, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা প্রত্যেক বিষয়েই হিন্দুভাবাপন্ন হইতে

হইবে। তোমার উপর যখন মেয়েদের শিক্ষার ভার অর্পণ করিব ঠিক করিয়াছি, তখন তোমাকে হিন্দু বিধবার মতন সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে; তোমার কাজ ক্ষুদ্র পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া সমগ্র জাতি ও দেশের প্রতি ব্যাপ্ত হইবে। ভাবিয়া দেখ, তুমি পারিবে কি না?"

নিবেদিতা স্থির ও প্রশান্ত স্বরে বলিলেন—"আমি পারিব।" স্বামীজি লক্ষ্য করিলেন তাঁহার বলিবার ভঙ্গিতে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। তবু আর একবার বলিলেন—"তোমাকে এখন চিন্তায়, ভাবে, অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে। তোমার জীবনকে এখন ভিতরে বাহিরে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারিণীর আদর্শে গঠন করিতে হইবে। ত্যাগব্রতে দীক্ষিতা গার্গী ও দৃঢ়ব্রতা মৈত্রেয়ীর কথা তোমাকে বলিয়াছি। সেই রকম দীপ্তিশালিনী মহীয়সী নারী হইয়া তোমাকে ফুটিয়া উঠিতে হইবে। দেহজ্ঞান-বিরহিতা তপঃসিদ্ধা শবরীর কথা তোমাকে বলিয়াছি। গুরুর আদেশে আপনার যৌবনোচ্ছ্বসিত দেহকান্তি বিনষ্ট করিয়া দিয়া তাপসী শবরী কি ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্লভ দর্শনের পর জ্বলন্ত অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান। অমৃতের উদাত্ত আহ্বানে ভারতের নারী যুগে যুগে যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, তুমি সেইরকম পারিবে কি না?"

"পারিব।" আবার দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন নিবেদিতা।

"উত্তম। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলিতে হইবে—এমন কি তার স্মৃতিটুকু পর্যন্ত রাখিতে পারিবে না। ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিতে পারিবে না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বড়াই করিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে করুণার চক্ষে দেখিতে পারিবে না। ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আর্ত ও দুঃস্থের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। মীরাবাঈয়ের মত এই

ভারতবর্ষের জন্য সর্বসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। ইহাকেই তোমার জননী ও ধাত্রী বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। বল, পারিবে ?”

“পারিব।” তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ভক্তিমতী নিবেদিতা।

অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন নিবেদিতা। তাঁহার মুখে এক অপূর্ব নম্রতা, চক্ষে মধুর সারল্য আর অন্তরে প্রবল অনুরাগ। উৎকর্ণ হইয়া পরম আগ্রহে তিনি একে একে শুনিলেন স্বামীজির সকল নির্দেশ। যেন প্রাচীন ভারতের তাপস-কন্যা গার্গী দাঁড়াইয়াছেন মহর্ষি গর্গের সম্মুখে।

ইহার পর ১৮৯৮ সালের ১৬ই মার্চ বিবেকানন্দ মার্গারেট নোবল্‌কে ব্রহ্মচারিণী ব্রতে দীক্ষিত করিলেন। গুরু তাঁহার নূতন নামকরণ করিলেন—‘নিবেদিতা’। ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের ইতিহাসে ইহা একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। নিবেদিতার আগে কোনো পাশ্চাত্ত্য রমণীই এমনভাবে গোত্রান্তরিত হইয়া সন্ন্যাসিনী সাজেন নাই। ইহার পর বিবেকানন্দ তাঁহাকে ভারতের বেদীমূলে উৎসর্গ করিলেন এবং তাঁহার ললাটে আঁকিয়া দিলেন নূতন পরিচয়—ভগিনী নিবেদিতা। বিবেকানন্দ যে দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখিতেন এখন হইতে নিবেদিতাও সেই দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন।

মনের যে আবেগ লইয়া বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন, এখন হইতে নিবেদিতা সেই আবেগেই অনুপ্রাণিতা হইলেন। গুরুর চিন্তার সঙ্গে নিজের চিন্তাকে একেবারে মিশাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী গুরুর শিষ্যা সন্ন্যাসিনী সাজিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর ব্রত দিয়াছিলেন, কিন্তু নিবেদিতা গৈরিকধারিণী ছিলেন না। “স্বামীজি তাঁহাকে এক টুকরা গেরুয়া কাপড় দিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিত্য ধ্যানের সময় মাথার উপর চাপা দিতেন। কখনো কখনো তাঁহার

পরনে লাল ডুরে গাউন বা ঘাগড়া থাকিত—ইহাই অনেকের নিকট গেরুয়া বলিয়া প্রতীয়মান হইত। স্বামীজির বর্তমানে বা তাঁহার দেহান্তরের পরেও নিবেদিতা কোনও দিন পুরাদস্তুর গেরুয়া পোষাক ধারণ করেন নাই। কখন কখন সভায় বক্তৃতা দিতে হইলে পাতলা একটি কাপড় যাহা মাথার উপর দিয়া পরিতেন, তাহা কতকটা ফিকে কমলালেবুর রং, গেরুয়া বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।" তবে নিবেদিতার অন্তর ও বাহিরের বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে গৈরিকধারিণী বলিলে ভুল বলা হয় না।

স্বামীজির আদেশে সুপণ্ডিত স্বামী স্বরূপানন্দ গ্রহণ করিলেন নিবেদিতার শিক্ষার ভার। মঠের সন্ন্যাসীগণ. নব-দীক্ষিতা এই বিদেশিনী তরুণীকে পরম প্রীতিভরে গ্রহণ করিলেন 'ভগিনী' বলিয়া। সেইদিন হইতে নিবেদিতা 'ভগিনী নিবেদিতা'রূপে ভারতের ইতিহাসে খ্যাত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছেন :

"আমাদের বাড়িখানি কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে এক উচ্চ সমতল ভূমির উপর নির্মিত ছিল। ধ্বংসাবশেষপ্রায় ঐ বাড়িখানিকে সাদাসিধা অথচ স্বচ্ছন্দবাসের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল। জোয়ারের সময় ছোট পান্‌সীগুলি একেবারে সিঁড়ির নীচেই আসিয়া লাগিত। আমাদের এবং অপর পারের গ্রামখানির মধ্যে নদীটি বিস্তারে অর্ধ হইতে তিন-চতুর্থাংশ মাইল হইবে। উহার পূর্বতটে আরো প্রায় এক মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ও বৃক্ষশীর্ষগুলি দৃষ্টিগোচর হইত ; এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যানেই স্বামীজি তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণপদ-প্রান্তে বাস করিতেন।...এই বাড়িখানিতেই স্বামীজি প্রতিদিন প্রাতঃকালে একাকী, কখনো বা অন্যান্য গুরুভ্রাতার সঙ্গে আসিতেন। এইখানেই বৃক্ষতলে আমাদের প্রাতঃকালীন

জলযোগ সমাপ্ত হইবার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত আমরা বসিয়া বসিয়া একমনে স্বামীজির সেই অফুরন্ত ব্যাখ্যাপ্রবাহ শ্রবণ করিতাম। ভারতীয় জগতের কোনো-না-কোনো গভীর রহস্য তিনি ঐ সময়ে আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিতেন।...এইখানেই আমরা ভারতীয় চেষ্টাসমূহের সর্বজনবিদিত মূলমন্ত্র কি এবং কি আদর্শ দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত, তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার এইসব শিক্ষা ও আলোচনার ভিতর দিয়া ভারত তাহার অতীতের সমস্ত রূপৈশ্বর্য লইয়া আমার চিন্তায় ফুটিয়া উঠিত।

"কিন্তু বেলুড়ে আমরা শুধু স্বামীজিকেই দেখি নাই। সারা মঠই আমাদিগকে তাঁহাদের অতিথি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সেইজন্য এই অতিথিসৎকারপরায়ণ সাধুগণ কখনো আমাদের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ এবং কখনো বা সেবা-উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট যাতায়াতের কষ্ট স্বীকার করিতেন। যে গরুটি আমাদের দুধ দিত তাহাকে তাঁহারাই দোহন করিতেন, এবং যে ভৃত্যের উপর রাত্রিতে ঐ দুগ্ধ আমাদের নিকট পৌছাইয়া দিবার ভার ছিল, সে একদিন পথে গোখুরা সাপ দেখিয়া ভয় পাইয়া আর যাইতে অস্বীকার করায়, সাধুগণের মধ্যে একজনই এই ভৃত্যজনোচিত কার্যে তাহার স্থান গ্রহণ করিলেন। আমাদের ভারতীয় গৃহস্থালীর নিত্য নূতন সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য প্রত্যহ একজন করিয়া ব্রহ্মচারী মঠ হইতে প্রেরিত হইতেন। আর একজনের উপর বাংলা শিখাইবার ভার ছিল। সঙ্ঘের পুরাতন সাধুগণ প্রায়ই লৌকিকতা-ব্যপদেশে বা অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এই সকল এবং এইরূপ সহস্র সহস্র অন্য উপায়ে, আমরা সেই সকল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, যাঁহাদের মধ্যে সেই উজ্জ্বল স্মৃতির প্রকাশ দেখিতে পাইতাম, যে স্মৃতিরূপ 'টানা'র উপর এই সব ত্যাগীর জীবন 'পড়েনে'র মত বোনা হইয়াছিল।

"এই সন্ন্যাসিগণের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যাগ্রণী স্বামী বিবেকানন্দ। ইহাদের সকলেরই বিশ্বাস—স্বামীজির দ্বারা জগতের অনেক কাজ হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের।"

'তোমার দ্বারাও ভারতের অনেক কাজ হইবে"—এই কথা একদিন
নবেদিতাকে বলিলেন বিবেকানন্দ। "আমার জগদ্ধিতায় কর্মের
মারম্ভ তোমাকে লইয়াই—ইহা মনে রাখিয়া কায়মনোবাক্যে
ভারতের সেবায় নিজেকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া—সম্পূর্ণ করিয়া
তাল। তোমার জপের মন্ত্র অন্য কিছু নয়, শুধু 'ভারত ভারত'।".

নবেদিতার মনে পড়িল লণ্ডনে থাকিবার সময়ে স্বামীজি তাঁহাকে
একবার বলিয়াছিলেন—"আমার ·কথা ধরিতে গেলে, আমি
বদেশবাসিগণের উন্নতিকল্পে এই যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা
ম্পন্ন করিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে, দুই শতবার জন্ম পরিগ্রহ
করিব।" ভারতবর্ষে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই নিবেদিতা বুঝিলেন,
এই সন্ন্যাসী যেমন আদর্শবাদী তেমনই বাস্তববাদী ; কথা যাহা বলেন,
কাজের ভিতর দিয়া তাহা রূপায়িত করিয়া তুলিতে তাঁহার আগ্রহের
শষ নাই। মানুষটি শুধু বক্তৃতাই করেন না, নানাবিধ প্রচেষ্টার ভিতর
দিয়া তাহাকে সার্থক করিবার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট। লণ্ডনে
াহাকে দেখিয়াছিলেন শুধু একজন ধর্মপ্রচারকরূপে, এখানে আসিয়া
তাঁহাকেই দেখিলেন ভারতের উন্নতিকামী একজন নিরলস কর্মীরূপে।
এমন প্রচণ্ড কর্মের আবার নিবেদিতা আর কখনো দেখেন নাই।
এইখানেই গুরু ও শিষ্যার মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল ছিল।

লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষে আসিবার প্রাক্কালেই স্বামীজি নিবেদিতাকে
যাহা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মানসপটে তাহা দেদীপ্যমান ছিল।
একদিন রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে বেলুড়ের কুটীর-প্রাঙ্গণে বসিয়া
নিবেদিতার মনে হইল, এই নবজন্মের ভিতর দিয়া যে জীবন আরম্ভ
হইল, যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিলেন তাহা যদি ঠিকমত উদ্‌যাপন
করিতে না পারেন, তাহা হইলে গুরু কি তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন?

অমনি স্বামীজির সেই আশ্বাসভরা চিঠিখানির কথা মনে পড়িল— "তুমি ভারতের কল্যাণকল্পে কার্য কর বা নাই কর, তুমি বেদান্ত মত পরিত্যাগ কর বা বেদান্তবাদী থাক, আমি তোমাকে আমরণ সাহায্য করিব।" এমন গুরুর উপরই তো নির্ভর করিতে পারা যায়। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল, সেই আশ্রয় যে পরম আশ্রয় নিবেদিতার তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্র ছিল না।

১১ই মার্চ, ১৮৯৮।

স্থান—ষ্টার থিয়েটার।

আজ নিবেদিতা এখানে বক্তৃতা করিবেন।

ভারতবর্ষে ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা। সভাপতি বিবেকানন্দ স্বয়ং। কলিকাতার বিদ্বজ্জন-সমাজে স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন এই বলিয়া: Nivedita is the fairest flower of my work in England—"ইংলণ্ডে আমার কাজের সুন্দরতম বিকাশ নিবেদিতা।" অমনি সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠিল। রামকৃষ্ণের ভৈরব, নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে স্বামীজি তারপর শিষ্যাকে বক্তৃতামঞ্চে আহ্বান করিলেন। বক্তৃতার বিষয়—"ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব।" বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যা বক্তৃতা করিবেন শুনিয়া অসংখ্য জন-সমাগম হইয়াছে। নিবেদিতা দাঁড়াইয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে, 'আমার বন্ধু ও স্বদেশীয়গণ' বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র চারিদিক হইতে উচ্চ করতালি-নিনাদ হইতে লাগিল। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিল। শিষ্যার সাফল্যে গুরুর বুক গর্বে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

এপ্রিলের শেষে কলিকাতায় হঠাৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইল। স্বামীজি তখন দার্জিলিঙে বিশ্রামের জন্য গিয়াছেন। প্লেগের সংবাদ পাইয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া রোগী শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শহরে তখন বিষম গোলযোগ। প্লেগের জন্য সরকারী নিয়মাবলী জনসাধারণের প্রাণে মহাআতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া পলায়নপর। মঠে ফিরিয়াই স্বামীজি নিবেদিতাকে ডাকিলেন। তাঁহাকে একটি ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রস্তুত করিতে বলিলেন— রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের দ্বারা পীড়িতের সেবা করা হইবে ইহাই হইবে ঘোষণাপত্রের স্থূল মর্ম।

নিবেদিতা সুন্দর করিয়া ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া তৈরী করিলেন। ঘোষণাপত্রের প্রত্যেকটি কথার ভিতর দিয়া আর্তের জন্য সেবার আহ্বান মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হইল। স্বামীজি উহার বাংলা ও হিন্দী দুইটি অনুবাদ করিলেন। বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন পীড়িতের সেবার জন্য অগ্রসর হইল। একজন গুরুভ্রাতা বলিলেন, "টাকা আসিবে কোথা হইতে?"

"কেন? দরকার হইলে নূতন মঠের জমি-জায়গা সব বিক্রয় করিব। আমরা ফকির, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া গাছতলায় শুইয়া দিন কাটাইতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রয় করিলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাইতে পারা যায়, তবে কিসের জায়গা আর কিসের জমি?"

নিবেদিতা এই কথা শুনিলেন। গুরুর আর এক নূতন পরিচয় পাইলেন তিনি। ইহা তো সন্ন্যাসীর কথা নয়, সন্ন্যাসীর গৈরিক-বাসের অন্তরালে তিনি এক মানব-প্রেমিককে আবিষ্কার করিলেন সেইদিন। বুঝিলেন, তাঁহার গুরু শুধু শুষ্ক দার্শনিক বিচার লইয়া সময়ক্ষেপ করেন না বা মৌখিক উপদেশমাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকেন না।

মুখে যাহা বলেন কাজেও ঠিক তাহা পালন করিতে পারেন। এই জীবন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনিও অগ্রসর হইয়া আসিলেন পরিসেবিকারূপে। নিজে ঝাড়ু হাতে নামিলেন রাস্তা পরিষ্কার করিতে। গুরু সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার শিষ্যা শুধু কর্মী নহেন—তিনি চিরন্তনী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, যেন মূর্তিমতী সেবা। স্বামীজির আহ্বানে ভারতবর্ষে আসিবার তিন মাস পরেই আমরা ভগিনী নিবেদিতাকে নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়া প্লেগ রোগীদের সেবায় সানন্দে আত্মনিয়োগ করিতে দেখিতে পাই। তখনকার দিনে ইহা অতি অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইয়াছিল।

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্যর যদুনাথ সরকার পরবর্তিকালে লিখিয়াছেন :

"১৮৯৮ সালের প্লেগের সময় কলিকাতায় সে কী আতঙ্ক। এই মহামারীর সহিত শহরবাসীর কোনো পরিচয় ছিল না। কলিকাতার রাস্তাঘাটের আবর্জনা সাফ্ করিবার জন্য ঝাড়ুদার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একদিন বাগবাজারের রাস্তায় দেখিলাম ঝাড়ু ও কোদালি হাতে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা স্বয়ং রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করিতে নামিয়াছেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্তে লজ্জা বোধ করিয়া বাগবাজার পল্লীর যুবকেরাও অবশেষে ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নামিল। পরে শুনিলাম এই বিদেশিনী ভগিনী নিবেদিতা; স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহাকে লণ্ডন হইতে আনিয়াছেন। নাগরিক জীবনে স্বাবলম্বন শিক্ষার প্রথম পাঠ আমরা ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম। এই প্লেগ উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয়।"

এই প্লেগের সময়েই একদিন দেখা গেল, প্লেগে আক্রান্ত একটি শিশু নিবেদিতার ক্রোড়েই অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এমন নিঃশঙ্ক চিত্তে এই দুরন্ত মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর পরিচর্যা করা একমাত্র নিবেদিতার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

নিবেদিতা বাঙালির চিত্ত জয় করিলেন।

॥ সাত ॥

আজ সঙ্ঘ-জননী সারদাদেবী বেলুড়ে আসিবেন।

গুরুর মুখে নিবেদিতা ইঁহার কথা শুনিয়াছেন ; এখনো দেখেন নাই। মঠের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইলে একদিন নৌকা করিয়া সারদাদেবীকে মঠে আনা হইল। সঙ্গে গোলাপ-মা।

নৌকা ঘাটে লাগিল। মঠে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইল।

সারদাদেবী নৌকা হইতে নামিলে সন্ন্যাসীরা তাঁহার চরণ ধুইয়া দিলেন।

তাঁহাকে ঠাকুর-ঘরের দালানে বসাইয়া সকলে বাতাস করিতে লাগিলেন। বৈশাখের দারুণ মধ্যাহ্ন তখন। মায়ের যাহাতে কষ্ট না হয় সেইদিকে সকল সন্তানের দৃষ্টি।

নিবেদিতা এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বিবেকানন্দ তাঁহাকে মায়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। নিবেদিতা সঙ্ঘ-জননীকে আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিলেন। সারদাদেবী তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ইনিই সেই রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী! কী সহজ, কী সরল, কী মধুর! মমতার প্রাণময়ী প্রতিমা। যেন পুঞ্জীভূত পবিত্রতা। নিবেদিতার সমস্ত অন্তর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল।

বৈকালে ফিরিবার আগে সারদাদেবী সন্তানদের অনুরোধে মঠের নূতন জমিতে একবার পদধূলি দিলেন। নিবেদিতা সাগ্রহে সঙ্ঘ-জননীকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত জমি দেখাইলেন। মায়ের ইহাতে কত

আনন্দ। নরেন্দ্রের নৈবেদ্য এই নিবেদিতা। প্রসন্নমনে সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন সারদাদেবী। বিবেকানন্দ কৃতার্থ হইলেন।

সঙ্ঘ-জননী সারদাদেবীকে দেখিবার পর নিবেদিতার আগ্রহ হইল গুরুর গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরীকে দেখিবেন। গুরুর মুখে তাঁহার কথাও তিনি কতবার শুনিয়াছেন। তিনি আরো শুনিয়াছেন যে, আজো সন্ন্যাসী হইবার পরও, স্বামীজি প্রায়ই তাঁহার মাকে দেখিতে কলিকাতায় যাইয়া থাকেন। বিবেকানন্দ একদিন সঙ্গে করিয়া নিবেদিতাকে আনিলেন সিমলার তিন নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে তাঁহার পৈত্রিক বাসভবনে। ভুবনেশ্বরীকে প্রণাম করিলেন নিবেদিতা। গুরুর কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁহার এইখানে প্রথম আলাপ। নিবেদিতার বিনয়-নম্র ব্যবহারে দত্ত পরিবারের সকলেই মুগ্ধ হইলেন। ভুবনেশ্বরীর প্রিয়পাত্রী হইলেন তিনি অল্পদিনের মধ্যেই।

আর একদিন। বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষির ভবনে আসিলেন। গুরুর মুখে শুনিয়াছেন যে, পঁচিশ বৎসর পূর্বে বিবেকানন্দ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে প্রথম স্নেহাশীর্বাদ পাইয়াছিলেন। নিবেদিতা তাই তাঁহার দর্শনের জন্য উৎসুক ছিলেন।
মহর্ষিকে দর্শন করিয়া স্বামীজি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তারপর নিবেদিতাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। নিবেদিতা দুইটি গোলাপ ফুল দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদের আশীর্বাদ করিয়া বসিতে বলিলেন।
ইনিই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার।
যেন তুষারশুভ্র গিরিশীর্ষ। দৃষ্টিতে অপার করুণা।

জীবন-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মহর্ষির মুখের দিকে চাহিয়া নিবেদিতার মনে হইল ইনি যেন সংসার হইতে উর্ধতর ও পবিত্রতর লোকে বাস করিতেছেন। আর তাঁহাকে ঘিরিয়া বিরচিত হইয়াছে স্নিগ্ধ প্রশান্তির পরিমণ্ডল। দেখিয়া নিবেদিতা মুগ্ধ হইলেন।

গুরুর কাছে শুনিয়াছিলেন যে, অতুল ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও ইঁহার মন যৌবনেই বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বৈরাগ্য তাঁহার জীবনে আনিয়া দিল একটি পরম সার্থকতার অনুভূতি। গুরু বলিয়াছিলেন—"প্রাচীন বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রের জীবন্ত বিগ্রহ এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কৈশোরেই আমি ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলাম। ইঁহারই ধর্মোপদেশ আমার জীবনে একদা নূতন জীবন-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল।"

দশ মিনিট তাঁহাদের মধ্যে বাংলায় কথা চলিল। স্বামীজি যে-সব বাণী প্রচার করিয়া আজ যশস্বী হইয়াছেন, মহর্ষি একে একে তাহার উল্লেখ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, তিনি স্বামীজির প্রত্যেকটি ভাষণে গভীর আনন্দ ও গৌরব বোধ করিয়াছেন। এইখানেই রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া যখন বলিলেন, "তিনি নব্য-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি", তখন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয়ের মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া গুরুর প্রতি নিবেদিতার অন্তর গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণের উপযুক্ত শিষ্যই বটে। তারপর গুরু ও শিষ্যা দুইজনেই মহর্ষিকে প্রণাম নিবেদন করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমে স্বামীজির শিক্ষায় নিবেদিতা পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

ভারতের মর্মমূলে প্রবেশ করিয়া তিনি ইহার নূতন রূপ দেখিলেন।

দেখিলেন—"জরাগ্রস্ত, অকর্মণ্য ও প্রাচীন হইলেও ভারতীয় জাতির মধ্যে যৌবনোচিত তেজ ও বল দুই-ই আছে।"

বুঝিলেন—"ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, তথাপি ইহা অতি নির্মল ও পবিত্র। ত্যাগ এই দেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, দারিদ্র্য তাই এইখানে পাপের আকর নয়।"

জানিলেন—"যে দেশে নিত্য স্নান ও নিত্য গৃহদ্বার ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পরিষ্করণ ধর্মকার্যের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য, সে দেশে বাহ্যশৌচাচার কেন এত বরণীয়।"

গুরুর চোখ দিয়া নিবেদিতা যখন ভারতীয় জীবনকে দেখিতে লাগিলেন "তখন ইহার অদ্ভুত মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও মধুর সরলতা বিচিত্রবর্ণ-সম্পদযুক্ত ছায়ালোক চিত্রের ন্যায় মনোরম বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। রক্তরশ্মিবিকীরণকারী বালসূর্যের পানে বদ্ধদৃষ্টি, আবক্ষ গঙ্গাবারিতে নিমজ্জিত কৃতাঞ্জলিপুট শতসহস্র নরনারী, মার্জন-সমুজ্জল ভৃঙ্গার-হস্তে প্রত্যাবৃত্ত শুচি-স্বরূপিণী কুলরমণীগণ, গোবিন্দনামভজনরত পথের বৈষ্ণব ভিখারী এবং আপাদমূর্দ্ধা ভস্মাবৃতদেহ নাগা সন্ন্যাসী—সবই যেন তাঁহার চক্ষে চির-নূতন ও চিরমাধুর্য অভিষিক্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।"

ভারতে আসিয়া নিবেদিতা তাঁহার গুরুর মধ্যে আর একটি অপ্রত্যাশিত বস্তুর সন্ধান পাইলেন। তাহা বিবেকানন্দের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম আর মর্ম-যাতনা। এই সম্পর্কে নিবেদিতার নিজের মুখের কথা এই :

"ভারতীয় নারীকুলের শিক্ষাবিধান ও দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্তর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সেইজন্য একদিকে যেমন তিনি ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের বিশ্লেষণ করিতে কখনো ক্লান্তিবোধ করিতেন না, অপর দিকে তেমনি ইতিহাস, সাহিত্য,

কলাবিদ্যা ও অপর সহস্র স্থল হইতে ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া কেবল ভারতীয় আদর্শ-সমূহকেই বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। এমন কি বলিতেন, ভারতীয় চিত্রকলার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে শ্রীহীন মাটির পুতুলকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ উহার মধ্যে আধ্যাত্মিক আদর্শটাই আর একভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। ইহা ব্যতীত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনা, তাহাদের দোষগুণ প্রদর্শন ও জগতের ইতিহাসের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহার আলোচনা, পরস্পরের সৌসাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া প্রাচ্যের গৌরব কোন্‌খানে তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।"

গুরুর এই শিক্ষা যে ব্যর্থ হয় নাই, কিম্বা অপাত্রে বর্ষিত হয় নাই, নিবেদিতার পরবর্তী জীবনকালের ইতিহাসই তাহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। সে কাহিনী যথাস্থানে বলিব। সমগ্র ১৮৯৮ সালটা এইরূপ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইল। শিক্ষান্তে গুরু তাঁহাকে সর্বশেষ কথা বলিলেন—"ভারতকে ভালবাস।" এই ভারতকে ভালবাসাটাই এখন হইতে নিবেদিতার অস্থিমজ্জাগত হইয়া গেল। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ইহারই প্রতিচ্ছবি, ইহারই প্রতিধ্বনি। 'ভারত আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার'—এই ধৃতিকেই তিনি নিজ জীবনের স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শিক্ষাদান শুধু বেলুড়ে বসিয়াই হয় নাই। ভারতের ভৌগোলিক রূপের সঙ্গে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য স্বামীজি মে মাসের মাঝামাঝি শিষ্যাকে লইয়া উত্তর-ভারত ভ্রমণে বাহির হইলেন। সমুদয় পথ বহু শিক্ষাপ্রদ আলোচনায় অতিবাহিত হইল। সেই বিচিত্র কাহিনী নিবেদিতার লেখনীতে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে:

"মে মাসের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত আমরা কী অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়াই না গমন করিয়াছি! আর যেমন আমরা একটির পর

একটি নূতন স্থানে আসিতে লাগিলাম, কী অনুরাগ ও উৎসাহের সহিতই না স্বামীজি আমাদিগকে সেখানকার প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুটির সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন। প্রাচীন পাটলীপুত্র হইতেই এ-বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। রেলযোগে পূর্বদিক হইতে কাশীতে প্রবেশ করিবার মুখে উহার ঘাটগুলির যে দৃশ্য চক্ষে পড়ে, তাহা জগতের দর্শনীয় দৃশ্যগুলির অন্যতম। স্বামীজি সাগ্রহে উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটলীপুত্র ও বারাণসীর অতীত সমৃদ্ধি ও গৌরবের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিলেন না। তারপর আমরা যখন লক্ষ্ণৌতে পৌছিলাম তখন এখানে যে-সকল শিল্পদ্রব্য ও বিলাসোপকরণ প্রস্তুত হয় তিনি তাহাদের নাম ও গুণ বর্ণনা করিয়া লক্ষ্ণৌ-এর নবাবদিগের অধুনাবিলুপ্ত কীর্তিকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন।...আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, খামার ও গ্রামবহুল সমতল প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার প্রেম যেরূপ উথলিয়া উঠিত, অথবা তন্ময়তা যেরূপ প্রগাঢ় হইয়া উঠিত, এমন আর বোধ হয় কোথাও হয় নাই। এইখানে তিনি অবাধে সমগ্র দেশকে এক অখণ্ডভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ভাগে জমিচাষের প্রণালী অথবা কৃষক-গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করিতেন—কোনো খুঁটিনাটি বাদ যাইত না।

"সময়ে সময়ে মনে হইত যেন স্বদেশের অতীত গৌরববোধই স্বামীজির ষোল আনা মনপ্রাণ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। একদিন অপরাহ্ণে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বাতাসের মধ্য দিয়া তরাই প্রদেশ অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সময় তিনি আমাদিগকে যেন প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন যে, এই সেই ভূমি—যেখানে ভগবান বুদ্ধের কৈশোর অতিবাহিত ও বৈরাগ্যলীলা প্রকটিত হইয়াছিল। ভারতের প্রতি গ্রাম, প্রতি বৃক্ষ, এমন কি একটা সামান্য প্রাণী পর্যন্ত তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেমের ভাব উদ্দীপিত করিত।"

নৈনীতাল।

স্থানীয় দেবীমন্দিরের প্রতিমা খুব প্রসিদ্ধ। গুরুর কথায় নিবেদিতা একদিন সেই প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মন্দিরে তখন

আরতি হইতেছিল। আরতির ঘণ্টাবাছের সহিত সম্মুখেই নাটমন্দিরে তুইজন দেবদাসী নাচিতেছিল। নিবেদিতা জানিতেন না দেবদাসী কাহাকে বলে। তিনি মনে করিলেন, ইহারা বোধ হয় ভদ্রমহিলা হইবেন। আরতি শেষ হইলে নিবেদিতা দেবদাসীদের সহিত কথা বলিলেন। কথায় কথায় স্বামীজির পরিচয় পাইয়া দেবদাসী তুইজন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য স্বামীজির ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিবেদিতা সবিস্ময়ে দেখিলেন সকলেই তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না, স্বামীজিকে উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু নিবেদিতা যখন দেখিলেন করুণ-হৃদয় স্বামীজি সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া দেবদাসীদের দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। নিবেদিতা দেখিলেন তাঁহার গুরু, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মধুর কণ্ঠে দেবদাসীদের সঙ্গে আলাপ করিলেন, এবং যাইবার সময় তাহাদিগকে আশীর্বাদও করিলেন।

গুরুর লৌকিক জীবনের করুণাঘন মূর্তি দেখিয়া নিবেদিতা পুলকিত হইলেন।

আর একদিন।

নৈনীতালে হঠাৎ যোগেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হইল। মেট্রোপলিটান স্কুলে ইনি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কথায় কথায় যোগেশ বাবু প্রস্তাব করিলেন, যদি কিছু টাকা তুলিয়া গ্র্যাজুয়েটদের বিলাতে পাঠাইয়া সিভিল সার্ভিস পড়াইয়া আনা হয়, তাহাতে কিরূপ ফল হয়? তাহারা দেশে ফিরিয়া দেশের অনেক উপকার করিতে পারে কি না?

স্বামীজি। ওতে কিছু হবে না হে।

যোগেশ। কেন ?

স্বামীজি। ছেলেগুলো কেবল সাহেবী ঢং শিখে আসবে আর এদেশে এসে সাহেব-ঘেঁষা হবে। এটা একেবারে ধ্রুবসত্য বলে জেনে রেখে দাও। দেশের কথা তারা ভুলেও মনে করবে না।

কথা বলিতে বলিতে দেশের উন্নতি চেষ্টায় এদেশের লোকদের আলস্য ও উৎসাহের অভাব স্মরণ করিয়া বিবেকানন্দ এতদূর মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, সত্যই তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নিবেদিতা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধ হৃদয়ে সন্ন্যাসীর সেই গলদশ্রুপূর্ণ মুখ দেখিলেন। এই দৃশ্য তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিল।

তাঁহার গুরু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

কিন্তু ভারতবর্ষের কথা সন্ন্যাসীর হৃদয়ের পরতে পরতে জাগ্রত।

দেখিলেন—ভারতই তাঁহার প্রাণ, ভারতই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান।

বুঝিলেন—এই সন্ন্যাসী কেবল ভারতের কথাই ভাবেন, ভারতের জন্য কাঁদেন। তাই বুঝি ভারতের জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। তাই বুঝি তাঁহার বক্ষের প্রতি স্পন্দনে, ধমনীর প্রতি শোণিত-বিন্দুতে ভারতের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা নাই।

তাই বুঝি নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ সর্বদা বলিতেন, আর কিছু নয়, শুধু—ভারতকে ভালবাস।

সেই জপের মন্ত্রই বুঝি তিনি শিষ্যার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

এমন গুরুর শিষ্যা হইতে পারিয়া নিবেদিতা আজ নিজেকে আর একবার ধন্য মনে করিলেন।

নৈনীতাল হইতে আলমোড়া।

এইখানে শ্রীমতী এ্যানি বেশান্তের সহিত স্বামীজির দুইবার সাক্ষাৎ হইল। দুইবারই তাঁহার সঙ্গে নিবেদিতা ছিলেন। য়ুরোপীয়

সভ্যতার উদ্যান হইতে সুন্দরতম যে ফুলটি বিবেকানন্দ চয়ন করিয়া আনিয়াছিলেন, আজ তাহার সর্বাঙ্গীন রূপান্তর বেশান্তকে পর্যন্ত মুগ্ধ করিল। সন্ন্যাসিনী ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা তাঁহার স্বদেশীয় এই মহিলার নিকট শুধু বিস্ময় নয়, শ্রদ্ধাও উদ্রেক করিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বেশান্ত বুঝিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের এই শিষ্যাটি মনে-প্রাণে সত্যই ভারত-দুহিতা।

একদিন। সকালবেলা। কথা উঠিল সভ্যতার কেন্দ্রীয়-আদর্শ লইয়া। স্বামীজি দেখাইলেন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে সত্যানুরাগ এবং প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে সতীত্ব। কথাটি নিবেদিতার বড় সুন্দর লাগিল।

আর একদিন। সকালবেলা। আজ আলোচনার বিষয় ছিল মুঘল ইতিহাস। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আগ্রার তাজমহল আপনার কেমন লাগে?" উত্তরে বিবেকানন্দ বলিলেন—"একটা অস্পষ্ট ম্লানিমা—একটা ক্ষীণ আভাস এবং অদূরে চিরবিশ্রাম।"

নিবেদিতা। শাহজাহানকে আপনার কেমন মনে হয়?

বিবেকানন্দ। মোঘল বংশের কুল-তিলক। অমন সৌন্দর্যবোধ ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্রাট শাহজাহান নিজে একজন কলাবিৎ ছিলেন। আমি তাঁহার স্বহস্তে চিত্রিত একখানি হস্ত-লিখিত পুঁথি দেখিয়াছি—তাহা ভারতীয় প্রতিভার গৌরবস্থল। কী প্রতিভা!

এইখানে আরেক দিন চীনের কথা উঠিল। স্বামীজি নিবেদিতাকে বলিলেন—"জানো, চীন জগতের রত্নভাণ্ডার। সেখানকার মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে আমি যে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।"

এই কথা বলিবার সময়ে, নিবেদিতা লক্ষ্য করিলেন, স্বামীজির শরীর আনন্দের আবেগে তেমনি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ইতিহাসের অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে নিবেদিতা দেখিতেন, স্বামীজি কখনো ইতালীতে চলিয়া গেলেন এবং সেই দেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—"সেই ধর্ম ও শিল্পের দেশ—য়ুরোপে যার জুড়ি নেই—সাম্রাজ্য নির্মাণ ও ম্যাট্‌সিনির দেশ—স্বাধীনতা, শিক্ষা ও ভাবের জননী।"

নিবেদিতা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেন আর সন্ন্যাসীর মধ্যে মহাপ্রাণ এক ঐতিহাসিককে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন!

একদিন শিবাজীর প্রসঙ্গ উঠিল। মারাঠার বীরত্বের প্রশংসায় স্বামীজি পঞ্চমুখ হইলেন। কেমন করিয়া তিনি এক বৎসর সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রায়গড়ে ফিরিয়াছিলেন, সেই কাহিনী বলিয়া তিনি বলিলেন—"তাই আজ পর্যন্ত ভারতের রাজশক্তি সন্ন্যাসীকে ভীতির চক্ষে দেখেন, পাছে গেরুয়া বসনের ভিতর হইতে আবার একটা শিবাজী বাহির হইয়া পড়ে।"

আর একদিন। আজিকার বিষয় বুদ্ধ। বুদ্ধ-চরিত আলোচনায় একজন শ্রোতা স্বামীজির একটি কথায় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী মনে করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"এ কি স্বামীজি, আমি জানিতাম না যে আপনি একজন বৌদ্ধ!" নিবেদিতা দেখিলেন, অমনি বুদ্ধের নামে ভাবরাগোজ্জ্বল মুখখানি প্রশ্নকর্তার দিকে ফিরাইয়া বিবেকানন্দ বলিলেন—"আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস। তাঁহার সমতুল্য এ পর্যন্ত কে হইয়াছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—নিজের জন্য কখনো একটি কাজ করেন নি। বিশাল হৃদয়ের দ্বারা সমগ্র জগৎকেই আলিঙ্গন করিয়াছেন। রাজপুত্র হইয়াও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এত করুণা যে একটা ছাগশিশুর জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত, এত

প্রেম যে একটা ব্যাঘ্রীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—চণ্ডালেরও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, আর বাল্যকালে এই অধমকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।"

নিবেদিতার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্যই যেন এই সব প্রসঙ্গ তিনি তুলিতেন আর অনর্গল সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন, কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেন না। গুরুর মুখে আজ বুদ্ধের মহিমা শুনিতে শুনিতে নিবেদিতা তন্ময় হইয়া গেলেন। এই সন্ন্যাসীর মধ্যেই তিনি যেন বুদ্ধের বিশাল হৃদয়, করুণা ও প্রেম একত্রে প্রত্যক্ষ করিলেন।

নিবেদিতা আর একবার নিজের জন্ম সার্থক মনে করিলেন।

একদিন নিবেদিতাকে স্বামীজি শুকদেবের আখ্যান বলিলেন। সন্ধ্যার ধূসর আলোছায়ায় আলমোড়ার দিগন্ত-প্রসারী কৃষ্ণ শৈলমালার পরপারে শঙ্করগিরির উপর চাহিয়া চাহিয়া তিনি এই গল্প শুনিলেন। জননীর গর্ভেই ছিলেন পঞ্চদশ বর্ষ। ষোড়শ বর্ষে শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন। ষোড়শ বর্ষের শিশু পিতা-মাতা কাহাকেও চিনিলেন না। যে দিকে দুই চক্ষু যায় নগ্নদেহে শিশু সেইদিকেই চলিলেন; পিতা ব্যাসদেব পশ্চাতে। এই শুকদেব মহাযোগী, মহাজ্ঞানী—আদর্শ পরমহংস। তিনিই সচ্চিদানন্দ সাগরের অমৃতবারি এক অঞ্জলি পান করিয়াছিলেন। শেষে স্বামীজি বলিলেন—"আমার চক্ষে শুকদেবই সাধুত্বের আদর্শ বিগ্রহ।" এই বলিয়া স্বামীজি শিববাক্য আবৃত্তি করিলেন—'অহং বেদ্মি, শুকো বেত্তি, ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।"

শুকদেবের মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে স্বামীজি এমনই আত্মহারা হইয়া উঠিলেন যে নিবেদিতার মনে হইল, এই সন্ন্যাসীর মধ্যেও যেন একটি শুকদেব আছেন।

এমনভাবে কত কথা, কত প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া গুরু-শিষ্যের ভ্রমণের অবসর যাপিত হইল। ইতিহাস পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া যীশু খৃষ্ট, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মীরাবাঈ কিছুই বাদ যায় নাই। নিবেদিতা আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিতেন যে, এই সব বহু ও বিচিত্র আলোচনার মধ্যেও সময়ে সময়ে মানুষের জীবনের দুর্বিসহ কষ্টের কথা মনে পড়িলেই স্বামীজি অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইতেন এবং হঠাৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। এই আলমোড়া থাকিবার সময়েই বাড়ি হইতে একদিন স্বামীজির এক ভগিনীর মৃত্যু-সংবাদ আসিল। নিবেদিতা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

অতঃপর কাশ্মীর। ঠিক হইল স্বামীজি কাশ্মীরের তুষার-তীর্থ অমরনাথ দর্শনে যাইবেন। সঙ্গে যাইবেন নিবেদিতা। শ্রীনগরে আসিয়া স্বামীজি একমাস বিতস্তা নদীর ধারে কাটাইলেন। মুখের বিশ্রাম নাই, শিষ্যাকে উপলক্ষ্য করিয়া গল্প, উপদেশাদি সমানভাবেই চলিতেছে। কহ্লানের 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে কন্যাকে কাশ্মীরের ধর্ম-বিপর্যয়ের কাহিনী কিছু শুনাইলেন। অশোক হইতে কনিষ্কের আমল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের কত উন্নতি অবনতি ও ক্রমবিস্তৃতি হইয়াছে, শৈবো-পাসনার ইতিহাস, বৌদ্ধ-ধর্মের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন। চেঙ্গীস খাঁ, নেপলিয়ঁ, সেকান্দর, প্লেটো, তুলসীদাস, গীতা—নানাবিষয়ের অজস্র এবং অফুরন্ত আলোচনা। গীতা সম্বন্ধে বলিলেন,—"সেই অদ্ভুত কাব্য যাহাতে দুর্বলতার ছায়ামাত্র নাই।"

এই বিতস্তার তীরেই একদিন স্বামীজি নিবেদিতাকে বলিলেন—'যদিও আমি সময়ে সময়ে বেয়াড়া রকমের কথাবার্তা বলি এবং রাগিয়াও কথা বলি, তথাপি মনে রাখিও আমার হৃদয়ের ভিতর সত্যসত্য ভালবাসা ছাড়া আর অন্য কিছু নাই।"

শিবের প্রতি স্বামীজির আবাল্য অনুরাগ।

শিব-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না।

এই বিতস্তার তীরে বসিয়া একদিন নিবেদিতার এক প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলিলেন—"হ্যাঁ, এই শান্ত সুন্দর তাপস-মূর্তিই আমার আরাধ্য হৃদয়-দেবতা।"

নিবেদিতা প্রশ্ন করিলেন—"হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির ব্যাখ্যা কি?"

বিবেকানন্দ বলিলেন—"এই পৌরাণিক ধারণার মূলে দুইটি ভাব নিহিত আছে। একটি, সর্বত্যাগ ও সন্ন্যাসের ভাব, অপরটি, বিশ্বব্যাপী প্রেমের ভাব। এই কোমলে কঠোরে সম্মিলনই জগৎ-তত্ত্ব বুঝিবার গূঢ় প্রণালী, তাই মহাকাল শ্মশানেশ্বরের ভৈরবরুদ্র মূর্তির সহিত জগজ্জননীর মধুর মাতৃমূর্তির মিলন।"

নিবেদিতা। মহাদেবের জটায় গঙ্গা—ইহার অর্থ কি?

বিবেকানন্দ। ঐ জটাকলাপের মধ্য হইতে কলকল ধ্বনি করিয়া গঙ্গা ভূতলে নামিতেছেন। এই কলনাদের একটি অর্থ আছে। শত শত জলপ্রপাত শুধু 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি করিয়া আকুলভাবে শৈলমালার মধ্য দিয়া নৃত্য করিতে করিতে জগতের পানে ছুটিয়াছে।

নিবেদিতা। আচ্ছা, কালীঘাটে দেখিয়াছি শত শত লোক দেবীমূর্তির সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিতেছে, ইহার অর্থ কি?

বিবেকানন্দ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "এই হিমগিরির পদপ্রান্ত চুম্বন করা আর দেবীর সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ড চুম্বন করা কি একই জিনিস নয়?"

এই ভাবেই বিবেকানন্দ নিবেদিতার সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেন এবং এই ভাবেই আত্মসৃষ্ট এই কন্যাটিকে ভাবিকালের লোকমাতা হিসাবে তিনি গড়িয়া তুলিতেছিলেন অসীম ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে।

একনিষ্ঠ শিল্পীর মতন সেই ধৈর্য আর যত্ন।

তবেই না এমন সার্থক প্রতিমা তিনি নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। জ্ঞানে, প্রেমে, ত্যাগে, সেবায়, বীর্যে ও সাহসে—সকল বিষয়ে কন্যাকে অনন্যা ও সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিবার জন্য বিবেকানন্দের চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি ছিল না। তাঁহার চিরজীবনের জ্ঞানের ভাণ্ডার তিনি এইভাবে নিবেদিতার মধ্যে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তবেই না আইরিশ তরুণী মার্গারেট নোবল্ ভারত-দুহিতা নিবেদিতা হইতে পারিয়াছিলেন। নিবেদিতা তাই একান্তভাবে বিবেকানন্দেরই সৃষ্টি। সার্থক ও সুন্দর সৃষ্টি।

অতুলনীয় এবং অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

সে সৃষ্টি ব্যর্থ হয় নাই। ভারতের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া ভারতের সর্বাঙ্গীণ সেবায় তাহা কেমন করিয়া সার্থক হইয়া উঠিল, সেই অপূর্ব কাহিনী এইবার আমরা বলিব।

॥ আট ॥

নিবেদিতার কবি-প্রাণ ভূস্বর্গ কাশ্মীরের দৃশ্যে মুগ্ধ হইল। শিল্পীর নিপুণ তুলিকাপাতে যে দৃশ্য আঁকা সম্ভব, তাঁহার লেখনীমুখে তাহা এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ঃ

"পথের দৃশ্য অতি রমণীয়। কোথাও কৃষক আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছে, কোথাও সাধু-সন্ন্যাসীরা আঁকাবাঁকা পথ দিয়া দেবমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। পর্বত-সানুদেশে শত শত আইরিস্ পুষ্প ফুটিয়াছে। মধ্যে শ্যামল উপত্যকা ও শস্যক্ষেত্র, চারিদিকে তুষারাবৃত শুভ্রশীর্ষ পর্বতমালা। শৈলগাত্রে ক্ষোদিত কত প্রাচীন কাহিনী, এখানে ওখানে কত ধ্বংসস্তূপ। অসরল গিরিসঙ্কটসমূহে কী মৌন মহিমা!"

একদিন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে স্বামীজির অমরনাথ তীর্থযাত্রার অন্যান্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে নিবেদিতা নৌকায় বসিয়া আছেন। নদী-তীরবর্তী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলির ছায়া নদীর জলে পড়িয়াছে। চারিদিকে একটা মৌন প্রশান্তি বিরাজ করিতেছে। "আমরা গল্প-গুজব করিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ স্বামীজি কয়েক মিনিট আমাদের সহিত গল্প করিয়া কাটাইবার জন্য আসিলেন। আসিয়া অন্যান্য কথার পর বলিলেন—'ঈশ্বর শুধু খেলার জন্য আপনাকে জগৎরূপে বিকাশ করেছেন। অবতারাদি শুধু লীলার জন্যই এখানে এসে বাস করে থাকেন। খেলা—সব খেলা। খৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন কেন? শুধু লীলা। জীবন সম্বন্ধেও তাই। ভগবানের সঙ্গে শুধু

খেলা করে যাও। বল, এসব লীলা, লীলা।'" নদীর নিস্তব্ধতার মধ্যে গুরুর মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া নিবেদিতা বিবেকানন্দের আরেক রূপ দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। তত্ত্বালোকের এমন তড়িৎপ্রকাশ নিবেদিতার মনের আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া দিল।

এইবার অমরনাথ।

তুষারময় শিবলিঙ্গ এইখানে বিরাজমান।

হিমালয়ের তুষারাবৃত পথের মধ্য দিয়া শত শত যাত্রী অমরনাথ গুহাভিমুখে চলিয়াছে। সে এক অপরূপ দৃশ্য! সেই তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আছেন নিবেদিতা ও বিবেকানন্দ। নিবেদিতা মুগ্ধ নয়নে দেখিলেন—গৈরিক ছত্রের নিম্নে ভস্মাবৃত কলেবর সাধুর দল, সন্মুখে ধুনি জ্বলিতেছে; কেহ ধ্যানে নিমগ্ন, কেহ শাস্ত্রালাপে রত, কেহবা একেবারে মৌন। কত বিচিত্র বেশ, কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। কত দেশের কত প্রকারের নরনারী। কোথাও শিঙ্গা বাজিতেছে, কোথাও শাঁখ বাজিতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও অন্ধকার ভেদ করিয়া মশালের আলো জ্বলিতেছে। বাতাসে অবিরাম সুমধুর স্তোত্রের ধ্বনি, কাহারও মুখে 'হর হর বম্ বম্'। নিবেদিতার মনে হইল, ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এমন অদ্ভুত, পবিত্র, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলেন, দেবতার দর্শন লাভের জন্য এমন ব্যাকুলতা, এমন কষ্ট স্বীকার, এমন উন্মত্ততা অন্য কোনো দেশে নাই। এই বুঝি হিন্দুর হিন্দুত্ব।

অনির্বচনীয় সৌন্দর্যময় সেই দীর্ঘ ও দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে যে গিরিসঙ্কটে অমরনাথ গুহা অবস্থিত, সেইখানে শিষ্যাকে লইয়া বিবেকানন্দ উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর চারিদিকে

ছড়ানো রহিয়াছে। সম্মুখে তুষারশৃঙ্গগুলি শ্বেত অবগুণ্ঠনে আবৃত। বিশাল গুহাভ্যন্তরে তুষারময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান। সূর্যকিরণ সেখানে প্রবেশ করে না। প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত শিবলিঙ্গটি যেন নিজ সিংহাসনেই অধিরূঢ়।

আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়া নিবেদিতা বিস্মিত হইলেন। এই তীর্থপথে গুরুর যে মূর্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল, তাহা নিবেদিতা কখনো কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অসংখ্য নিষ্ঠাবান তীর্থযাত্রীর মধ্যে তাঁহার গুরুও একজন। সর্বাঙ্গ ভস্মাবৃত, পরিধানে মাত্র একটি কৌপীন। মুখমণ্ডল ভক্তিভরে প্রোজ্জ্বল। তীর্থদর্শনের প্রত্যেকটি শাস্ত্রীয় বিধান বিবেকানন্দ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেছেন। "তিনি মালাজপ করিতেন, উপবাস করিতেন এবং পর পর পাঁচটি নদীর বরফের মত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়াছিলেন।" তারপর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিবেদিতার বোধ হইল, তাঁহার গুরু এমন তদ্গত-চিত্ত হইয়া শুভ্র স্বচ্ছ বিগ্রহের জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিতেছেন যেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব সশরীরে তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান। দেখিলেন, বিবেকানন্দ তীর্থযাত্রীর নিষ্ঠা ও ভক্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া বিগ্রহকে দুই-তিন বার প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিলেন, কিন্তু ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে স্বামীজি নিবেদিতাকে বলিলেন, "আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি। আমার মনে হইতেছিল যে তুষারলিঙ্গটি সাক্ষাৎ শিব। কোনো তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই।" তারপর তিনি আপন মনে আবৃত্তি করিলেন ঃ

কস্তুরিকা চন্দনলেপনায়ৈ,
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥

এই তুষারলিঙ্গের পবিত্রতা ও ধবলতা নিবেদিতাকে মুগ্ধ, বিস্মিত করিল। এখানেও স্বামীজি নিবেদিতাকে জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। অনন্তের ধ্যানমগ্ন মহাযোগী শিবকেই তিনি যেন এইখানে তাঁহার গুরুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলেন—অমরনাথে নিবেদিতার ইহাই চরম অনুভূতি।

এইবার ক্ষীরভবানী—কাশ্মীরের আর একটি পবিত্রস্থান।
ক্ষীরভবানী একটি প্রস্রবণ।
এখানে জগন্মাতার পূজা হয়।
এই তীর্থে আসিবার সময় গুরুর মধ্যে নিবেদিতা সবিস্ময়ে আর একটি ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। গুরুর তীর্থযাত্রার সঙ্গিনী হিসাবে নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"কোন অজ্ঞাত কারণে স্বামীজির চিত্ত শিব হইতে শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি সর্বদাই রামপ্রসাদের গানগুলি গাহিতেছিলেন। বলিতেন, যে দিকেই তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন, তিনি জগন্মাতার উপস্থিতি অনুভব করিতেন—যেন তিনি সাকাররূপে কক্ষমধ্যে বিরাজ করিতেছেন।...ক্রমে স্বামীজির তন্ময়ভাব আরো গভীরভাব ধারণ করিল। একদিন মুসলমান মাঝির চারি বৎসর বয়স্কা শিশুকন্যাকে উমারূপে পূজা করিলেন। আমাকে বলিলেন,

'যে দিকে ফিরিতেছি, কেবল মায়ের মূর্তি দেখিতেছি।'...আর সেই দর্শনে বিশ্ব-কাব্যের অনন্তরাগিনী হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজি তখন জগজ্জননীর ধ্যানে চব্বিশ ঘণ্টা বিভোর। মনে হইল, মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় বহিতেছে।...একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, তাঁহার মাথায় কতকগুলি চিন্তা খুব প্রবল হইয়াছে এবং তিনি উহাদিগকে লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। হাত বাড়াইয়া কলম চাহিলেন এবং সেই অবস্থায় যন্ত্রচালিতবৎ একটি কবিতা লিখিয়া গেলেন। লেখা শেষ হইলে কলমটি হাত হইতে পড়িয়া গেল। স্বামীজিও ভাবসমাধিস্থ হইয়া মূর্ছিতের ন্যায় গৃহতলে লুটাইয়া পড়িলেন।' নির্বাক বিস্ময়ে নিবেদিতা এইসব দেখিলেন। এইভাবেই স্বামীজি 'মৃত্যুরূপা মাতা' নামক তাঁহার বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি এই ঃ

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি, ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি,
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী।
প্রকাশিছে দিকে দিকে তার, মৃত্যুর কালিমা-মাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!
কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।

স্বামীজি নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শিষ্যাকে শুনাইলেন, মাঝখানে থামিয়া বলিলেন, "যা দেখেছিলাম তা সব সত্য—বর্ণে বর্ণে সত্য।"

নিবেদিতার এই কাশ্মীর ও অমরনাথ ভ্রমণ প্রসঙ্গে তাঁহার এক অনুরাগী ইংরেজ বন্ধু লিখিয়াছেন ঃ

"শ্রীনগরেই নিবেদিতার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। যে ডোঙ্গায় স্বামী বিবেকানন্দ থাকিতেন তাহার খুব নিকটেই আমি একখানি হাউস-বোটে থাকিতাম। আমরা দুই জনে একত্রে বহু সময় অতিবাহিত করিতাম। অপর একখানি নৌকায় স্বামী বিবেকানন্দের তিনজন বিদেশিনী শিষ্যা থাকিতেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাদেরই অন্যতমা। একদিন প্রাতঃকালীন ভ্রমণের পর আমি বিবেকানন্দের নৌকায় গিয়া উঠিলাম এবং সেইখানেই তিনজন শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখিলাম। যথারীতি আলাপ-পরিচয় হইল। তিনজনের মধ্যে নিবেদিতাই বয়ঃকনিষ্ঠা; দেখিতে প্রিয়দর্শিনী। দীর্ঘাঙ্গী ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল এবং প্রতিভাব্যঞ্জক। নৌকার তলদেশ দিয়া ঝিলামের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে নদীবক্ষে সফেন তরঙ্গ উঠিয়াছে। অদূরে 'তাখ্‌ত্‌ সুলেমান' নীরব প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া। নদীতীরে ফলভারে অবনত সারি সারি পপ্‌লার, চিনার ও আপেল গাছ। বাহিরে প্রকৃতির এই মনোরম দৃশ্য কিছুটা দেখিতে দেখিতে আমরা উদ্দীপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। নিবেদিতার কণ্ঠস্বর ছিল অতি মিষ্ট এবং তিনি অত্যন্ত উৎসাহ এবং আগ্রহভরে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসার আর বিরাম ছিল না—অজস্র বিষয় সম্পর্কে তিনি একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন। দেখিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ অক্লান্তভাবে সেগুলির উত্তর দিতেছেন—গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর। একবার আমার দিকে অঙ্গুলি নিদেশ করিয়া মৃদু হাসিয়া নিবেদিতাকে তিনি বলিলেন—'এই ভদ্রলোকটির মগজটা ঠোক্‌রাও, সব প্রশ্নের জবাব পাবে।' বিদায়ের কালে শিষ্যাদের মধ্যে একজন আমাকে পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে নিমন্ত্রণ

করিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে নিবেদিতা সম্পর্কে অনেক কথা বলিলেন—তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য, নানা বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞানের কথা এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অগাধ ও অকৃত্রিম ভক্তির কথা। তারপর তিনি আমাকে একটি ছোট গল্প বলিলেন। তাঁহারা সবেমাত্র তুষারতীর্থ অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। বিবেকানন্দ অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পদব্রজে চলিয়াছেন। পরিব্রাজকরূপে প্রায় সমগ্র ভারত তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা একখানি ডাণ্ডীতে ছিলেন। কিছু পথ অতিক্রম করিবার পর হঠাৎ নিবেদিতা দেখিতে পাইলেন যে, যাত্রীদের মধ্যে একটি বৃদ্ধা মহিলা অতি কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়া চলিয়াছে। নিবেদিতা তখনি ডাণ্ডী হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই বৃদ্ধাকে তাহার মধ্যে বসাইয়া নিজে অবশিষ্ট পথ পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিলেন। পরে এই ঘটনার কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে নিবেদিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে দুইখানি কম্বল ছিল এবং তিনি ভূমিতে শয়ন করিতেন—জীবনে তিনি ইহা অপেক্ষা সুখ কখনো পান নাই।"

ইহা হইতেই মনে হয় যে, ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হইবার পর নিবেদিতা যথার্থই আপ্তকাম হইতে পারিয়াছিলেন।

তীর্থযাত্রা শেষ করিয়া লাহোরের পথে নিবেদিতা নভেম্বরের প্রথমেই কলিকাতায় ফিরিলেন।

নিবেদিতার লাহোর-ভ্রমণের একটি বিবরণ উল্লেখযোগ্য। যে য়ুরোপীয় বন্ধুটি তাঁহার কাশ্মীর ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন তিনি লিখিয়াছেন:

"লাহোরে আসিয়া নিবেদিতা ও তাঁহার সঙ্গিনী দুইজন য়ুরোপীয় মহিলা নিডাস হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রতিদিনই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। এক একদিন আমরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করিতাম। অন্য দুইজন মহিলা-সঙ্গিনী চুপ করিয়া শুনিতেন। ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত এমন কোন বিষয় নাই যে আমরা আলোচনা না করিতাম। দেখিতাম ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের নর-নারী, ইহাদের জীবন-ধারা চিন্তা-ভাবনা

সম্পর্কে সকল তথ্য জানিবার জন্য নিবেদিতার আগ্রহ কী অসীম। বলিতেন—'ভারতবর্ষকে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, ইহাই গুরুজীর আদেশ।'

"লাহোরে যে-সব দ্রষ্টব্য স্থান ছিল সেগুলি একে একে পায়ে হাঁটিয়া সব দেখিলেন। একদিন সকালে লোহারি গেট দিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা আমরা শহরের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণ করিলাম। শহরের ছোট-বড় প্রত্যেকটি রাস্তা দিয়া আমরা হাঁটিলাম। দেখিলাম প্রত্যেক বিষয়েই নিবেদিতার আগ্রহ—পথের যে-সব ছেলেমেয়ে বিস্ময়ে তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল, ঘোমটা-পরা এবং ঘোমটা-না-পরা পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক, পথিপার্শ্বে রেস্তোরাঁয় সমবেত খরিদ্দার, গলায় ঘণ্টা-বাঁধা বলীবর্দ, হাট-বাজার, গৃহ, অলিন্দ, বাতায়ন—সব কিছুই নিবেদিতা আগ্রহের সঙ্গে দেখিতেছিলেন এবং সব বিষয়ই আমাকে প্রশ্ন করিতেছিলেন। সেই সময়ে লাহোরে রামলীলা হইতেছিল। নিবেদিতা ধরিয়া বসিলেন তাঁহাকে রামলীলা দেখাইতে হইবে। সেদিন আমরা সকলেই গাড়ি করিয়া বাহির হইলাম। যেদিকে রামলীলা হইতেছিল, গাড়ি সেইদিকে অগ্রসর হইল। কিছুদূর যাইবার পর পথে জনতার সমাবেশ দেখিয়া নিবেদিতার সে কী আনন্দ। বলিলেন—'হাঁটিয়া যাইব।' আমি বলিলাম—'এই ভীড়ের মধ্যে?' নিবেদিতা শুনিলেন না, গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন, আর দুইজন মহিলা গাড়িতেই রহিলেন। আমাকেও নামিতে হইল। পথে জনতার ভীড়, একজন পুলিশ সেই জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে আসিতে দেখিয়া সেই পুলিশটি জনতাকে ধাক্কা দিয়া তাঁহার জন্য পথ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। পুলিশের তর্জন-গর্জনে নিরীহ জনতা সন্ত্রস্ত হইল। এই দৃশ্য নয়নগোচর হইবামাত্র নিবেদিতার মুখের ভাব নিমেষমধ্যে বদলাইয়া গেল; সেই হাস্যময় মুখে ক্রোধের রেখা ফুটিয়া উঠিল, চোখ দুইটি দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। পুলিশটির সামনা-সামনি আসিয়া নিবেদিতা চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'এই সব লোককে ধাক্কা দিবার তোমার কী ক্ষমতা আছে? ইহারা কী দোষ করিয়াছে? ইহাদের উপর জুলুম করার জন্য তোমার লজ্জা

বোধ করা উচিত।' নিবেদিতা ইংরেজিতে বলিলেন, পুলিশ তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাঁহার সেই দৃপ্ত ভাব ও ভঙ্গী দেখিয়া যারপর নাই সন্ত্রস্ত হইল। সে আমার মুখের দিকে করুণভাবে চাহিল এবং মেমসাহেব কি বলিলেন তাহা জানিতে চাহিল। আমি যখন তাহাকে সব কথা হিন্দীতে বুঝাইয়া বলিলাম, তখন সে শঙ্কিতচিত্তে তাহার অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চাহিল। চারিদিকের জনতা তখন সবিস্ময়ে নিবেদিতার দিকে তাকাইয়া আছে। নিবেদিতা জনতার ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। রামলীলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় আমাকে হাসিতে দেখিয়া নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'হাসিতেছেন কেন?' আমি বলিলাম—'পুলিশ জনতাকে ধাক্কা দিতেছে কিংবা প্রহার করিতেছে, ভারতবর্ষের শহরের পথে এ দৃশ্য বিরল নহে।' নিবেদিতা ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না ”

লাহোরের এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা প্রায়ই বলিতেন, পরাধীনতা ভারতবর্ষের লোককে যেন একেবারে কাপুরুষ করিয়া দিয়াছে।

নয়

১২ই নভেম্বর। দীপান্বিতার রজনী।

নিবেদিতার জীবনেও একটি স্মরণীয় দিন।

শহরের এখানে ওখানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

শহরের একটি ক্ষুদ্র গলিতে নিবেদিতাও আলো জ্বালাইলেন।

এ আলোর জ্যোতি অনির্বাণ।

নিবেদিতার জীবনব্যাপী সাধনার আজ শুভ উদ্বোধন।

বাগবাজারের ১৭নং বোসপাড়া লেনে আজ নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই উৎসবকে স্মরণীয় করিবার জন্য বেলুড় হইতে স্বামীজি স্বয়ং আসিয়াছেন সঙ্ঘ-মাতাকে লইয়া। স্বামীজির ইচ্ছা, সঙ্ঘ-জননী সারদা দেবী এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। বিশিষ্ট গুরুভ্রাতাদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দও আসিয়াছেন।

সর্বাগ্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা হইল। সেই সঙ্গে যথারীতি হোম। সর্বঅভীষ্টপ্রদ তিনি, বিবেকানন্দ বলিলেন নিবেদিতাকে। পূজা শেষ হইলে পরে বিদ্যালয়ের শুভ-আরম্ভ বিঘোষিত হইল। সঙ্ঘ-জননী এই বিদ্যালয়ের উপর ভগবতীর মঙ্গলাশীষ প্রার্থনা করিলেন এবং মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীগণকে আশীর্বাদ করিলেন। একদিন লণ্ডনে যাঁহার পাদমূলে নিবেদিতা প্রাণের পবিত্র অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, আজ এই দীপান্বিতার রজনীতে তাঁহারই একটি সঙ্কল্পকে নিবেদিতা রূপায়িত করিয়া তুলিবার

পুণ্যব্রত গ্রহণ করিলেন। সারদাদেবী, স্বামীজি এবং আর সকলেই নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করিলেন। বিবেকানন্দ নিজে বিদ্যালয়ের নামকরণ করিলেন—'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।' বোসপাড়া লেনে সেদিন দীপান্বিতা সার্থক হইল।

এই বিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

"প্রথম হইতেই ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, যত শীঘ্র সুবিধা হয় আমি কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিব। স্বামীজি আমাকে এই কার্যারম্ভের জন্য তাড়া না দিয়া, আমায় ভ্রমণ করিবার ও মনে মনে ঐ কার্যের জন্য প্রস্তুত হইবার যথেষ্ট অবসর দিয়াছিলেন। আমি বেশ জানিতাম যে, বিদ্যালয়টি খোলা হইলে উহা দ্বারা প্র[illegible] শুধু ইহাই পরীক্ষা হইবে, কিরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিলে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বালিকাগণের অভাব কি, তাহা আমায় প্রথমে জানিতে হইবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের মধ্যে আমার নিজের স্থান কোথায়, তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে এবং যে সমাজের উন্নতি-কল্পে আমার সমুদয় চেষ্টা প্রয়োগ করিব, তাহাকেও তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে। একটিমাত্র জিনিস আমার ঠিক করা ছিল—তাহা এই যে, শিক্ষাবিষয়ক এমন একটি উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা ভারতীয় নারীকুলের আধুনিক শিক্ষার পক্ষে যথার্থ উপযোগী হয় এবং সকল অবস্থায় খাটে।"

নিবেদিতার মনে পড়িল কাশ্মীরে একটি দিনের কথা। সেদিন সন্ধ্যাকালে বেরনাগবনের তাঁবুতে একখানা জ্বলন্ত গুঁড়ির চারিধারে তাঁহারা বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে স্বামীজি নিবেদিতার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে বর্তমানে কি করবে স্থির করেছ?"

নিবেদিতা সাগ্রহে উত্তর দিলেন,—"আমি চাই, আমার যেন কোনো সহকারী না থাকেন।"

"একলা পারবে কেন ?"

"খুব সামান্যভাবে আমি এই কাজ আরম্ভ করব এবং ছেলেরা যেমন বানান করে করে পড়তে শেখে, তেমনি একটু একটু করে নিজের প্রণালী নিজে বেছে নেব।"

স্বামীজি মনোযোগের সঙ্গে এই সব কথা শুনিলেন এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। নিবেদিতার কোনো ইচ্ছাতেই তিনি কখনো বাধা প্রদান করেন নাই। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। বিবেকানন্দ যেন তাঁহার ছাত্র, আর নিবেদিতা যেন তাঁহার শিক্ষক। সাম্প্রদায়িকতার কথা উঠিলে নিবেদিতা বলিলেন—"সকলের ওপর, আমি শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মভাবে অনুরঞ্জিত করতে চাই। আমার মতে সাম্প্রদায়িক ভাব বিশেষ উপকারী।"

বিবেকানন্দ বলিলেন—"তুমি সাম্প্রদায়িকতার ভেতর দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতায় পৌঁছুতে চাও।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

"একজন মহিলা আমার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন ; আমি তাঁহাকে লওয়া সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবা-মাত্র স্বামীজি সে নাম প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।" শুধু একটি বিষয়ে স্বামীজি অটল অচল রহিলেন। নিবেদিতার ইচ্ছা ছিল বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীতে রামকৃষ্ণ মিশনের বাহিরের কাহাকেও রাখিবেন এবং যাঁহাদের রাখিবেন তাঁহাদের দুই-একজনের নামও তিনি স্বামীজিকে বলিলেন। তাঁহারা সকলেই নিবেদিতার পরিচিত। এবং বিবেকানন্দেরও পরিচিত। বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়ের পরিচালক-মণ্ডলীর অন্যতমা হিসাবে লেডি অবলা বসুকে রাখিবার জন্য নিবেদিতার খুব আগ্রহ এবং ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ

সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। লণ্ডনে নিবেদিতা নিজে একটি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ছিলেন, বিদ্যালয় পরিচালনা এবং শিক্ষাদানের আধুনিক রীতি-নীতি সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতাকে স্বামীজি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, মূল্য দিতেন—তথাপি তিনি যখন বলিলেন, "গোড়া হইতেই ভুল করিয়া বসা অপেক্ষা কাহারও সাহায্য না লইয়া অগ্রসর হওয়াই আমি শতগুণ নিরাপদ মনে করি," তখন নিবেদিতা গুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলিলেন না। ইহার পর নিবেদিতার জীবনের পট-পরিবর্তন হইল।

তিনি বেলুড় হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতার উত্তরপ্রান্তে ক্ষুদ্র বাগবাজার পল্লী। এইখানে একটি বাড়িতে সঙ্ঘ-জননী সারদা দেবী স্ত্রী-ভক্তগণের সঙ্গে তখন বাস করিতেন। নিবেদিতার ইচ্ছা, তিনি মায়ের সঙ্গেই বাস করিবেন এবং তাঁহার গৃহে একটি খালি ঘরে বাস করিবার অনুমতি পাইলেন। কিন্তু তিনি অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, বিদেশিনীর পক্ষে ব্রাহ্মণ পরিবারে এইরূপ অবাধ ও নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা বাঙালি হিন্দুসমাজ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিল না; সারদা দেবীকে ইহার জন্য প্রতিবেশীর বিরুদ্ধ সমালোচনা পর্যন্ত শুনিতে হইল। এই সামাজিক গোলযোগের উত্তপ্ত আবহাওয়া নিবেদিতার মনকেও পীড়িত করিল। কিন্তু সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ না করিলেও নিবেদিতা তাহাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার উঠানে একপাশে একটা স্থান করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। তবু সঙ্ঘ-মাতা তাহার জন্য বিব্রত বোধ করিবেন, নিবেদিতার ইহা অভিপ্রেত ছিল না। গুরুকে তিনি সব খুলিয়া বলিলেন। বিবেকানন্দ আট-দশ দিনের মধ্যেই খুব নিকটে নিবেদিতার থাকিবার জন্য একটি

বাড়ি ঠিক করিয়া দিলেন। সতর নম্বর বোসপাড়া লেনের সেই জীর্ণ বাড়িটি আজো নীরবে নিবেদিতার স্মৃতি বহন করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িল। নিবেদিতা যেখানে থাকেন সেখানে বাতাসের অভাবে তাঁহার কষ্ট হয় জানিতে পারিয়া সারদাদেবী রাত্রিকালে নিবেদিতাকে তাঁহার গৃহেই শয়ন করিতে বলিলেন। এইখানে "অপেক্ষাকৃত ভাল বন্দোবস্ত ছিল। তখন আর আমার জন্য কোনো পৃথক্ কক্ষ নির্দিষ্ট ছিলনা; অপর সকলে যে ঠাণ্ডা শাদা ঘরটিতে শয়ন করিতেন, আমিও তথায় শয়ন করিতাম। লাল সুরকির পালিশ-করা মেঝের উপর সারি সারি মাদুর বিছানো, তাহার উপর এক একটি বালিশ ও মশারি, ইহাই ঘরটির শয়নের আসবাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-পত্নী সারদা দেবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করিয়া এই প্রথম নিবেদিতা তাঁহাকে বুঝিবার ও জানিবার সুযোগ পাইলেন। এই দেবীচরিত্রের মাধুর্য ও সৌন্দর্য দেখিয়া নিবেদিতার অন্তর শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সঙ্ঘ-জননীর স্নেহের নিবিড় স্পর্শ পাইয়া তিনি ধন্য হইলেন। তাঁহার জীবনে মাতৃ-ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া নিবেদিতার মনে হইল:

"ভারতীয় নারীকুলের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা তিনিই। কিন্তু তিনি কি এক প্রাচীন আদর্শের শেষ উদাহরণস্থল অথবা এক নূতন আদর্শের প্রথম উদাহরণস্থল? অত্যন্ত সরল স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে প্রগাঢ়জ্ঞান ও মাধুর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয়। তথাপি আমার চক্ষে তাঁহার সাধুত্ব যেরূপ অসাধারণ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার সম্ভ্রান্তকুলোচিত নিষ্ঠাচার ও মহৎ উদার মনও প্রায় সেইরূপ অসাধারণ বলিয়াই বোধ হয়। যত নূতন বা জটিল প্রশ্নই তাঁহাকে করা হউক না কেন, আমি তাঁহাকে কখনো উদার-ভাবের মত প্রকাশে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। সারা জীবন ধরিয়া তিনি নীরবে অবিশ্রান্তভাবে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার যত

কিছু অভিজ্ঞতা, সকলের মূলে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস রহিয়াছে।... তাঁহার কোমলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা অসাধারণ ছিল। তিনি যে ঘরটিতে পূজা-পাঠাদি করেন তাহা মাধুর্যে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাঁহার অধিকাংশ সময় রামায়ণপাঠে ব্যয়িত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে তিনি মানুষের ভাগ্যে যতদূর চরিত্রোৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব, তাহা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।...ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু স্ত্রীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভলক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।"

৩১শে মে, ১৮৯৯।

আজ কালীঘাটে মায়ের নাটমন্দিরে নিবেদিতার বক্তৃতা হইবে। বিষয়—কালী।

কালীঘাটের হালদারেরা এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের উপর তখন তাঁহাদের বিশেষ ভক্তি। তাহার কারণ অবশ্য আছে। ইহার ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে স্বামীজি সহসা কালীঘাটে মায়ের শ্রীমন্দিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়া দুই-তিনজন গুরুভাই ও নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া একদিন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হালদারেরা সসম্ভ্রমে তাঁহাদের গ্রহণ করিলেন। মায়ের মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল। মায়ের প্রসন্ন শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিয়া বিবেকানন্দের হৃদয়ে ভাবসাগর উথলিয়া পড়িল। বেদান্তের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ভাবরাশি ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারিলেন না। বিশাল চক্ষু দুইটি আরক্তিম হইল; দরদর বেগে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল, আর কমনীয় কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল অনর্গল সুন্দর স্তবরাজি; হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ—তিনি অঞ্জলি ভরিয়া চন্দনচর্চিত জবাকমল মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন, সকলকে দিতে বলিলেন। কালীঘাটবাসী সকলে বিলাত-ফেরৎ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর

এই ভাব দেখিয়া বিস্মিত। আর নিবেদিতা? তাঁহার গুরুর এই আরেক মূর্তি দেখিয়া তিনিও একেবারে নির্বাক। ঠিক হইল কালীঘাটে নিবেদিতা একদিন বক্তৃতা করিবেন। সভাপতিত্ব করিবেন বিবেকানন্দ। নির্দিষ্ট দিনে লোক যেন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। অসুস্থতার জন্য স্বামীজি আসিতে পারেন নাই। ঠিক ছয়টার সময়ে নিবেদিতা নগ্নপদে নাটমন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং প্রায় আধঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন। সকলে সাধুবাদ দিল।

১৮৯৯। ঈষ্টারের অপরাহ্ন।

সারদাদেবী আজ নিবেদিতার স্কুল দেখিতে আসিলেন। সঙ্গে গোপালের মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি। বিবেকানন্দের এই 'মেম্' শিষ্যাটিকে সারদাদেবীর মত ইঁহারাও ভালবাসেন; ইঁহাদের ধারণা পূর্বজন্মে নিবেদিতা এই দেশেরই মেয়ে ছিলেন। সঙ্ঘ-জননী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ সমস্ত বাড়িখানি ঘুরিয়া দেখিলেন। বিদ্যালয়ে একটি ঠাকুর-ঘরও ছিল। ধূপধুনার পবিত্র গন্ধে ঘরখানি যেমন আমোদিত তেমনি পরিচ্ছন্ন। এত সুন্দর ঠাকুর-ঘর! তাঁহারা তো অবাক্। সারদাদেবী আসিয়া ঠাকুর-ঘরে বসিলেন।

"আজ খৃষ্টানদের কি পর্ব না?" সারদাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হ্যাঁ—ঈষ্টার পর্ব।" নিবেদিতা বলিলেন।

সারদাদেবী এই উৎসব সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর-ঘরের এক কোণে ছিল ছোট একটি ফরাসী অর্গ্যান। নিবেদিতা ছাত্রীদের লইয়া একটি ঈষ্টারের গান গাহিলেন। গানের বিষয় যীশুখৃষ্টের পুনরুত্থান। ভিন্ন ভাষায় উচ্চারিত এই স্তোত্র শুনিয়া সারদাদেবী খুব আনন্দিত।

বোসপাড়া লেন একটি ক্ষুদ্র গলি মাত্র।

কী পরিচ্ছন্ন রাস্তা। নিবেদিতার চেষ্টায় ও যত্নে বোসপাড়া লেনের পরিচ্ছন্নতার খ্যাতি লোকের মুখে মুখে।

নাগরিকজীবনে পরিচ্ছন্নতার মূল্য সেদিন আমরা নিবেদিতার নিকট হইতেই শিখিয়াছিলাম।

নিবেদিতার স্কুলটি আরো ক্ষুদ্র। তেমনি অস্বাস্থ্যকর। উপরের ঘরগুলি ছোট ছোট, ছাদও নীচু। গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরে সেই ঘরগুলি এত গরম হইত যে, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকিলেই মাথা ধরিয়া যাইত। পাখার ব্যবস্থাও ছিল না। সেই ছোট বাড়িতে নিবেদিতা পাখা হাতে ক্লাস করিতেন। অসহ্য গরমে তাঁহার শঙ্খশুভ্র মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিত। মাঝে মাঝে দুই হাত মাথায় চাপিয়া ধরিতেন। শিক্ষয়িত্রীদের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিবেদিতা উত্তর দিতেন—"মাথার বড় কষ্ট।" কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার অধ্যাপনায় নিজেকে ডুবাইয়া দিতেন।

স্কুল তো আরম্ভ হইল। অভিভাবকেরা মেয়ে দিতে চাহেন না হিন্দুর মেয়ে যাইবে বাইরে পড়িতে? তাও আবার মেমসাহেবের কাছে? দুই-একটি করিয়া মেয়ে আসে। সেই শঙ্খশুভ্র মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আবার বিঘ্ন। অর্থাভাব। তবু নিবেদিতার উদ্যম-উৎসাহের শেষ নাই। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, এই বিদ্যালয় হইতেই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী, গার্গীর পুনরভ্যুদয় হইবে। ক্রমে স্কুলটি জমিয়া উঠিল। ছোট ছোট বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীর বয়ঃপ্রাপ্তা বধূ, গৃহিণী, বিধবা—সকলেই আসিয়া এই স্কুলের ছাত্রী হইতে আরম্ভ করিল। যে যেমনভাবে শিক্ষালাভ করিতে চাহিত, নিবেদিতার স্কুলে ঠিক সেই রকম ব্যবস্থাই ছিল। ভাষা, গণিত, শিল্পকার্য, সেলাই এবং চিত্রবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত।

একদিন। একটি ছাত্রী শ্লেটে লাইন টানিতে টানিতে বলিয়াছিল,—"লাইন টানিতেছি।" 'লাইন' এই শব্দটি শুনিবামাত্র নিবেদিতা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—"তোমার নিজের ভাষায় বল।" কিন্তু 'লাইন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ যে কি তাহা ছোট মেয়েদের কেহই তখন ভাবিয়া পাইল না। সকলেই বলিতে লাগিল—"সিস্টার, আমরা তো বরাবর 'লাইন' বলি।" দুঃখে-বিরক্তিতে নিবেদিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন—"তোমরা আপনার ভাষাও ভুলিয়া গেলে।" হঠাৎ একটি ছাত্রীর মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল "রেখা।"

"রেখা, রেখা"—নিবেদিতার আনন্দের সীমা নাই, তিনি যেন একটি হারান জিনিস খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—"রেখা, রেখা"। ভাল করিয়া বাংলা ভাষা শিখিবেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া শিখিতে পারেন নাই বলিয়া, উহা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে তিনি কখনো পারেন নাই। তথাপি এক একটি ছোট ছোট কথা যখন যাহার নিকট শিখিবার সুবিধা পাইতেন. তখনই শিখিয়া লইতেন।

আর একদিন।

স্কুলে নানাবর্ণের মেয়ে শিক্ষালাভ করিত। সেখানে বালিকা, কিশোরী, কুমারী, গৃহবধূ এবং বিধবা সব রকমের মেয়েই পড়িত। তখনো কলিকাতায় পর্দাপ্রথা একেবারে উঠিয়া যায় নাই। নিবেদিতা মাঝে মাঝে ছাত্রীদের একখানি ঢাকা গাড়িতে করিয়া শহরের নানা দর্শনীয় স্থানে শিক্ষার্থে লইয়া যাইতেন। সেদিন তিনি কয়েকজনকে কলিকাতার যাদুঘর দেখাইতে লইয়া গেলেন। প্রকাণ্ড বাড়ির সর্বত্র

ঘুরিয়া দেখিবার পর ছাত্রীরা একটু শ্রান্ত ও পরে পিপাসার্ত হওয়ায়, তিনি তাহাদিগকে জলের কলটির নিকটে লইয়া গিয়া নিজের বসন-মধ্য হইতে একটি গেলাস বাহির করিলেন—গেলাসটি তিনি যাত্রা-কালেই সকলের অগোচরে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এখন সেটি ধুইয়া স্বহস্তে জলপূর্ণ করিয়া মেয়েদের ডাকিয়া পান করিতে বলিলেন। ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকটি বয়স্কা ব্রাহ্মণ-কন্যাও ছিল, তাহারা ঐ জল পান করিতে ইতস্ততঃ করিল; তখন একটি ছাত্রী—বোধ হয়, ততখানি জাত্যভিমানের কারণ তাহার ছিলনা—অগ্রসর হইয়া সেই গেলাস তাঁহার হাত হইতে লইয়া, অসঙ্কোচে সেই জল পান করিল। ভগিনী নিবেদিতা তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে গেলাসটি লইয়া নিজে তাহা ভাল করিয়া ধুইলেন, শূন্য গেলাসটি মাটিতে রাখিয়া দিলেন, এবং প্রত্যেককে পর পর আপন হাতে তাহা ভরিয়া পান করিতে বলিলেন। মুখে এতটুকু ব্যথার বা অসন্তোষের চিহ্নমাত্র নাই; সে মুখ তেমনই স্নেহোদ্ভাসিত, তেমনি প্রসন্ন ও প্রীতিপূর্ণ।

এই নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সহিত আরো দুইটি নারীর স্মৃতি বিজড়িত আছে। ভগিনী ক্রিস্টিন (মিস্ ক্রিশ্চিয়ানা গ্রিন্স্টিডেল্) ও ভগিনী সুধীরা। ক্রিস্টিন আমেরিকার মেয়ে। সেইখানেই ১৮৯৪ সালে স্বামীজির সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ। সেইখানেই ইনি স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতের সেবায় নিজকে উৎসর্গ করেন। ১৯০২ সালের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে আসিয়া ক্রিস্টিন ১৯০৩ সালে নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত হন এবং ভারতীয় নারীর শিক্ষা-বিস্তারের কার্যে বিবেকানন্দের পরিকল্পনাকে নিবেদিতার মতই রূপ দিতে অগ্রসর হন। ভগিনী ক্রিস্টিন আসিয়া যোগদান করিবার পর বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কার্যের সকল দায়িত্ব নিবেদিতা তাঁহারই

উপর ছাড়িয়া দিলেন। মৃদুস্বভাবা ক্রিস্টিনও বিদ্যালয়ের সংগঠন কার্যে নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করিলেন। এই কাজ তিনি নিবেদিতার মতই আধ্যাত্মিক জীবনের সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ কবিয়াছিলেন। "নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে"র প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন ভগিনী নিবেদিতা, আর মাতার ন্যায় উহাকে লালন-পালন করেন ভগিনী ক্রিস্টিন। পরবর্তিকালে এই বিদ্যালয়ের যাহা কিছু উন্নতি তাহা ক্রিস্টিনের একাগ্রতা, দৃঢ় সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের ফলেই হইয়াছিল। ভগিনী সুধীরার নামও নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান ভগিনী সুধীরাকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। বাংলার অন্যতম বিপ্লবী দেবব্রত বসু (পরবর্তি কালে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) সুধীরার অগ্রজ ছিলেন; কাজেই অগ্রজের প্রভাব সহোদরার জীবনে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। দেবব্রত এই ছোট ভগিনীটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং নিজের আদর্শে তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। নির্ভীকতা, দেশপ্রেম, সকলের প্রতি ভালবাসা সুধীরার চরিত্রকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল। দেবব্রতই সুধীরাকে ১৯০৬ সালে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে যোগদানের ব্যবস্থা করিয়া দেন। অধ্যাপনার অবসরে সুধীরা নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের নিকট ইংরাজি শিখিতেন। সুধীরা কোনো পারিশ্রমিক লইতেন না। দেশের ও সমাজের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন ইহাতেই তিনি কৃতার্থ। ক্রমে এই বিদ্যালয়ে সুধীরার প্রাণের জিনিস হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমার মামলা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বিপ্লবী দেবব্রত বসু যখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিয়া প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত হইলেন, তখন হইতে ভগিনী সুধীরা স্থায়িভাবে নিবেদিতা



ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ১৭নং বোসপাড়া লেন

এইখানেই (X চিহ্নিত বাড়িটি) নিবেদিতার ভগিনী-নিবাস ছিল। পূর্বে ইহা সামান্য একটি একতলা বাড়ি ছিল। পাশের খালি জায়গাটিতে একটি বাগান ছিল।

স্কুলের সহিত বিজড়িত হইলেন। বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে সুধীরা ক্রমশঃ ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া পড়েন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিবেদিতা তাঁহাকে নির্বাচিত করেন। নিবেদিতাকে দিয়া যে শুভকার্যের উদ্বোধন হইয়াছিল, সুধীরার নেতৃত্বে তাহা প্রসারিত হইয়াছিল। নিবেদিতা বিদ্যালয় একা নিবেদিতার চেষ্টায় ও যত্নে গড়িয়া উঠে নাই—সেই সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছিল ক্রিস্টিন ও সুধীরার ত্যাগ ও প্রচেষ্টা।

সতর নম্বর বোসপাড়া লেনে শুধু নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকুর মধ্যে, শুধু শিক্ষকতার মধ্যেই নিবেদিতার কার্য সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল না। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এই ১৭নং বোসপাড়া লেন তাহার স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বোসপাড়ার ঐ বাড়িটি বাংলা ও ভারতবর্ষের তখনকার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আকর্ষণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের অনেক বিখ্যাত মনীষী ও দেশসেবক নিবেদিতার সহিত দেখা করিবার জন্য ঐ বাড়িতে আসা-যাওয়া করিতেন। গোপালকৃষ্ণ গোখেল, হীরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, অবলা বসু, সরোজিনী নাইডু, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, নীলরতন সরকার, অবনীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ এবং নিবেদিতার গুণমুগ্ধ একাধিক বিশিষ্ট ইংরেজ ও মার্কিন বন্ধু-বান্ধবী সকলেই আসিতেন ঐ বাড়িতে এবং সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন নিবেদিতা। এমন কি বড়লাট-পত্নী লেডি মিণ্টো পর্যন্ত একবার আসিয়াছিলেন এখানে। ইঁহারা সকলেই নিবেদিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। কোনো বিদেশিনী আজ পর্যন্ত এ সৌভাগ্য

লাভ করিতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহার মনীষা ও সহযোগিতা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এইখানে বসিয়াই তিনি বাংলা তথা ভারতের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করিতেন।

এই সব মনীষীদের যাওয়া-আসার ফলে বোসপাড়ার ঐ স্কুল বাড়িটি সেদিন যেমন তীর্থসঙ্গমে পরিণত হইয়াছিল, তেমনি আবার ইহাই ছিল বাংলার বিপ্লবীদের আশ্রয় ও মন্ত্রণাগৃহ। শ্রীঅরবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে নিবেদিতা সেদিন প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন এইখানে বসিয়া। এইখানে বসিয়াই একা নিবেদিতা সেদিন শত নিবেদিতারূপে বহু ও বিচিত্র কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নিজেকে তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন বিভিন্ন দিকে বাংলাকে জাগাইয়া তুলিতে। সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলা জাতীয় শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, সাংবাদিকতা, গ্রন্থ-রচনা, রাষ্ট্রীয় কার্য—কোন্‌টি নয়? এইখানে বসিয়া সকল বিষয়ে অগ্রসর হইয়া আসিলেন তিনি। ইতিহাসের চক্ষে এই সতর নম্বর বাড়িটির মূল্য তাই অনেক বেশী। তাই না তিনি সহস্র রকমের অসুবিধা স্বীকার করিয়া, অতি সামান্য আহার্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াও এই জীর্ণ সংকীর্ণ বাড়িখানিতে থাকিতেন। কোনো সম্রাজ্ঞীর যেমন তাঁহার প্রাসাদ বা প্রমোদভবনের প্রতি অনুরক্তি থাকে, নিবেদিতারও সেইরূপ অনুরক্তি ছিল সতর নম্বর বোসপাড়া লেনের এই বাড়িখানির উপর।

তাঁহার য়ুরোপীয় বন্ধু ও বান্ধবীরা যখনই এইখানে নিবেদিতার সহিত দেখা করিতে আসিয়া এই পল্লীর অস্বাস্থ্যকর ও অসুবিধাজনক পরিবেশের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে শহরের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে অনুরোধ করিতেন, তখনই উত্তরে নিবেদিতা তাঁহাদিগকে বলিতেন—"The lane has adopted me and I

must stay here and nowhere else." ভারতের প্রতি নিবেদিতার মমতা কতখানি আন্তরিক, কতখানি সত্য ছিল, তাহা তাঁহার এই একটিমাত্র কথা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি।

স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে নিবেদিতা স্থায়ীভাবেই কলিকাতায় থাকিতেন। এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে আসিয়া কন্যার কাজকর্ম দেখিয়া যাইতেন, কি সুবিধা-অসুবিধা হইতেছে, তাহার খোঁজ-খবর লইতেন এবং তাহার কাজে উৎসাহ দিতেন। বেলুড় হইতে স্বামীজি যখনই কলিকাতায় আসিতেন, তখন তিনি বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করিতেন। এই সময়কার একদিনের একটি ঘটনা অধ্যাপক কুমুদবন্ধু সেন এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

"স্বামীজি যখন কলিকাতায় থাকিতেন তখন সন্ধ্যার পর নিবেদিতা তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিতেন। স্বামীজি কলিকাতায় আসিলে বলরাম বাবুর বাড়িতেই অবস্থান করিতেন। একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—দেখিলাম নিবেদিতা তখনও পর্যন্ত না আসায় স্বামীজি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতেছেন, 'নিবেদিতা এখনও এলো না কেন?' প্রায় একঘণ্টা পরে নিবেদিতা আসিয়া স্বামীজিকে নতজানু হইয়া প্রণাম করিলে তিনি কঠোর গম্ভীর স্বরে শুধু সম্বোধন করিলেন, 'নিবেদিতা'। স্বামীজির সেই স্বর শুনিয়া নিবেদিতা যুক্তকরে ভীতিপূর্ণ সন্ত্রস্থ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার আজ আসতে এত দেরী হলো কেন?' নিবেদিতা মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, 'একজন বন্ধুর সঙ্গে আমি অপরাহ্নে চৌরঙ্গীতে গিয়েছিলাম, নানা জায়গায় ঘোরাঘুরিতে বিলম্ব হয়েছে। এসেই আপনার কাছে চলে এলাম।' স্বামীজি বেশ গম্ভীর স্বরেই বলিলেন, 'নিবেদিতা, তুমি এখন ব্রহ্মচারিণী, সন্ধ্যার পর

কোনও পুরুষের সঙ্গে চলাফেরা এমন কি আলাপ করাও ঠিক নয়। সন্ধ্যায় জপধ্যান করার সময়, আমি থাকলে শুধু প্রণাম করতে আসতে পার, তার বেশী নয়। রাত্রিকালে এখানে আসাও ঠিক নয়।' নিবেদিতা অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, 'স্বামীজি, ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ হবে না।' স্বামীজি তখন প্রসন্ন দৃষ্টিতে দু'একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া নিবেদিতাকে বিদায় দিলেন!"

এই ঘটনা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যার আচরণের উপর কিরকম কঠিন দৃষ্টি রাখিতেন। এইভাবেই তিনি নিবেদিতাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে নিবেদিতা বোসপাড়া লেনের সামান্য স্থানে বাস করিয়াও সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

॥ দশ ॥

স্বামী বিবেকানন্দ আবার পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হইবেন।

তিনি আজকাল নিবেদিতাকে প্রায়ই বলিতেন—"কাজ তো সবে শুরু করেছি; য়ুরোপে ও আমেরিকাতে সবেমাত্র একটা কি দুটো ঢেউ তুলেছি—একটা মহাতরঙ্গ তুলতে হবে—জাতিটাকে উল্টে ফেলতে হবে। জগৎকে এবার একটা নূতন সভ্যতা দিতে হবে।" এইবার প্রথমে লণ্ডন যাইবেন। নিবেদিতাকে সঙ্গে লইলেন। টাকার অভাবে স্কুল ভাল চলিতেছে না, টাকার দরকার। নিবেদিতা বিলাতে টাকা তুলিবার উদ্দেশ্যে যাইতেছেন। যাইবার আগের দিন মঠে স্বামীজি বক্তৃতা করিলেন। বলিলেন—"বাবা সব, তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই। ইহার কিছুমাত্র সফল হলেও আমার জন্ম সার্থক হবে—আর কি বলিব? রামকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার জন্য যত্নবান হও—জীবনে কর্মের ও বৈরাগ্যের সমাবেশ কর।"

২০শে জুন, ১৮৯৯।

বাগবাজার হইতে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত বিবেকানন্দ মহিষাদলের রাজার ব্রুহাম গাড়ি করিয়া গেলেন। স্বামীজি এইবার সমুদ্রযাত্রায় পোষাক বদলাইয়াছিলেন—আসাম সিল্ক-এর কোট এবং দশ-বার টাকা দামের কেবিন সু আর নাইট ক্যাপ। ঘাটে প্লেগের পরীক্ষা

হইল—খুব কড়া পরীক্ষা। বহু লোক সমবেত হইয়াছিল তাঁহাকে বিদায় জানাইতে। বেলা পাঁচটার সময় লঞ্চ আসিল। স্বামীজি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মঠের সকলেই সেখানে উপস্থিত—লঞ্চ ছাড়িবার সময় সকলেরই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল—কাহারও কাহারও বা চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তারপর উপস্থিত সকলেই শ্রদ্ধাভরে তাহাদের নয়নাভিরাম স্বামীজির উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। গঙ্গাতীরে সেই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। অপরাপর সাহেবেরা অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল। তাঁহাদের তিনজনেরই (বিবেকানন্দ, হরিমহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ও নিবেদিতা) প্রথম শ্রেণীর টিকিট। জাহাজের নাম 'গোলকুণ্ডা'। তিনজনে জাহাজে গিয়া উঠিলেন। জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নৌকা করিয়া জাহাজের পাশে গিয়া কিছু ঘরের তৈরি খাবার এবং গঙ্গাজল দিয়া আসিলেন। ক্রমে জাহাজ ছাড়িয়া দিল—যতক্ষণ দেখা গেল সকলে রুমাল প্রভৃতি ঘুরাইতে লাগিলেন। সমুদ্রপথ অতিক্রম করিবার অবসরে নিবেদিতাকে স্বামীজি পূর্বের মতন নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আচার্য হিসাবে শিষ্যাকে ইহাই তাঁহার শেষ শিক্ষা প্রদান। একদিন ঈশোপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীজি বলিলেন—"মাত্র আঠারটি কবিতা, কিন্তু বিষয়বস্তুর অপূর্ব অবতারণার জন্য এ-গ্রন্থ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনগ্রন্থ বলিয়া যুগে যুগে সমাদৃত। ইহার বক্তব্য বিষয় চারিটি—ব্রহ্মজ্ঞান ও তার ফল ; জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় ; সূর্যমণ্ডলবাসী পুরুষ এবং মৃত্যুকালীন চিন্তা ও অগ্নিস্তুতি। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগত্, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্'—পৃথিবীর কোন্ ধর্মগ্রন্থ এমন উচ্চভাবের কথা বলিতে পারিয়াছে ?"

জিব্রাল্টার প্রণালীর ভিতর দিয়া জাহাজ যাইতেছে। নিবেদিতাকে অদূরবর্তী স্প্যানিশ উপকূল দেখাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ খুব উত্তেজিতভাবে বলিলেন—"আমি যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, ঐখানে তারিকের অধীনে মুর যোদ্ধারা তাহাদের জাহাজ হইতে লাফ দিয়া স্পেনের জরাজীর্ণ রাজত্ব অধিকার করিতেছে এবং সেইখানে তাহাদের নিজস্ব রাজ্য কর্ডোভা ও গ্রানাডা স্থাপন করিল। মুরদের এই বিজয়গৌরব মানব সভ্যতাকে সেই সময় একটা নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে। বর্বর রোমকদের আক্রমণের ফলে অন্ধকার যখন খৃষ্টান য়ুরোপকে গ্রাস করিল, সেই সময় প্রাচীন গ্রীসের দর্শন ও বিজ্ঞান রক্ষা পাইয়াছিল ইহার ফলে। জিব্রাল্টার কথাটার মানে জান? শব্দটা আরবী, জেহেল্-আৎ-তারিক, অর্থাৎ যে পাহাড়ের নিকটে তারিক অবতরণ করেন।"
ইতিহাসে সুপণ্ডিত এমন লোক নিবেদিতা জীবনে কমই দেখিয়াছেন। বুঝিলেন, এই বীর সন্ন্যাসী আজন্ম শক্তির পূজারী, যেখানেই শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, সেইখানেই তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিয়াছেন। পরবর্তিকালে গুরুর এই ভাবটি নিবেদিতা পুরামাত্রায় পাইয়াছিলেন।

আর একদিন জাহাজে নিবেদিতা বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা গুরুজী, জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা কি?" ক্ষণমাত্র বিলম্ব না কিরয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছি যে মনুষ্যত্বলাভই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, এই অভিনব বার্তাই আমি পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছি।" গুরুর মুখে এই উত্তর শুনিয়া নিবেদিতার মনে হইলে, জীবনের দিকচক্রবালে তিনি যেন এক নূতন আলোকরেখা দেখিতে পাইলেন।

এইবারকার সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজি জাহাজের মধ্যে বসিয়াই তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' রচনা করেন। নিবেদিতা ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে আলোচনার অবসরে তিনি এই কার্যে রত হইতেন এবং তাঁহার দুইদিকে দুইজন বসিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেন যে, সন্ন্যাসী একাগ্রমনে লেখনী চালাইতেছেন—সেই লেখনীমুখে বাহির হইতেছে একটির পর একটি তেজগর্ভ বাক্য; বাক্য ত নয় যেন এক একটি অগ্নিফুলিঙ্গ এমনই জীবন্ত সেই হৃদয়গ্রাহী অনবদ্য রচনা। নিবেদিতা তখনও ভালো করিয়া বাংলা শেখেন নাই, তবু স্বামীজি যখন একদিন তাঁহার রচনার কিয়দংশ পড়িয়া শুনাইলেন, তখন নিবেদিতা বুঝিলেন, ভাবে ভাষায় এমন জ্বলন্ত রচনা একমাত্র স্বামীজির মতন তেজস্বী পুরুষের লেখনীমুখেই নির্গত হওয়া সম্ভব। স্বামীজি ভাবগম্ভীর কণ্ঠে পড়িতেছেন আর নিবেদিতা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন:

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী এই দাসসুলভ দুর্বলতা—এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উত্তরাধিকারত্ব লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?···হে ভারত ভুলিও না—নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি-মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী,—ভারতবাসী আমার ভাই—ভারতবাসী আমার প্রাণ···বল ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

পড়িতে পড়িতে স্বামীজির মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে আর তাহাই সবিস্ময়ে দেখিয়া নিবেদিতার কেবলই মনে হইতে লাগিল এই সন্ন্যাসী একজন কতবড় স্বদেশপ্রেমিক; তাঁর গৈরিকবাসের অন্তরালে রহিয়াছে কী প্রচণ্ড স্বদেশপ্রেম! বিবেকানন্দ

তাঁহার বাংলা রচনা সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী করিয়া শিষ্যাকে শুনাইলেন।

তাঁহারা ছয় সপ্তাহ জাহাজে ছিলেন। এই ছয় সপ্তাহের বিবরণ নিবেদিতা তাঁহার 'দি মাষ্টার য়্যাজ আই স হিম্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিবরণ বিবেকানন্দের জীবনের উপর এক নূতন আলোকপাত করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইয়া বিংশ-শতাব্দী আরম্ভ হইল।

শেষবারের মত অর্ধ পৃথিবী পরিক্রমা, য়ুরোপ ও আমেরিকায় বেদান্তের প্রচার, বুদ্ধগয়া ও বারাণসীতে শেষ তীর্থদর্শন এবং বাংলায় স্বদেশী-যুগের উষার আহ্বান করিয়া, ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ ইহজগৎ হইতে বিদায় লইলেন। শেষবার জীর্ণদেহে বুদ্ধগয়া ও কাশী পরিক্রমার সময় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ছিলেন জাপানী ভিক্ষু ওডা ও প্রাচ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞ চৈনিক চিত্রকলার সমঝদার কাউণ্ট ওকাকুরা এবং মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্মপাল। তাঁহার অসমাপ্ত কার্য শেষ করিবার জন্য পিছনে রাখিয়া গেলেন তাঁহার জীবনব্যাপী তপস্যার ফল নিবেদিতাকে। নিবেদিতার হাতেই তাঁহার সমস্ত ভার, আদর্শ এবং চিন্তার সম্পদ তিনি তুলিয়া দিয়া গেলেন। কারণ, নিবেদিতাই যে স্বামীজিকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; স্বামীজিও নিবেদিতাকে পরিপূর্ণভাবেই চিনিতে পারিয়াছিলেন, যাহা অপর কেহ পারেন নাই।

১৯০২। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষেই নিবেদিতা লণ্ডন হইতে রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত এক জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন।

বাংলার এই বরেণ্য সন্তান, অপূর্ব মনীষাসম্পন্ন রমেশচন্দ্রের সহিত .নিবেদিতা লণ্ডনে ১৯০১ সালে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমৃত্যু তিনি রমেশচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন।

এপ্রিল মাসেই স্বামীজি পীড়িত হইয়া পড়েন। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, আর বিলম্ব নাই, মৃত্যু আসিয়াছে। এই সময় একদিন বিবেকানন্দ দুইজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে আসিলেন। নিবেদিতা উল্লাসে "জয়, জয়-গুরু" বলিয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে দোতলায় উঠিয়া গিয়া একখণ্ড মৃগাজীনে বসিলেন। গুরুর পাদস্পর্শ করিয়া মাথায় হাত ঠেকাইয়া অগাধ ভক্তি ও স্নেহময়ী.শিষ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কেমন আছেন? কাশীতেই ভালো ছিলেন দেখিতেছি।" পিতৃ-প্রতিম আচার্যের শরীরের অবস্থার দিকে তাকাইয়া নিবেদিতার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল এক সুতীব্র ব্যথার আলোড়নে। স্বামীজি বলিলেন—"আত্মা অবিনশ্বর, কিন্তু শরীরটা তো ক্ষয়শীল, গীতায় ইহা পড়িয়াছ।" এই বলিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন—সেই স্নিগ্ধ নির্মল হাসি। তাহার পর কিছুক্ষণ কন্যার সহিত তিনি কথা বলিলেন। নূতন কথা আর বলিবার কিছুই নাই। শেষবার পৃথিবী পরিভ্রমণের সময় স্বামীজি নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন—উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষা দেওয়া। ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে স্বামীজি ভারতে ফিরিলেন, নিবেদিতা ইংলণ্ডে রহিয়া গেলেন। সেখানে থাকিয়াই তিনি স্বামীজির নির্দেশমত ভারতের কাজ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত তখন অক্সফোর্ডে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ভারত-প্রেমিক রমেশচন্দ্রের সহিত নিবেদিতার পরিচয় এই সময়েই হইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের জন্য নূতন বাড়ি নির্মিত হইতেছে। নিবেদিতা স্বামীজিকে বলিলেন—"নূতন বাড়িতে স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় আপনি কি আসিয়া আশীর্বাদ করিবেন?" নিবেদিতার কাঁধে হাত রাখিয়া সুমিষ্ট স্বরে বিবেকানন্দ বলিলেন—"আমার আশীর্বাদ তো সর্বদাই তোমার উপর রহিয়াছে।" তারপর বিদায়ের সময় স্বামীজি বলিলেন—"আগামী কাল সকালে তুমি একবার বেলুড় যাইও। সেইখানে সকলের সম্মুখে স্কুল সম্বন্ধে তোমার ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালী বুঝাইব।"

ইহার পর একদিন। মৃত্যুর ঠিক সাতদিন পূর্বে স্বামীজি বাগবাজারে নিবেদিতাকে দেখিতে আসিলেন। বলিলেন, "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছি। একটা মহা তপস্যা ও ধ্যানের ভাব আমার মধ্যে জাগিয়াছে।" এমন কথা তো গুরুর মুখে নিবেদিতা কখনও শোনেন নাই। তবে কি রামকৃষ্ণের সেই আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী—"নরেন যখনই জানতে পারবে সে কে এবং কি, তখন তার শরীর রাখবে না"—সফল হইতে চলিল? নিবেদিতা নিস্তব্ধ ভাবে স্বামিজীর কথাগুলি শুনিয়া গেলেন। কিছু বলিলেন না।

চারদিন পরে (৩রা জুলাই) নিবেদিতা নিজেই সহসা বেলুড় মঠে স্বামীজির কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজি সেদিন স্বহস্তে শিষ্যাকে খাদ্য পরিবেশন করিলেন এবং খাওয়া শেষ হইলে নিজে তাঁহার হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন। চকিতে নিবেদিতার মনে পড়িল—মৃত্যুর পূর্বে যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যের পা ধুইয়া দিয়াছিলেন। পরে স্বামীজি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। চক্ষু বুজিয়াই নিবেদিতা অনুভব করিলেন যে, স্বামীজি তাঁহার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। আর কোন

কথা হইল না। পৃথিবীতে গুরুর সঙ্গে নিবেদিতার ইহাই শেষ সাক্ষাৎ।

১৯০২। ৪ঠা জুলাই। শুক্রবার। রাত্রি নয়টার সময় স্বামী বিবেকানন্দ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পরদিন সকালে মঠ হইতে এক পত্রবাহক এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া নিবেদিতার কাছে আসিল। চিঠিখানি পড়িয়া তাঁহার অন্তর হইতে একটি অস্ফুট আর্তনাদ উঠিল। সেই পত্রবাহকের সঙ্গে নিবেদিতা তখনি ঝড়ের মত বেগে বেলুড় অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন।

নিস্তব্ধ মঠ। সকলেই চুপচাপ।

নিবেদিতা একাকী উপরে স্বামীজির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেঝের উপর হরিদ্রাবর্ণের পুষ্পে আবৃত স্বামীজির মৃতদেহ শায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ক্লান্ত শিশু যেন মায়ের কোলে ঘুমাইতেছেন—হাতে জপের মালা। যেন সমাধিলীন সুন্দর শিবমূর্তি। যেন মহাধ্যানী মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন মহাধ্যানে—মহাযোগী শয়ন করিয়াছেন অনন্ত শয়নে। বিশাল পদ্মচক্ষু দুইটি ঊর্ধ্বগামী—সেখান হইতে অপরূপ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। নিবেদিতা সেই শবদেহের পার্শ্বে নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন এবং স্বামীজির মস্তক নিজের কোলে তুলিয়া লইলেন। তারপর একখানি পাখা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে বাতাস করিতে লাগিলেন। সে মূর্তি ধীর-স্থির; একেবারে নিস্তরঙ্গ। চক্ষে অশ্রু নাই, অধরোষ্ঠও একটু কাঁপিতেছে না। কেবল একমনে স্নেহময় গুরুর দেহে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছেন। নিবেদিতার হঠাৎ মনে পড়িল, অমরনাথে স্বামীজি বলিয়াছিলেন,—"শিব আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন।" ইহাই কি সেই ইচ্ছা-মৃত্যু? বিবেকানন্দ

নাই, কিন্তু তাঁহার সেই আশ্বাস-বাণী—"আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পিছনে থাকিব"—নিবেদিতার অন্তরে জাগ্রত রহিয়াছে। সুতরাং নিবেদিতা বিন্দুমাত্র শোক প্রকাশ করিলেন না। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময়ে আনন্দ শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিয়াছিলেন। নিবেদিতার নারী-প্রকৃতি আরো কঠিন, এ-ধাতু অগ্নিতেও গলে না, কিন্তু তাঁহার অন্তরে তখন কি হইতেছিল, কে কল্পনা করিবে ?

ধীরে ধীরে চিতার আগুন নিভিয়া গেল। প্রজ্জ্বলিত সেই চিতাগ্নির নিকট হইতে একই সঙ্গে প্রেরণা পাইলেন দুইজন—নিবেদিতা আর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উপনিষদের শিক্ষক, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সেদিন বোলপুর হইতে কলিকাতা ফিরিতেছিলেন। হাওড়া ষ্টেশনেই বিবেকানন্দের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি দৌড়াইয়া বিবেকানন্দের চিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিস্তব্ধ হৃদয়ে সেই গগনস্পর্শী চিতার আগুনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উপাধ্যায় যখন অনুভব করিতেছিলেন, বিবেকানন্দের 'ফিরিঙ্গি-জয় ব্রত' তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, ঠিক সেই সময়েই অদূরে একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া নিবেদিতাও ভাবিতেছিলেন—স্বামীজির মধ্য দিয়াই তিনি পাইয়াছেন ভারতকে—একান্তভাবেই আপন সত্তাকে মিশাইয়া দিয়াছেন ভারতীয় সত্তার সঙ্গে। ভাবিলেন, স্বামীজি আমাকে একটি কাজের ভার দিয়াছেন। আমাকে উহা করিতে হইবে। তাহার পর গুরুর চিতাভস্মরাশি কুড়াইয়া নিবেদিতা নিঃশব্দে গৃহে ফিরিলেন।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর ছয় মাস পরেই তাঁহার কন্যার জীবনে আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত নিবেদিতার

আর কোনো সম্পর্ক রহিল না। স্বামীজির মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রচারিত হইল যে, এখন হইতে ভগিনী নিবেদিতার কার্যাবলীর সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার নিজের—বেলুড় মঠের কোনই সংস্রব নাই। কি কারণে এই অঘটন ঘটিল, কেনই বা ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ সহকর্মিগণ নিবেদিতার প্রতি সহসা এমন বিরূপ হইলেন,সে আলোচনা আমাদের আখ্যায়িকার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহাতে নিবেদিতার কোনো ক্ষতি বা অসুবিধা হয় নাই; কেননা, বিপুল রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তাঁহার স্থান না হইলেও, ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে সমগ্র জাতির অন্তরে নিবেদিতা একটি গৌরবময় স্থান পাইয়াছিলেন। তাছাড়া, তিনি জানিতেন গুরু তাঁহাকে ভারতমাতার বেদীতলেই সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, কোনো মিশনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে নিবেদিতার স্থান হয় নাই,কারণ তাঁহার জীবনে 'মিশন' অপেক্ষা সমগ্র ভারতবর্ষই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছিল। এই ভারতবর্ষকে তিনি পাইয়াছিলেন গুরুর ভিতর দিয়া। শুধু ভাবলোকেই নয়, পরাধীনতার সমস্ত ব্যথা ও বেদনা লইয়াই এই ভারতবর্ষ—বিবেকানন্দের প্রিয় ভারতবর্ষ—তাঁহার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। রাজনৈতিক সচেতনতা লইয়াই নিবেদিতার জন্ম, কাজেই রাজনীতি হইতে তিনি কি ইংলণ্ডে, কি ভারতবর্ষে, কোন দিনই দূরে সরিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিতেই ইহা দেখিয়া গিয়াছেন। দেখিয়া মনে মনে তিনি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, যে-কাজ তিনি কর্মব্যস্ত জীবনে করিবার অবসর পান নাই, এই কন্যার দ্বারাই সেই কাজ হইবে। হইয়াছিলও তাহাই। এইদিক দিয়া দেখিলে নিবেদিতাই বিবেকানন্দের রাজনৈতিক জীবন।

বাংলার ইতিহাসে বিংশ শতকের আরম্ভেই যে-যুগ আসিতেছিল, বিবেকানন্দের দূরদৃষ্টি তাহা সঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল। ইতিহাসের সেই অভ্রান্ত সঙ্কেত যখন তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িল, তখন তাঁহার জীবনী-শক্তি নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে; ক্লান্ত বাহু তখন আর গাণ্ডীব ধারণে সমর্থ ছিল না এবং তাঁহার আয়ু-সূর্যও তখন পশ্চিমের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাই তাঁহার রাজনৈতিক চেতনার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে পিছনে রাখিয়া গেলেন একমাত্র নিবেদিতাকে। তাঁহার দিব্য-দৃষ্টি ছিল—সেই দৃষ্টিবলে তিনি দেখিয়াছিলেন বাংলার প্রত্যাসন্ন ইতিহাসের নিস্তরঙ্গ বুকে বিপ্লবের যে-তরঙ্গ উঠিবে, সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিবেন তাঁহারই আত্মসৃষ্ট কন্যা নিবেদিতা। সন্ন্যাসীর এই স্বপ্ন ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, বিবেকানন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমরা দেখিতে পাই, /নিবেদিতা যেন একেবারে বাংলা দেশের হৃদয় হইতে আবির্ভূতা হইয়া বাংলার নবজাগরণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন মঙ্গলময়ী লক্ষ্মী ও বরাভয়দাত্রীরূপে।/

অতঃপর বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও শিল্প-জাগরণের যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আমরা নিবেদিতাকে দেখিতে পাইব, তাহার পটভূমি আমাদের একটু জানিয়া রাখা দরকার।

বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষ্য করিয়া বাংলা দেশের মধ্যে যে-বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্র বলিলে বিষয়টিকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দেখা হইবে। এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব হইতেই শিক্ষিত বাঙালির মন য়ুরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে রাজনীতি যে-মূর্তিতে দেখা দিল, তাহাকে আন্দোলন না

বলিয়া, বলা উচিত বিপ্লব। অতীতের সহিত পরম্পরাগত সম্বন্ধ যখন ছিন্ন হয়, তখনই তাহাকে বিপ্লব বলা যায়। সঙ্ঘশক্তির জাগরণ ও আত্মশক্তি উদ্বোধন—এই দুইটিই ছিল এ-যুগের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। ইংরেজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর শিক্ষিত ভারতের যে অন্ধ অনুরাগ উনবিংশ শতকের শেষভাগে ম্লান হইয়া আসিতেছিল তাহা এইবার একেবারে লোপ পাইল। ইহার একটি পরোক্ষ কারণ ছিল—তাহা বিংশ শতকের আরম্ভে বুয়র যুদ্ধে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের বর্বর নগ্নমূর্তি।

পশ্চিমের প্রতি অন্ধ অনুরাগ যেমন একদিকে দূর হইল, পূর্ব এশিয়ার নব-জাগ্রত জাপানের প্রতি শিক্ষিতদের চিত্ত তেমনি আকৃষ্ট হইল। তখনো (১৯০২-৩) জাপান রুশকে পরাজিত করিয়া বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করে নাই। দুই-একজন ভাবুক জাপানী আসিতেছেন, মুষ্টিমেয় বাঙালি মনীষীদের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইতেছে। এই আশাবাদী, আদর্শ-সন্ধানীদের মধ্যে অন্যতম হইতেছেন কাকুজো ওকাকুরা। তিনি ছিলেন শিল্পী ও শিল্প-শাস্ত্রী বা আর্ট-ক্রিটিক। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তিনি এই দেশে আসেন। বাংলাদেশে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সহিত, ভগিনী নিবেদিতার সহিত ও অপরদিকে নব্য বাংলার সংস্কৃতি-কেন্দ্র, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সহিত। 'এশিয়া এক'—ইহাই ছিল ওকাকুরার আদর্শ; তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, উদ্ধত পাশ্চাত্ত্য জাতির নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইতে হইলে সমগ্র এশিয়াকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু জাগ্রত জাপান ওকাকুরার দৃষ্টিতে এশিয়াকে দেখিতে পারে নাই। বিংশ শতকের প্লাবনের মুখে দাঁড়াইয়া ওকাকুরা বলিয়াছিলেন—'এশিয়া এক'। এই কথার প্রতিধ্বনি সেদিন নিবেদিতার অন্তরেও উঠিয়াছিল। নিবেদিতার মত ওকাকুরাও বিশ্বাস

করিতেন, প্রত্যেক জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ হইতেছে শিল্পধারায়। এইখানে দুইজনে মিল। চিত্রাদি শিল্পকলার ভাষা নাই, কিন্তু তাহারা মূক নহে। সাহিত্যের মত কারু-শিল্পের ভিতর দিয়াও মানুষে তাহাদের অন্তরের বাণী প্রকাশ করিতে পারে, কেবলমাত্র পাঁচ আঙুলের লীলায় সে সব কথা বলিতে পারে। শিল্পের বাণী সহজেই সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়। সেইজন্য ওকাকুরা তাঁহার 'আইডিয়ালস্ অব্ দি ঈস্ট্' বইতে (এই বইখানি মূলতঃ নিবেদিতারই রচনা) প্রাচ্যের আদর্শের আলোচনা করিতে গিয়া নবীন জাপানের শিল্পের অভিব্যক্তির কথাই বলিলেন, কারণ জাপানের যথার্থ ইতিহাস রূপ লইয়াছে শিল্প-সৌন্দর্যে, তাহার পাশ্চাত্ত্য অনুকরণপ্রিয়তা তাহাকে মহত্ত্ব দান করিতে পারে নাই। শিল্পের মূক ভাষা সমস্ত এশিয়াকে এক করিবে—ইহাই ছিল আদর্শবাদী ওকাকুরার স্বপ্ন। ওকাকুরার এই বইটি নিবেদিতার লেখা একটি মূল্যবান ভূমিকায় সমৃদ্ধ। ইহা ১৯০৩ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে এশিয়াবাসীর যে আধ্যাত্মিক সত্তার ঐক্য ও সূক্ষ্ম ভাবধারা আছে, তাহা ওকাকুরা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ভ্রমণে ও আলাপ আলোচনায় বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুস্তকে তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। স্বামীজির দেহত্যাগের পর শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নিবেদিতার মাধ্যমে। স্বামীজি ওকাকুরাকে 'অক্রূর খুড়ো' বা 'খুড়ো' বলিয়া ডাকিতেন। মঠে ইহাই ছিল তাঁহার ডাকনাম। স্বামীজির প্রতি ওকাকুরার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম—যেমন ছিল তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ভারতের প্রাচীন শিল্প-সৌন্দর্যের প্রতি।

সমসাময়িকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার অখণ্ড এশিয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে ভারতে যে জাতীয়তা-

বোধ জাগিয়াছিল, তাহা প্রধানত ধর্মমূলক। ইহার আশ্রয় ছিল জাতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব এবং এই জাতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইয়া বাংলাদেশে নবশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার পিছনে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়েই ছিলেন। বিংশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় শিল্পকলা জাতীয়তাবোধকে আশ্রয় করিয়া নূতনভাবে দেখা দিল। শিল্প-চেতনার জাতীয়তায় এদেশের শিক্ষিত সমাজকে নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ করিলেন মহামতি হ্যাভেল। কারুশিল্পের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, কুটির-শিল্পের মধ্যে যে কৌলীন্য আছে, তাহার প্রতি হ্যাভেলই শিক্ষিতের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করিলেন। কারুশিল্প হইতে চারুশিল্পে, বয়ন-শিল্প হইতে সূচীশিল্পে, মৃৎশিল্প হইতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি ক্রমে ভারতীয় চিত্র, ভারতীয় স্থাপত্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতীয় শিল্পের অনুরাগিণী আরেকজনও ছিলেন তখন। তিনি নিবেদিতা। বলা বাহুল্য, নিবেদিতা প্রাচ্য শিল্প-দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্বামী বিবেকান্দের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ও আধ্যাত্মিক হিন্দুত্বের দিক হইতে। হিন্দুধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, হিন্দু সমাজ-সংস্থানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদিতাকে ভারতীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগিণী করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতীয় শিল্প আধ্যাত্মিক—এই ধারণা এই সময় হইতেই। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবেকানন্দ শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে যেমন শ্রদ্ধা জাগ্রত করিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাহাদের মধ্যে ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে তেমনই শ্রদ্ধার বোধ জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হ্যাভেল ও নিবেদিতা এবং অল্প পরেই আনন্দ কুমারস্বামী প্রাচীন ভারতশিল্পের যে ব্যাখ্যা দান করেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ধারা

অবলম্বনে চিত্রশিল্পে অভিনবত্ব আনিলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার অতুলনীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রাচীন-ভারতের আদর্শ প্রকাশে রত, অবনীন্দ্রনাথও তেমনি প্রাচীন ভারতের লুপ্ত সৌন্দর্য-বোধকে অতুলনীয় রেখায় ও বর্ণে ফুটাইয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে সাংস্কৃতিক ও স্বাদেশিকতার দুইটি রূপ যুগপৎ বাংলা দেশে দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের বাণী ও অবনীন্দ্রনাথের বর্ণের মধ্যে, এবং এই ক্ষেত্রে নিবেদিতার নেপথ্য প্রেরণা তাঁহাদের কতখানি সহায়তা করিয়াছিল, সে ইতিহাস আজিও লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে এই দুইটি বিষয় প্রত্যক্ষে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তাহার পরেই কঠিন আঘাতে জাতির চেতনা জাগিল।

বিংশ শতকের প্রারম্ভেই স্বামী বিবেকানন্দ মেঘমন্দ্রিত স্বরে বাঙালি যুবককে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, নির্বীর্যতা আধ্যাত্মিকতা নহে। তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ দুই-ই আজ পরিহার্য—ভারতে রজোগুণের চর্চার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথও 'নৈবেদ্য' কাব্যে বলিয়াছিলেন—"অন্যায় যে করে, আর, অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে।" অত্যাচারকে প্রতিরোধ করিবার আদেশ বাঙালির কাছে সেদিন এই দুই মহাপুরুষের বাণীর মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ঠিক এই সময়েই 'নিউ ইণ্ডিয়া' মারফৎ বাংলা দেশে বিপিনচন্দ্র রাজনীতি ক্ষেত্রে উগ্র স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্র বপন করিতে থাকেন। তিনি একাধারে তিলক ও বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরো দুইজনের নাম করিতে হয়; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গৈরিকধারী, শালপ্রাংশুমহাভুজ, তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী উপাধ্যায়ের দেহমন ও প্রাণ ছিল স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ। কথা বলিতেন যেন অগ্নিফুলিঙ্গ। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের অনুসরণে দেশের চারিদিকে

স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার কাজ। আর সতীশচন্দ্র ছিলেন নীরব সাধক, কর্মযোগী ও আজীবন ব্রহ্মচারী। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেরই তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার 'ডন্' সোসাইটি ছিল স্বদেশীসেবার পাঠশালা। স্বদেশী আন্দোলনে আচার্য সতীশচন্দ্রের দান অপরিমেয়। উনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে বাংলা দেশে হিন্দুত্বকে নূতনভাবে দেখিবার যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় সেই পর্বে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণ হিন্দুত্বের নূতন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবেই সেদিন বাংলার শিক্ষিত হিন্দুর সম্মুখে ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তার নূতন ভাবজগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

জাতীয় জীবনের সেই মহাসন্ধিক্ষণে বাঙালির এই ভাবজগতে আসিয়া দাঁড়াইলেন আর্যা নিবেদিতা। তাঁহার প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী বাংলার যুবকগণের চিত্তে জাতীয় আত্মমর্যাদার উদ্বোধন করিল। উনবিংশ-শতকের শেষে নিবেদিতার আগমন। এই উনবিংশ শতকের অন্তে ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতে নবযুগের অভ্যুদয়। সার্ধ শতাব্দী-কাল বাঙালী ইংরেজী শিক্ষায় অভ্যস্ত হইয়াছে। পুরাতন কালের অন্তকালে আসিয়া জাতি দেখিতে পাইল সে কী পাইয়াছে, কী হারাইয়াছে। জাতীয় জীবনে লাভক্ষতির হিসাব খতাইতে গিয়া সে দেখিল, জাতি অন্তরে-বাহিরে দেউলিয়া, বিদেশীর সহিত দীর্ঘ-কালের সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে একটি প্রাচীন দেশ তাহার সকল সম্পদ হইতে বঞ্চিত, ঐতিহ্য হইতে বিচ্যুত, সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট—সে আজ সম্মোহিত, আত্মবিস্মৃত। তাই আজ নানা অভিমানে তাহার অন্তর আচ্ছন্ন, দৃষ্টি মোহজড়িত, য়ুরোপীয়তার বহির্বাসের সে কাঙাল, প্রতীচ্যের বাণী তাহার কণ্ঠের ভূষণ, তাহার গর্বের বিষয়। জাতীয়

জাগরণের সন্ধিক্ষণে বাঙালিকে, ভারতবাসীকে আপনার সংস্কৃতি ও সাধনাকে বুঝাইবার জন্য বিবেকানন্দ যতদূর অগ্রসর হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তাঁহার আত্মসৃষ্ট কন্যা নিবেদিতার যাত্রা সেইখান হইতে আরম্ভ।

স্বামীজির মৃত্যুতে নিবেদিতার তাই শোক করিবার অবসর ছিল না। নিশ্চিন্ত আলস্যে বসিয়া শোকের বিলাস করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বেলুড়ে গঙ্গার তীরে চিতার আগুনে ৫ই জুলাই অগ্নিময় চেতনার যে মূর্ত বিগ্রহটি পুড়িয়া ভস্মীভূত হইলেন, তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করিবার জন্যই তারপর নিবেদিতা এক ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন।

জাতীয় জাগরণের সেই কলমন্দ্রিত আসরে বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনাকে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনায় পরিণত করিবার দুরূহ কার্যে নিবেদিতা এইবার অবতীর্ণ হইলেন। গুরুর উপদেশ নিবেদিতার হৃদয়ে আঁকিয়া গিয়াছে, সে রেখাঙ্কন তো মিলাইবার নহে। তাই গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নিবেদিতা জগৎসভায় তুলিয়া ধরিতে চাহিলেন। আত্মজিজ্ঞাসার এবং অতীত-সন্ধানের আকাশ-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিলেন তিনি। অবসন্নতার হীনবীর্য মুহূর্তে বিদ্যুতের চাবুক দিয়া বার বার আঘাত হানিয়া সাতকোটি বাঙালিকে তিনি যেন একই আশার, একই আনন্দ-বেদনার অনুভূতিতে জাগাইয়া তুলিতে চাহিলেন। কলঙ্কময় ক্লীবতার মহাপঙ্ক হইতে বাঙালি-সন্তানকে তিনি অগ্নিকমল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলেন। তাহার মহিমার ধ্বজাকে আকাশের পানে তুলিয়া ধরিতে চাহিলেন। সেদিন, সেই সংশয়াচ্ছন্ন যুগে,

বাঙালি-তরুণের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ জাগাইয়া তুলিল, একটি নারীকণ্ঠ—সে কণ্ঠে কবির ভাষা, প্রাণসাধিকার ভাষা, তাপসের ভাষা, প্রেমের ভাষা, জীবনের ভাষা—মৃত অক্ষরের শব্দ নয়, যেন ওজস্বী মন্ত্রোচ্চার। বাঙালি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, প্রেরণার অগ্নি-মশাল হাতে এ কোন্ নারী—তুষারধবল আবরণে অঙ্গ ঢাকা, করে রুদ্রাক্ষের মালা, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনবৎ—যেন মূর্তিমতী বীণাপাণি, অগ্নিবীণায় নবযুগ-জীবনের মহামন্ত্র বাজাইয়া বাংলা দেশের হৃদয় হইতে আবির্ভূতা হইলেন! নেত্রে তাঁহার আশীর্বাদ, হস্তে বরাভয় আর হাস্যে স্নেহের অজস্র কল্যাণধারা। বাঙালির জীবনের আকাশে সহসা যেন বজ্রগর্ভ মেঘের গর্জন শোনা গেল। সেদিন বাংলার প্রাণ-ভাগীরথী ঘন-গর্জিত তরঙ্গ-প্রক্ষেপে ইতিহাসের নিয়মে যে রকম প্লাবনছন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহারাই জানেন যে, কি ভাবে/নিবেদিতা তাঁহার বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া জাগ্রত বাংলার সেই প্রাণচেতনাকে দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সহস্র সহস্র হৃদয়ের প্রার্থনা-ভরা প্রান্তরে অগ্নিবীজ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন।

॥ এগার ॥

ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্ণদেবের একখানি জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। সেই জীবন-চরিতের একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখিলেন নিবেদিতা। সমালোচনাটি বাহির হইল স্টেট্সম্যান পত্রিকায়। সমালোচনা তো নয়, যেন পাশ্চাত্ত্যের বেদান্ত-চিন্তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস। এই একটি রচনাদ্বারাই ভারতবর্ষে আসিবার অল্প কয়েকদিন পরেই, নিবেদিতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এই প্রথম রচনাটিতেই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

নির্জন তপস্যা নিবেদিতার জন্য নহে, স্বামীজি ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাই শিষ্যার লেখার কাজে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। যখন কলিকাতায় প্লেগ হইল, অমনি নিবেদিতা কলম ধরিলেন, এই বিষয়ে কত প্রবন্ধ আর রিপোর্ট লিখিলেন। সেগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। তখন হইতে ভারতীয় সংবাদপত্রের জগতে নিবেদিতার প্রবেশ অবারিত হইল। 'এক্সপ্রেস' পত্রিকায় কলিকাতার বাঙালিদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে নিবেদিতার ধারাবাহিক প্রবন্ধ সেদিন সকলের নিকট অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সেইসব প্রবন্ধে ভারতবর্ষের অনাদি ছন্দ ধ্বনিত হইত। গ্রাম্য জীবনের কাহিনী, হিন্দু পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি, বাঙালি হিন্দুর পূজা-পার্বণ—সব কিছু নিপুণ তুলিতে আঁকিতেন নিবেদিতা। এমন করিয়া নিবেদিতা ইংরেজ পাঠকদের নিকটে সেদিন ভারতবর্ষকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। এ সবই

তিনি স্কুলের কাজের অবসর সময়ে লিখিতেন। লণ্ডনে থাকিবার সময়েও তাঁহার লেখনীর বিরাম ছিল না—সেখানকার কত সংবাদপত্রে লিখিতেন। লেখিকা নিবেদিতা এইভাবে ভারতবর্ষে আসিবার অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিলেন নিবেদিতা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নব্য বাংলার প্রতিভাবান কবি। মহর্ষিকে দেখিয়াছেন। এইবার মহর্ষি-পুত্রকে দেখিবার ইচ্ছা হইল নিবেদিতার। শিলাইদহ হইতে রবীন্দ্রনাথ ফিরিবার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়া নিবেদিতা একদিন রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের এই বিদেশিনী শিষ্যাটির কথা রবীন্দ্রনাথও শুনিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিবিড় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বোধ করিলেন। তারপর হইতেই জোড়াসাঁকোর এই সংস্কৃতি-কেন্দ্র নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি ঠাকুরবাড়ির একজন মান্য অতিথি হইয়া উঠিলেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁহার প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ। ক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ও সরলাদেবীর সঙ্গেও নিবেদিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় হইল। সংস্কৃতির দ্যুতিতে ঠাকুরবাড়ি যেন ঝল্‌মল্। তাই এইখানে নিবেদিতার যাওয়া-আসা নিয়মিত হইয়া উঠিল। স্বামীজি বাঁচিয়া থাকিতেই ঠাকুরবাড়ির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

রাজদ্রোহের অভিযোগে তিলক ধৃত এবং দণ্ডিত হইলেন। দেশের বরেণ্য নেতা, মহারাষ্ট্রের বীর সন্তান, বালগঙ্গাধর তিলকের স্বদেশ-প্রেমের কথা ভারতবর্ষে আসিয়াই নিবেদিতা শুনিয়াছিলেন। তিলক দণ্ডিত হইবার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ খুব বিচলিত হইলেন। মোকদ্দমা

পরিচালনার সময় তিনি নিজে অর্থসংগ্রহে সহায়তা করিলেন। তারপর রাজদ্রোহ আইনের বিরুদ্ধে টাউন হলে বিরাট প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথ "কণ্ঠরোধ" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেই কথা শুনিয়া নিবেদিতা বুঝিলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কল্পনাবিলাসী কবি নহেন, বাস্তব জগতের সঙ্গে, সাধারণ লোকের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় আছে—দেশের স্বাধীনতা-স্পৃহার এবং আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার প্রাণের যোগ আছে।

সেইদিন হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চক্ষে পরম শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া উঠিলেন। নিবেদিতার মধ্যেও কবি এক আশ্চর্য শক্তিময়ী, প্রতিভাময়ী এবং প্রাণময়ী নারীকে দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। নিবেদিতা আসিলেই ধর্ম সম্বন্ধে কথা হয়। নিবেদিতার চক্ষের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের প্রেম আর সৌন্দর্যের জগৎ খুলিয়া যায়। অপরূপ সুমধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন, নিবেদিতা মুগ্ধ হইয়া শোনেন, অপার মাধুরীতে তাঁহার মন ভরিয়া উঠে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর আনন্দে কাটিয়া যায়। কখনো রবীন্দ্রনাথ বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে আসেন। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদতুল্য বাড়ির তুলনায় নিবেদিতার ভবন অতি সামান্য। বাড়িটির দেয়ালে মাটির লেপ, জানালায় খড়খড়ি নাই, কিন্তু খস্‌খসের পর্দা দেওয়া। তাঁহার সজ্জাহীন সাদাসিধা ঘরটিতে নিবেদিতা কবিকে সমাদর করিয়া বসান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আলোর গানে আর আনন্দের হাওয়ায় সেই সামান্য ঘরটি যেন প্রাসাদের মত গম্‌গম্ করিয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথ বসিয়া বসিয়া নিবেদিতার প্রাণের প্রাচুর্য ও অন্তরের সৌন্দর্য দেখিতেন আর বিস্ময় বোধ করিতেন।

ক্রমে নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইল। দুইজনের মধ্যে কত ভাবের আদান-প্রদান হয়। তথাপি কবির নিকট

নিবেদিতা-চরিত্র জটিল মনে হইত—মনে হইত তাঁহার স্বভাবে অনেক আপাত-বিরোধ। নিবেদিতার কল্পনার বিশালতা কবিকে স্তম্ভিত করিত কিন্তু এই বিদেশিনীর স্বভাবের দৃঢ়তা এবং সকল বিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের তেমন ভাল লাগিত না। কিন্তু নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে চিরদিনের মত একটি স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।

নিবেদিতার মাধুর্য-মণ্ডিত চরিত্র এবং দৃপ্ত ও সমুন্নত ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় ছায়াপাত করিয়াছিল। ইহারই ফলে তাঁহার বিখ্যাত সৃষ্টি 'গোরা'। বিবেকানন্দের নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের গোরার মধ্যেই শাশ্বতী হইয়া আছেন। কখন যে তিনি কবি-মানসে একটি উপন্যাসের ছায়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদিতা জানিতেও পারেন নাই। গোরা সঙ্কল্পে কঠিন, অথচ সে নম্র-স্বভাব হিন্দু। নেতৃত্ব তাহার সহজাত প্রতিভা। অত্যন্ত গোঁড়া, অথচ মুক্তির উপাসক, স্বাধীনতার পূজারী। শেষ পর্যন্ত গোরা জানিতে পারিল, তাহার শরীরে আইরিশ সৈনিকের রক্ত। এই চরিত্র যখন সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে তখনো কবি নিজেও জানিতেন না, ইহার পরিণাম কি হইবে? শুধু জানিতেন একটি পুরুষের চরিত্র আঁকিবেন—নিবেদিতার মতনই কথা বলিতে বলিতে যাহার চক্ষে আগুন ঝলসিয়া উঠে, যাহার ব্যক্তিত্বে আছে একটি দুরন্ত প্রবেগ। গোরা রজতগিরি, নিবেদিতা গৌরাঙ্গী। তারপর যত দিন যাইতে লাগিল, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির সম্মুখে ততই নিবেদিতা পূর্ণ মহিমা আর অদম্য তেজ লইয়া দিনে-দিনে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইলেন। এই নিবেদিতাকেই রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসের পৃষ্ঠায় জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের তের বৎসর পরে বাংলা কথা-সাহিত্যে 'গোরা'র আবির্ভাব। নিবেদিতা বাঁচিয়া

থাকিতেই কবি কত সময় 'গোরা'র কাহিনী লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন: "'গোরা' রচনা শুরু হয় ১৯০৭ সালে—বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের শেষভাগে।··· উপন্যাসের মূল কথাটি হইতেছে যে গোরা আইরিশম্যানের পুত্র; সে বিদেশী, বিধর্মী, ইংরেজ-বিদ্বেষী, খৃষ্টানধর্ম বিরোধী, তাহার কাছে হিন্দুধর্মের সমস্তই সত্য, সমস্তই পবিত্র—নির্বিচারে সে সমস্তকে গ্রহণ করিয়াছে। গোরার প্রবল দেশাত্মিকতার উগ্রতা কবি স্বয়ং এক সময়ে তীব্রভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন; সেইজন্য গোরার যুক্তিজাল এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।··· স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা স্পন্দিত হইয়াছিল। গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাওয়া যায়। নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করূপে সৃষ্টি করিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের বহু দিনের ইচ্ছা, কনিষ্ঠা কন্যাটিকে ভাল করিয়া ইংরেজি শিখাইবেন।

প্রথম আলাপের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাই এই বিষয়ে নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন।

"সে কী, ঠাকুরবাড়ির মেয়েকে বিলিতি মেম বানাবেন?"

"ইংরেজি ভাষাটা শেখাতে চাই। আর সেই ভাষার মারফৎ যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষা।"

"কিন্তু বাইরে থেকে কোনো একটা শিক্ষা গিলিয়ে দিয়ে লাভ কি? বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষায় নিজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চাপা দেওয়া আমি আদৌ পছন্দ করি না।"

যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিবেদিতা সেদিন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কবি তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। ইহাই নিবেদিতাকে তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্রী করিয়া তুলিয়াছিল। অধ্যাত্ম জীবনে যিনি কোনো স্বাধীন ইচ্ছা রাখেন নাই, অন্যান্য বিষয়ে সেই নারীর এমন স্বচ্ছ এবং অভ্রান্ত বিচারবুদ্ধি রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য লাগিত। আর এইজন্যই বোধ হয় ভারতে আসিবার অব্যবহিত কাল পরেই বিবেকানন্দ নিশ্চিন্ত মনে নিবেদিতাকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত মেলামেশা করিতে দিতে পারিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব যখন নিবিড় হইয়া উঠিল, তখন নিবেদিতা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের জমিদারী কাছারীতে থাকিতেন। দুরন্ত পদ্মার প্রতি নিবেদিতা যেন অন্তরের একটি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন। পদ্মার প্রকৃতির সহিত তাঁহার প্রকৃতির যেন কোথায় একটি মিল ছিল। তেমনি উদ্দাম, উচ্ছলিত আর তেমনি তরঙ্গমন্দ্রিত।

একদিন।

নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া রবীন্দ্রনাথ চলিয়াছেন পদ্মার চরে সূর্যোদয় দেখিতে। সঙ্গে আছেন জগদীশচন্দ্র বসু। উষার সেই নিস্তব্ধ প্রহরে, নিবেদিতা দেখিলেন, কৃষকেরা লাঙল কাঁধে মাঠে আসিয়াছে। তাহাদের জমিদার রবীন্দ্রনাথকে তাহারা দেখিয়াছে অনেকবার। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সুন্দর শুভ্র বসনপরিহিতা গৌরাঙ্গী এক মেমসাহেবকে দেখিয়া তাহারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। আর একটি মেয়ে ছিল নিবেদিতার সঙ্গে। কোথায় গেল সূর্যোদয় দেখা। নিবেদিতা দৌড়াইয়া কৃষকদের নিকটে চলিয়া গেলেন। বলিলেন, "ভাই, তোমরা এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

"আমরা মেমসাহেবকে দেখছি।"

"মেমসাহেবকে দেখবার কিছু নেই। তোমাদের গাঁ কতদূরে ?"

"ঐ—ঐখানে।"

"চলো, তোমাদের গাঁ দেখে আসি।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। পদ্মার চরে যখন সূর্য উঠিল, নিবেদিতা তখন কৃষকদের কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া কৃষক-পত্নীর সঙ্গে গল্প করিতেছেন। একদিনের খেয়াল নয়। যে কয়দিন তিনি শিলাইদহে ছিলেন প্রতিদিন, মাসের পর মাস, নিবেদিতা যেন রবীন্দ্রনাথকেও চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার জমিদারীর যতগুলি গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামে তিনি ঘুরিলেন এবং ঐ দরিদ্র নরনারীর সঙ্গে প্রাণ মিলাইয়া, মন মিলাইয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের সমভাগিনী হইলেন। তাহাদের সঙ্গে চিঁড়া কুটিলেন, ধান ভানিলেন, তাহাদের নাড়ু-মোয়া খাইলেন ; তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের জন্য কত সাহায্য করিলেন। শিলাইদহের গৃহস্থ বাড়ির রান্নাঘর, শয়নঘর, ঢেঁকীঘর, গরু-বাছুর সব দেখিয়া তাঁহার কী আনন্দ। পল্লী নরনারীর নিজের হাতে তৈরী সেকেলে কাঁথা, ছেলেদের দোলাই, কুলো-ডালা, মাটির পুতুল, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ—এইসব বিচিত্র পল্লীশিল্প নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিত। উৎসাহের সঙ্গে অনেক কিছু সংগ্রহও করিলেন। মুসলমান জোলার তাঁতের রকমারি কাপড় বোনাও তিনি সাগ্রহে দেখিয়া লইলেন। বুনোপাড়ার ছেলেদের অষ্টসখীর নাচগানও শুনিতে ছাড়েন নাই।

ধানবনের ফাঁকে ফাঁকে, পদ্মার তরঙ্গিত বাঁকে বাঁকে লক্ষ লক্ষ জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা ও চাষীর যে সহজ জীবন পরিপ্লাবিত হইয়া রহিয়াছে, শিলাইদহে আসিয়া নিবেদিতা যেন সেই জীবনের সন্ধানে মাতিয়া উঠিলেন। এখানকার কুটিরে দীপাধারের স্নিগ্ধ আলো,

মাঙ্গল্যের আলপনা, নূতন ধানের স্বর্ণ-মঞ্জরী সব কিছু মিলিয়া নিবেদিতার মানস-কল্পনার নিভৃতে কিরণবর্ণা অনুভূতি জাগাইয়া তুলিল। লাহোরে রামলীলা দেখিয়া তাঁহার ঠিক এইরকম অনুভূতিই হইয়াছিল। সেই অনুভূতির উত্তাপই পরবর্তী কালে নিবেদিতার রচনার ভিতর দিয়া শিক্ষিত বাঙালির হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।

নিবেদিতার এই রূপ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। যেমন তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন কলিকাতায় যখন প্লেগ লাগে। সেই মহামারীর সময় কতদিন না নিবেদিতা তাঁহাকে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়াছেন, চুন বিলি করিয়াছেন নিজের হাতে।

তারপর স্বদেশীর দিনে একাধিক সভায় নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে বক্তৃতা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বুঝিলেন, এই বিদেশিনীর ভারত-প্রীতি যথার্থ প্রীতিই, মোহ নহে। তবু একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এমন অন্তরঙ্গভাবে এসব জিনিস দেখিবার যথার্থ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।" নিবেদিতা উত্তর দিয়াছিলেন—"আছে বৈ কি। গুরু বলিতেন, একটা জাতিকে বুঝিতে হইলে, তাহার সব কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।" ভারতবর্ষের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের জন্য বিদেশিনীর এই আকুতি, এই আন্তরিকতা, রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। নিবেদিতার প্রতি কবির মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। নিবেদিতাকে কবি অন্তরের সহিত ভাল-বাসিলেন। তাঁহার কার্যকুশলতা, উচ্চ আদর্শ ও মহাপ্রাণ যেন মধুর আলোকমূর্তি হইয়া কবির দৃষ্টিদীপের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল! মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে লোকমাতার গৌরবময় আসনে স্থান দিলেন। পরবর্তী কালে কবি তাই বলিতেন, বহু বিদেশী পুরুষ ও নারী ভারতের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, নিবেদিতার মত কেহ নহে।

নিবেদিতাও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ ও মানবতার বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি ঔপনিষদিক ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্যে মানব-রস সিঞ্চিত প্রকৃতি ও প্রেমের ঐক্যে গ্রথিত, বর্ধিত ও ছন্দিত। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদও করিয়া দিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোর আর একটি প্রতিভা নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিল। তিনি অবনীন্দ্রনাথ। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বশিল্প-দরবারে আবির্ভাব—ভারত-শিল্পের এই ইতিহাসে পরম গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া আছেন নিবেদিতা। আবার নিবেদিতার শিল্প-চেতনার পিছনে আছে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। আমরা আগেই বলিয়াছি যে, শিষ্যাকে সঙ্গে লইয়া বিবেকানন্দ যখন উত্তর-ভারত ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন নানা বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বহুবার নিবেদিতাকে অতীত ভারতের শিল্প-মহিমার কথাও বলিতেন। তারপর ১৮৯৯ সালে নিবেদিতাকে লইয়া স্বামীজি যখন শেষবারের মত পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইলেন, তখন স্বামীজির প্রেরণায় নিবেদিতাকে নিউ ইয়র্কে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রচার করিতে দেখি। ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে প্যারিসে পৃথিবীর ধর্মেতিহাস কংগ্রেসে নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া বিবেকানন্দ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে স্বামীজি একটি গভীর বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেন। তাহা "ভারতীয় শিল্পের উপর তথা কথিত গ্রীক প্রভাব"। স্বামীজি বিশেষ তথ্য সহকারে প্রমাণ করিলেন, ভারতীয় শিল্পের শাশ্বত প্রাণ কোনো কালেই

গ্রীক-প্রভাবে আচ্ছন্ন হয় নাই। স্বামীজির পূর্বে এই কথা কেহই উচ্চারণ করেন নাই—ইহার সাক্ষী ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। এই প্রসঙ্গে ডক্টর কালিদাস নাগ লিখিয়াছেন ঃ

"প্যারিস হইতে নিবেদিতাকে লইয়া স্বামীজি আবার আরম্ভ করিলেন শিল্পতীর্থপরিক্রমা। এইবার তিনি চিত্র-ভাস্কর্যাদি শুধু দেখাইলেন না, তুলনা-মূলক আলোচনা ও মন্তব্যও করিতেছেন। চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে পাশ্চাত্ত্য শিল্পধারা—অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার বড় বড় চিত্রশালা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া স্বামীজি ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রাচ্য-শিল্প নিদর্শনগুলিও পরীক্ষা করেন। পূর্ব হইতে পশ্চিমে শিল্প-প্রভাব কত ভাবে গিয়াছে, কী আগ্রহ তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড ও অন্য শিল্পবস্তু লইয়া তিনি এমন মাতিয়া উঠিলেন যে, উন্মুক্ত প্রান্তরে সঙ্গীদের সে বিষয়ে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। ভারতের তথা এশিয়ার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শিল্পের ইতিহাস লইয়া বক্তৃতার কল্পনাও জাগে নাই, কারণ সেখানে শুধু শিল্পী নয় শিল্পও যেন অস্পৃশ্য! স্বামী বিবেকানন্দ এ-ক্ষেত্রে সত্যই পথিকৃৎ।" জীবনে তিনি শুধু বেদান্তই প্রচার করেন নাই, ভারতের শিল্প-মহিমার কথা যখন যেখানে পারিয়াছেন, প্রাণ খুলিয়া বলিয়াছেন।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মধ্যে নিবেদিতা সেদিন শিল্প-রসিক বিবেকানন্দকেও দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার শিল্প-চেতনার সহিত গুরুর এই শিল্প-চেতনা মিলিয়াছিল। নিবেদিতা জানিতেন, "ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া স্থাপত্য শিল্পে, তাঁহার গুরুর অধিকার পুঁথিগত নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। পদব্রজে ভারতের প্রধান প্রধান সব মঠ-মন্দির স্বামীজি যেমন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন কম প্রত্নতাত্ত্বিক বা শিল্পের ঐতিহাসিকেরা দেখিয়াছেন।"

ভারতের শিল্পমহিমা সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু ধ্যান-ধারণা বিবেকানন্দ তাহার সমস্তই নিবেদিতার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন ; তাই না পরবর্তী কালে নিবেদিতা ভারতীয় শিল্প লইয়া এমন গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। নিবেদিতা তাই বিবেকানন্দের শিল্প-চেতনারও প্রতিনিধি।

ভারতের নবশিল্পের প্রচারে নিবেদিতার দান অসামান্য। ১৯০২ সাল হইতে ১৯১১ সালে যখন দেহত্যাগ করেন তখন পর্যন্ত নিবেদিতা একা অবনীন্দ্রনাথের ও অসিত-নন্দলালপ্রমুখ তাঁহার শিষ্যদের কত চিত্রের লিপিভাষ্য 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার পৃষ্ঠায় রাখিয়া গিয়াছেন। 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নিবেদিতা 'প্রবাসী'র জন্য প্রতি মাসে চিত্র-পরিচয় লিখিয়া দিতেন। রামানন্দ বাবু স্বয়ং তাহার অনুবাদ করিয়া ছাপিতেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গৃহ ও বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের সুচিত্রিত প্রাচীর ও ছাদ আজো নিবেদিতার স্মৃতি বহন করিতেছে। নিবেদিতার প্রেরণাতেই নন্দলাল স্বদেশী চিত্রকলার সুন্দর নিদর্শন এইসব ছবিগুলি আঁকিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের গৃহের দেয়ালে ভারতমাতার চিত্র নিবেদিতার ইচ্ছাতেই অঙ্কিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিল। উনিশ শতকের শেষ দশকে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে যেন এক বিপ্লবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। "পাশ্চাত্ত্য শিল্প-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কেরল-শিল্পী রবি বর্মা প্রচুর সুখ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। অবনীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্ত্য রীতিতে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে দেখা দিলেন মনীষী ই. বি. হ্যাভেল। হ্যাভেলের সহানুভূতি, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে এক নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছিল। ক্যানভাসে আঁকা বড় বড় তৈল-চিত্র বিসর্জন দিয়া অবনীন্দ্রনাথ

আঁকিতে লাগিলেন 'কৃষ্ণলীলা', রূপকথার নায়ক-নায়িকা, বুদ্ধ ও সুজাতা, ভারতমাতা প্রভৃতি অমর চিত্রাবলী। সেই বিরাট জাতীয় আন্দোলনের যুগে সংস্কৃতি-কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে আসিলেন টাইকান ও ওকাকুরা। ওকাকুরা ও হ্যাভেলের বই দুইখানি ভারতীয় শিল্পের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিল। ইঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিলেন নিবেদিতা। ওকাকুরার 'প্রাচ্যের আদর্শ' ("আইডিয়ালস্ অব্ দি ইষ্ট") পুস্তকের ভূমিকায় নিবেদিতা লিখিলেন—"সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে একই জীবন স্পন্দিত হইতেছে। প্রাচীন মানব সভ্যতার প্রসূতি এশিয়া চিরদিন এক এবং অখণ্ড···ভারতবর্ষই এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতবর্ষ হইতেই এই সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক তেমনি উন্নত।" নিবেদিতার এই সিদ্ধান্ত স্বদেশীযুগের চিত্রশিল্পে সংক্রামিত হইল। অবনীন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে নূতন করিয়া দীক্ষা লইলেন। অবনীন্দ্রনাথের মানসপুত্র নন্দলালকে নিবেদিতাই উদ্যোগী হইয়া অজন্তা-গুহা-চিত্রাবলী নকল করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাই না অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বলিলেন—"ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়।"

নিবেদিতা-প্রসঙ্গে শিল্পগুরু লিখিয়াছেন :

"নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হত না অজন্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসালের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপশন্ দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট

ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা ; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।"

"...সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই ! আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে ; আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজা-রাজড়া, সাহেব-মেম গিস্-গিস্ করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব ; কত তাদের সাজ-সজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা ; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্য ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হলো। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উড্রফ্ ব্লাণ্ট এস বললেন, 'কে এ ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম। 'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।...নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর-স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত। · নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল ; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।"

জাতীয় শিল্প-জাগরণে নিবেদিতা নিজেই একটি অধ্যায়। দেশী চিত্রকলার সেই রেনেসাঁস যুগে শিল্প-লক্ষ্মীরূপে ভারত-শিল্পসাহিত্যের মর্মকথা তাঁহার মত অনুপম ভাষায় আর কেহ লিখিতে

পারেন নাই। সেদিন নিবেদিতার সাহায্য না পাইলে নানা প্রতিকূল সমালোচনার মধ্যে নব্যভারত-শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত কিনা সন্দেহ। তাঁহারই প্রেরণায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভারতের নব-শিল্প প্রচারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। নিবেদিতার প্রেরণার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সময়ে আর একজন শিল্প-বোদ্ধা ভারতীয় শিল্প-প্রচারে অগ্রণী হইলেন। তিনি আনন্দ কুমারস্বামী। তাঁহার বিচিত্র শিল্পসন্দর্ভগুলি জাতীয় শিল্প-জাগরণে নিঃসন্দেহে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়া দিয়াছে। এই কুমারস্বামীর প্রেরণা ছিলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা সম্বন্ধে কুমারস্বামী লিখিয়াছিলেন ঃ

"১৯১১ সালে ভগ্নী নিবেদিতার অকাল-মৃত্যুর দরুণ তাঁহার অসমাপ্ত 'হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণকাহিনী' গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার ভার আমার উপর পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠা শিষ্যা ছিলেন নিবেদিতা। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সমাজ-বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হইয়া তবেই ভারতের জীবন-প্রণালী, শিল্প ও সাহিত্য লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতের আদর্শ বিষয়ে ও ইহার নর-নারীদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও আন্তরিকতা সত্যই অতুলনীয়। নানা প্রবন্ধ পুস্তকাদির ভিতর দিয়া লেখিকা নিবেদিতা শুধু পাশ্চাত্ত্য জগতের নিকটে ভারতের মুখপাত্রী হইয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এক অভিনব ভারতীয় ছাত্র-গোষ্ঠীকে, যাহারা ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও শিল্পের ভিতর দিয়া জাতীয় আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল।"

ভারতের শিল্প-আত্মার যথার্থ পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়াই নিবেদিতা ভারতের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মাধুর্যভরা ছোট ছোট আচার-অনুষ্ঠানের সহিত চিরন্তন ধর্মের যোগ কত গভীর তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচনায়, তাঁহার সেবায় তাহার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তাই নন্দলাল বসুর 'সতী' চিত্রখানির অমন গভীর ব্যাখ্যান লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন। 'সতী'

চিত্রখানি জাপানের সর্বপ্রধান শিল্পপত্রিকা 'কোক্কা'তে প্রকাশিত হয় এবং সেই চিত্রের লিপিভাষ্য প্রসঙ্গে নিবেদিতা বিশ্বের শিল্পীমহলে প্রমাণ করিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যেরা-এক নবযুগের আরম্ভ করিয়াছেন। 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতমাতা' চিত্রখানি যখন প্রকাশিত হইল, নিবেদিতা তখন 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় সেই চিত্রের উপর একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় ও ব্যাখ্যার মৌলিকত্বে সেই প্রবন্ধটি অবিস্মরণীয়। নিবেদিতা লিখিলেন—"অবনীন্দ্রনাথের এই চিত্রে আমরা সেই জিনিস লক্ষ্য করিতেছি, যাহার জন্য ভারতীয় শিল্পকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। এই চিত্রের রেখায় ও বর্ণে সেই সব ভাবেরই উন্মেষ লক্ষ্য করি যেগুলি ভারতে নবযুগের সূচনা করিবে।" ভারতের শিল্পমহিমার প্রচারে নিবেদিতা সত্যই ছিলেন শিল্প-ভারতী। ভারতের শিল্প-লক্ষ্মী যেন সেদিন এই ভারত-দুহিতার লেখনী আশ্রয় করিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। 'সিভিক এ্যাণ্ড ন্যাশনাল আইডিয়ালস্' গ্রন্থে নিবেদিতা ইহার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, ভারত-শিল্পের এমন সার্থক ভাষ্য নিবেদিতার মত আর কেহই রচনা করিতে পারেন নাই। সেদিন নিবেদিতা না থাকিলে বিপ্লবী রূপদক্ষ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এমনভাবে সার্থক হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ। এই শিল্প-ভারতীর সহযোগিতা ও প্রেরণাতেই অবনীন্দ্রনাথ শিল্পগুরু হইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। রূপরাজ্যে অবনীন্দ্রনাথের অভিসার-পথের তিনিই ছিলেন আলোকবর্তিকা।

এই প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু লিখিয়াছেন :

"নিবেদিতার মুখে এমন একটা তেজস্বিতা, দীপ্তি ও পবিত্র মুখশ্রী আমি দেখেছি যা সচরাচর চোখে পড়ে না এবং একবার দেখলে কখন যা জীবনে

ভুলতে পারা যায় না। তাঁর কাছে আমরা এত উৎসাহ পেয়েছি যে বলবার নয়। তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম, কিন্তু প্রকাশ করে বলা কঠিন। • নিবেদিতার কাছ থেকেই আমরা বিবেকানন্দের ভাব ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই। আমি তখন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র। একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতা স্কুল দেখতে এলেন। আমি তখন দুখানা ছবি করেছিলাম। একখানা মা কালীর আর অন্যখানা সত্যভামার মানভঞ্জন। নিবেদিতা অনেকক্ষণ ধরে খুব যত্ন করে ছবি দুখানা দেখলেন, প্রশংসা করলেন ও আমাকে উৎসাহ দিলেন। কালীর ছবিখানা দেখে বলেছিলেন, 'আরো একটু ঢলঢলে ভাব হবে, সাজসজ্জা বেশী থাকবে না, আর একটু উন্মাদিনী ভাবের হবে।' আমাকে তাঁর বোসপাড়ার বাড়িতে যাবার জন্যে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ শিল্পপ্রেমিক।... কিছুদিন পরে সহপাঠী সুরেন গাঙ্গুলীকে সঙ্গে করে বোসপাড়ায় নিবেদিতার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। সিস্টার ক্রিস্টিন ও নিবেদিতা দুজনে বসেছিলেন। নিবেদিতা বললেন—'তোমরা নীচে আসন করে বস, আমি দেখি।' আমরা দুজনে নীচে আসন করে বসলাম। নিবেদিতা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের প্রতি চেয়ে রইলেন। আমরা নিবেদিতার এই অদ্ভুত আচরণে মনে মনে আশ্চর্য বোধ করলেও মুখে কিছু বললাম না। দেখলাম, কী প্রশান্ত উজ্জ্বল সেই দৃষ্টি—এমনটি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। তারপর ছোট একটি বুদ্ধমূর্তি এনে আমাদের দেখিয়ে বললেন—'কি দেখছ, বল দেখি?'

আমি উত্তর করলাম, 'একটি বুদ্ধমূর্তি।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু দেখ আমার গুরুদেবের চেহারার সাথে এ মূর্তির কি আশ্চর্য মিল।'

"তারপর নিবেদিতা আমাকে স্বামীজির একখানা ছবি তৈরী করতে অনুরোধ করেন। দিন কয়েক পরে আমি স্বামীজির একখানা ছবি করে নিবেদিতাকে উপহার দিলাম। ছবি দেখে নিবেদিতার আনন্দের সীমা ছিল না।

আমাকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন, আর বলেছিলেন, 'ছবিতে কাপড়-চোপড় একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে।' তারপর থেকে আমি প্রায়ই নিবেদিতার বাড়ি যেতাম, আবার কখন কখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতেও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতো। মিসেস হেরিংহ্যামের সঙ্গে আমার আর অসিতের অজন্তা যাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন এবং তিনিই একরকম জোর করে আমাদের সেখানে পাঠিয়েছিলেন। দশ বার দিন পরে নিবেদিতাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাদের কাজ (কাজ ছিল অজন্তার ছবি নকল করা) দেখে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। শতমুখে তিনি প্রশংসা করলেন।"

এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার হালদার লিখিয়াছেন :

"আমাদের ছিল তখন দেশী শিল্পের গবেষণা কাল। ভিক্টোরীয় যুগের পর এই প্রথম আবার ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্টের ধারা নবীনভাবে এল। আমাদের এই নবধারার ভারতীয় শিল্পকলার চর্চায় প্রধান উৎসাহদাতা যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন এন ব্লাণ্ট, জাস্টিস উড্রফ্, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু এবং ভগিনী নিবেদিতা। শ্রদ্ধেয় ভগিনী নিবেদিতা আমাদের ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতাদের মধ্যে। নিবেদিতার ১৯১০ সালের প্রদর্শনীর চিত্র সমালোচনা যা মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় সেই বৎসর বেরিয়েছিল তা থেকে তাঁর আমাদের দেশী চিত্রকলার উদ্বোধন-যজ্ঞে কতটা সহানুভূতি ছিল তা জানা যাবে।...... ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা অমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন। আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজারে যেতাম। তাঁর বাড়িতে একটি স্কুল ছিল। সব জিনিসপত্র খুব তকতকে ঝকঝকে পরিষ্কার থাকত। মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে এইভাবে পরিচ্ছন্নতাও শিক্ষা দিতেন। আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার সাবধান করতেন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দি। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করচে—সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।......

আমাদের বারবার উপদেশ দিলেন, জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে, জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন আমাদের ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে আসতেন এবং শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন।”

এই প্রসঙ্গের শেষে আর একটি কথা বলিব। ১৯০০ সালের জুন মাসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন নিউইয়র্কে, ভগিনী নিবেদিতাও তখন লণ্ডন হইতে সেখানে গিয়াছেন স্বামীজির অনুরোধে ও সেখানকার বেদান্ত সমিতির আহ্বানে। বিবেকানন্দ শিষ্যাকে কাজে লাগাইলেন। স্বামীজির কথামত প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার বৈকালে নিবেদিতা বক্তৃতা দিতেন। একদিন হিন্দু নারীদের জীবনের উচ্চ আদর্শ সম্পর্কে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিন্তু নিউইয়র্কে নিবেদিতার উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা হইল ‘প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা।’ ইহা হইতে আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ভারতীয় শিল্পকলায় নিবেদিতা স্বামীজির নিকট হইতেই প্রথম পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজির মৃত্যুর পর ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে স্বামীজির গবেষণার ধারাকে নিবেদিতাই শিল্পসম্পর্কিত তাঁহার একাধিক রচনা ও সমালোচনার ভিতর দিয়া আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছিলাম, জাতীয় শিল্প-জাগরণে নিবেদিতা নিজেই একটি অধ্যায়। তাঁর শিল্পপ্রীতি স্বপ্নের আত্মবিলাস নয়, জাগরণের আত্মপ্রত্যয়। বিস্মৃতির অতলগর্ভ হইতে তিনি ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মহিমাকে উদ্ধার করিয়া আমাদের নিকট সাগ্রহে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাই সেদিন ভারত-শিল্প এমন ভাবে জগৎ-সভায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছিল। শুধু এই জন্যই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।

॥ বার ॥

নবীন ভারতের আর একটি আলোক-শিখা নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করিল। তিনিই জগদীশচন্দ্র বসু।

প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু।

চল্লিশ বৎসর বয়সেই স্বনামধন্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া এই বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার কথা নিবেদিতা শুনিলেন। তাহার পর ১৯০০ সালের প্যারিস প্রদর্শনীতে গুরু নিজে শিষ্যাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। সেইখানে, বিশ্বের সেই বিদগ্ধ সমাজে, তাঁহার গুরুর মতন তরুণ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রও সেদিন ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন—ইহা নিবেদিতা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেদিন এই দুই যুগন্ধর পুরুষ প্যারিসের সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেইদিনের স্মৃতি নিবেদিতার মনে জাগ্রত ছিল।

স্বচক্ষে এই বৈজ্ঞানিকের কীর্তি দেখিয়া পুলকিত চিত্তে সেই প্যারিস হইতে তাঁহার গুরু যাহা লিখিয়াছিলেন নিবেদিতার তাহাও মনে ছিল। "আজ ২৩শে অক্টোবর। এ বৎসর প্যারিসে মহাপ্রদর্শনী, নানাদিগ্‌দেশ সমাগত সজ্জন সমাগম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। সে বহু গৌরবপূর্ণ প্রতিভমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের জন্মভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, ডাঃ জে. সি. বোস। এক যুবা বাঙালি

বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্ত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ করিলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী—বঙ্গবাসী!"

কলিকাতায় আসিয়া এই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া নিবেদিতা দেখিলেন, এত খ্যাতিমান, তবু খ্যাতিতে ইহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সত্যান্বেষী ও স্বল্পভাষী এই মানুষটিকে দেখিয়া নিবেদিতার মনে হইত তিনি যেন বিরুদ্ধ সমাজের প্রতিকূলতার সহিত একাকী সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন।

৯২।৩ আপার সার্কুলার রোড। জগদীশচন্দ্রের বাড়ি। ৯১ নম্বরে থাকেন প্রফুল্লচন্দ্র। তিনি প্রতিবেশী। জোড়াসাঁকোর পরেই কলিকাতায় তখন ইহাই ছিল নিবেদিতার আকর্ষণের অন্যতম স্থান। ইহার দক্ষিণ সীমায় কেশবচন্দ্রের কমল-কুটির, পশ্চিম সীমায় বিদ্যাসাগরের বাড়ি, উত্তর সীমায় রামমোহনের বাগান বাড়ি। এই সীমানাকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা, সমাজ-বিজ্ঞান, কারুশিল্পের নানা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ও ভারতের নবজাগরণের পুরোধাবর্গের কত ভাবনা, কামনা মূর্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্রের আকর্ষণে আসিতেন শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলরতন সরকার, রবীন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত ও নিবেদিতা। স্বদেশী শিল্প ও চিত্রকলার প্রতি জগদীশচন্দ্রের অনুরাগের ইতিহাসের সহিত নিবেদিতার বন্ধুত্বের ইতিহাস নানাভাবে জড়িত। নিবেদিতার ভারতানুরাগ তাঁহাকে জগদীশচন্দ্রের পরম শ্রদ্ধার পাত্রী করিয়া তুলিয়াছিল। আর তাঁহার প্রতি নিবেদিতার নিস্পৃহ ভালবাসা, অনাবিল স্নেহ, জগদীশচন্দ্র জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। নিবেদিতার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা

জগদীশচন্দ্র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্মরণে রাখিয়াছিলেন। নিবেদিতা বৈজ্ঞানিককে ঠিক সহোদর তুল্য স্নেহ করিতেন।

প্রথম আলাপেই নিবেদিতা অদ্বৈত তত্ত্ব লইয়া প্রশ্ন তুলিলেন। প্রশ্নটি তুলিয়াই বুঝিলেন, বৈজ্ঞানিক হইলেও মানুষটি তপস্বী। এই প্রসঙ্গে তিনি পুলকিত হইলেন। হাসিয়া বলিলেন—"অদ্বৈত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিজ্ঞানের প্রমাণ চান?"

"ঠিক তাই।"

"জ্ঞান আর বিজ্ঞানের অনুভব যে এক জিনিস ইহা আপনি বিশ্বাস করেন?"

"উপনিষদে ইহার সমর্থন আছে।"

এমন করিয়াই বন্ধুত্বের সূত্রপাত—সেই বন্ধুত্ব নিবেদিতার শেষ জীবন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। সেইদিন হইতে পরস্পর নিয়মিতভাবে অনুভবের বিনিময় করিতেন।

এই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে জগদীশচন্দ্র বসুকে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার অপরাধ তিনি ভারতীয়। যোগ্যতার তুলনায় বেতনের হার অত্যন্ত কম। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে একটি নিজস্ব ল্যাবোরেটরীও দিতে অসম্মত। তাঁহার মতই আর একজন জ্ঞান-তপস্বীকে এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তিনিও নিবেদিতার অনুরাগী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু সহকর্মীদের মুখ চাপিয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র ঠিক করিলেন, তিনি একলাই এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবেন। কম বেতন লইতে তিনি অস্বীকার করিবেন। তিন বৎসর ধরিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত জগদীশচন্দ্রের বিবাদ চলিল। একটি নূতন বিষয় লইয়া তিনি গবেষণা করিতেছিলেন, তাহা লইয়া পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়িয়া

গেল। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া সম্মানিত করিল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ভারত-সরকার তাঁহাকে তাঁহার যোগ্য মর্যাদা দিতে বাধ্য হইলেন।

সেই সঙ্কটের দিনে যখন তিনি একাকী সংগ্রাম করিতেছিলেন, তখন একমাত্র নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহাকে নিরুৎসাহে ভাঙিয়া পড়িতে দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরিবারে ও নিজের পরিবেশের মধ্যে তিনি একা। একা বলিয়াই নিরুৎসাহ বোধ করিতেন। নিবেদিতা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সত্যান্বেষীর মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন তিনি। তিনটি বেড়াজালে বন্দী বৈজ্ঞানিক। মহৎ হৃদয়কে উদ্দীপিত করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বৈজ্ঞানিকের জীবনের সেই সঙ্কটকালে নিবেদিতা যে তাঁহাকে কত ভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়। কারণ জগদীশচন্দ্রের শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ভারতবাসীও যে য়ুরোপীয়ানদের মত বিজ্ঞান-চর্চায় অমিত সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহা তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিতে চাহিলেন। নিবেদিতার ১৭নং বোস পাড়া লেনের বাড়িতে জগদীশচন্দ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। নিবেদিতার সাহায্য না পাইলে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইত কিনা সন্দেহ! তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির পাণ্ডুলিপি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে অপরিসীম সাহায্য করিয়াছেন। আচার্য বসুর "উদ্ভিদের সাড়া" (Plant Response) বইখানিতে নিবেদিতার সহযোগিতার স্বাক্ষর আছে। সেদিন এই মহামূল্য একটি জীবন ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার স্নেহের অঞ্চলের মধ্যে বাঁধিয়া তাঁহাকে কি ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন ভাবিলে নয়ন অশ্রুসিক্ত

হইয়া উঠে। তাই পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আমি নিবেদিতার অঞ্চলে আশ্রয় লইতাম।"

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে যাহাতে আলোচনা হয়, নিবেদিতা অগ্রণী হইয়া সেই চেষ্টা করিয়া দিলেন। আলোচনা বাহির হইতেই জগদীশচন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। নানা স্থান হইতে অভিনন্দনপত্র পাইয়া তাঁহার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। এই সকলের পিছনে নিবেদিতা ছিলেন। জগদীশচন্দ্র ও নিবেদিতার জীবনব্যাপী সৌহার্দ্য বড় সুন্দর। দুইজনেই একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁহার যাঁহার নিজের আদর্শে অচল অটল ছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীর উপেক্ষা ও অনাদরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নিবেদিতা শুধু জগদীশচন্দ্রের কার্য সহজ করিয়া দেন নাই, বিশ্বের সমক্ষে আনিয়া তাঁহার প্রতিভাকে তিনি লোকখ্যাত করিয়াছিলেন। এই কথা যখনি মনে হইত, ভগিনী নিবেদিতার প্রতি জগদীশচন্দ্রের অন্তর শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্যই ভগবান জগদীশচন্দ্রকে পাঠাইয়াছেন—প্রথম দর্শনেই নিবেদিতার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

একদিন।

নিজের বাড়ির ল্যাবরেটরীতে বসিয়া জগদীশচন্দ্র কাজ করিতেছেন নিবিষ্টচিত্তে। সাধারণ একখানি ঘর। চেয়ার ও টুলের উপর যন্ত্রপাতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, মেঝেতে টেষ্ট টিউব আর রাশি রাশি কাগজ। কাগজে গ্রাফ আঁকা। তন্ময় হইয়া গবেষণা করিতেছেন বৈজ্ঞানিক। পৃথিবী আছে কি না, হুঁস নাই। নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে

তিনি বিভোর। এমন সময়ে আর্যা নিবেদিতা আসিলেন। নিবেদিতাকে পাইয়া বৈজ্ঞানিক বলিলেন—"জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে, আমি দেখিয়াছি। কোনো ভুল নাই, জড়ও চৈতন্যময়। প্রায় সর্বত্র—এমন কি ধাতুও প্রাণবন্ত। একদিন তাহার নাগাল পাইবই। প্রথম গাছপালায়, তারপর পাথরে যে প্রাণ আছে তাহা প্রমাণ করিবই। আছে, আমি জানি।"

এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা শুনিয়া নিবেদিতা অবাক্। নিরুদ্ধ বিস্ময়ে তিনি সাগ্রহে অণুবীক্ষণের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কি বুঝিলেন, কি না বুঝিলেন, কিছু বলিলেন না। বৈজ্ঞানিককে শুধু বলিলেন—

"আমায় যাহা বলিতেছেন, আপনার লিখিয়া ফেলা উচিত।"

"সে-কল্পনাকে রূপ দিব কেমন করিয়া?"

"আমি তো আছি।"

নিবেদিতা যে সত্যই বিবেকানন্দকে ভালবাসিতেন তাহা তিনি এইভাবে আর একবার প্রমাণ করিলেন। জগদীশচন্দ্র যেমন, তাঁহার পত্নী অবলা বসুও তেমনি নিবেদিতার অনুরাগিনী ছিলেন। এই বসুদম্পতী তাঁহার জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া ছিলেন।

শুধু কলিকাতায় নয়, দার্জিলিঙ-এ জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে আসিয়াও নিবেদিতা তাঁহাকে তাঁহার গবেষণাকার্যে সহায়তা করিতেন। এই নিভৃত বাড়িটি তাঁহার প্রিয় স্থান ছিল। হিমালয়ের শান্ত সৌম্যমূর্তি এই বৈজ্ঞানিক ঋষির হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করিত। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের অনুভূতি লাভই ছিল তাঁহার জীবনের অক্লান্ত সাধনা। সেই সাধনাকে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন নিবেদিতা। তাঁহার মৃত্যুর ছয় বৎসর পরে ১৯১৭ সালের ১০ই নভেম্বর যখন বসু-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন উদ্বোধনী বক্তৃতায় আচার্য জগদীশচন্দ্র

সর্বাগ্রে নিবেদিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনে এই মহীয়সী নারীর প্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমি আজ সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি। এই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যে কত উৎসাহ ছিল, তাহা একমাত্র আমিই জানি।"

বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের শীর্ষভাগে নিবেদিতারই আবিষ্কৃত ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন সাদরে রক্ষিত হইয়াছে এবং মন্দিরের দ্বার-পথে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সযত্নে স্থাপিত প্রদীপ হস্তে এক নারীর মূর্তি আজো নীরবে নিবেদিতার প্রতি জগদীশচন্দ্রের গভীর অনুরাগ নীরবে বহন করিতেছে। জগদীশচন্দ্রের কৃতজ্ঞতা এইখানেই শেষ হয় নাই। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে নিবেদিতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি ব্লক নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং উহার পরিচালনার জন্য নিজে এক লক্ষ টাকা দিয়া 'নিবেদিতা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া গিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের দার্জিলিঙ-এর ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিবেদিতা ইহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের কল্যাণেই তিনি ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই শৈল-ভবন 'মায়াবতী'র দেবদারু বৃক্ষের মৃদু মর্মরে আজো কি নিবেদিতার এই অম্লান ভারত-প্রীতি রণিত হইতেছে না?

নিবেদিতার আর একটি কর্মক্ষেত্র ছিল ডন্ সোসাইটি। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত এই ডন্ সোসাইটি ছিল স্বদেশী-সেবার পাঠশালা। এই পাঠশালা সেদিন সহজেই নিবেদিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৯৭ সালে 'ডন্' পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে ১৯০২ সালে 'ডন্ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ভগিনী

নিবেদিতা সোসাইটিতে যোগদান করেন। 'ডন্'-এর নেপথ্য প্রেরণা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় ভারতীয় দর্শন ও সভ্যতার সার্বভৌম বাণী প্রচার করেন, তাহার চারি বৎসর পরেই সতীশচন্দ্র 'ডন্' পত্রিকার সূচনা করেন। অতলান্তিকের পরপারে সন্ন্যাসীর কণ্ঠে অদ্বৈত বেদান্তের যে সিংহনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিল ভারত-মহাসাগরের বুকে এবং তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিল নীরব সাধক ও আদর্শ লোক-শিক্ষক সতীশচন্দ্রের 'ডন্' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে এই পত্রিকার দান অসামান্য। প্রায় পনর বৎসর কাল ধরিয়া এই পত্রিকা দার্শনিক প্রবন্ধ ভিন্ন, শিক্ষা, কুটির-শিল্প, লোকাচার, পল্লীজীবন প্রভৃতি সংগঠনমূলক নানা বিষয়ে সেদিন যে নূতন চিন্তার আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসেও বিরল। এই দিক দিয়া বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া,' ও অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্', 'কর্মযোগিন্' ও 'আর্য' পত্রিকা ভিন্ন সমসাময়িক আর কোন পত্রিকার সহিত 'ডন্'-এর তুলনা চলে না। 'ডন্'-এর আদর্শ ছিল 'একরূপেন ব্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ'—শঙ্করের এই প্রসিদ্ধ বাণী। বিজয়কৃষ্ণের শক্তি সতীশচন্দ্রের ভিতর দিয়া লোকশিক্ষার ও জাতিগঠনের ক্ষেত্রে সেদিন এই 'ডন্' পত্রিকা মারফৎ কি ভাবে কার্যকরী হইয়াছিল, সে ইতিহাস জানিবার মতন। কথিত আছে, 'ডন্'-এর প্রথম সংখ্যা বাহির হইলে পরে, সতীশচন্দ্র উহার একখানি লইয়া গিয়া স্বীয় গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করেন। তিনি উহা মস্তকে ধারণ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। বাংলা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মৌলিক চিন্তা ও প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিয়া 'ডন্'-এ সেদিন যে-সব রচনা প্রকাশিত হইত তাহার মূল্য আজিও হ্রাস

পায় নাই। 'ডন্'-এর লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেনঃ ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, আকবর হায়দারী, স্বামী অভেদানন্দ, কুমারস্বামী, সরলা দেবী, নিবেদিতা, মহেন্দ্রলাল সরকার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, বিধুশেখর শাস্ত্রী, এস, রামস্বামী আয়ার, এ. গোবিন্দ চার্লু, রামতীর্থ স্বামী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, এম. এম. ভবনাগ্রী, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, কালীনাথ রায় প্রভৃতি। ইহারা ভিন্ন, সিলভ্যাঁ লেভি, ই. বি. হ্যাভেল, এ্যানি বেশান্ত, ওকাকুরা, জে. বি. কীথ্ প্রভৃতি একাধিক বিদেশী মনীষীরাও 'ডন্'-এ লিখিতেন। ভারতবর্ষে ইহাই ছিল সে দিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উচ্চতম চিন্তার একমাত্র মুখপত্র।

আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন নব্য বাংলার প্রাণবান সদ্গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অন্যতম শিষ্য। সেই সূত্রে তিনি বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা প্রমুখ গোস্বামী মহাশয়ের বিশিষ্ট চিন্তাশীল শিষ্যগণের সহিত আত্মিক-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের নির্দেশে এবং তাঁহার জাতিগঠনের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে সতীশচন্দ্র প্রথমে ডন্ পত্রিকা এবং পরে ১৯০২ সালে ডন্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিন সভাপতি ছিলেন বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবেদিতার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের সূচনা এই সোসাইটি স্থাপনের পর হইতেই এবং প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তিনি এই সোসাইটিতে যোগদান করেন। এই সোসাইটির প্রচারিত আদর্শের ভিতর দিয়া সেদিন সতীশচন্দ্র আত্মদানে উন্মুখ বাঙালি তরুণের মনে

তপস্যার অগ্নি জ্বালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ডন্ সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতেন সতীশচন্দ্র, নীলকণ্ঠ গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, যদুনাথ সরকার, দীনেশচন্দ্র সেন, স্বামী সারদানন্দ ও নিবেদিতা। সোসাইটিতে নিবেদিতা তিন বৎসর কাল ধরিয়া অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া বাঙালি যুবক সেদিন দলে দলে স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করে। এই সোসাইটির বক্তৃতামঞ্চ হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে নিবেদিতা সেদিন বাংলার যুবকগণের চিত্তে আত্মমর্যাদার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তাহাদের জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেদিন যেন কন্যার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়াই বিবেকানন্দ বাংলার তারুণ্যকে স্বদেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

একদিন।

স্বামী সারদানন্দ ভগবদ্গীতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেছেন।

নিবেদিতাও উপস্থিত আছেন। ছেলেরা অনুরোধ করিল—"গীতা সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন" নিবেদিতা হাসিয়া বলিলেন—"আমি নিজে গীতার কাছ হইতে কি পেয়েছি, শুনবে? গীতার মধ্যে আমি দেখ্‌তে পাই এক অফুরন্ত শক্তির উৎস। এক হাতে গীতা আর অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে আদর্শকে জয়যুক্ত করতে যথার্থ ক্ষত্রিয় বীর কবে মাথা তুলবে?…এই সেদিন এক মহাবীর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। স্বামীজির পদাঙ্ক আমরা অনায়াসে অনুসরণ করতে পারি।"

এইভাবেই সেদিন বাঙালি যুবকের মনে একটা দিব্যোন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন নিবেদিতা ডন্ সোসাইটির আসর হইতে। তিনি যখন

আবেগভরে বলিতেন—"আসল ভারতবর্ষকে যদি চিন্‌তে চাও আকবর ও অশোকের মত স্বপ্ন দেখ। বই পড়ে দেশপ্রেম শেখা যায় না। এ-প্রেম সমগ্র সত্তাকে আবিষ্ট করে রাখে। দেহের অস্থি-মজ্জায় এ-ভালবাসা থাকা চাই,—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তার অনুভব পাওয়া চাই"; কিংবা তিনি যখন বলিতেন, "তোমাদের ব্রহ্মচর্য হবে ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য। এমন মানুষ চাই যাহা রূঢ় বাস্তবের মাঝে তাল ঠুকে দাঁড়িয়ে, আত্মবিসর্জনের মধ্যেই রুদ্রের দক্ষিণ মুখকে দেখতে পায়। তোমাদের আরাধ্যাদেবী ভারতমাতা", তখন বাংলার স্তিমিত তারুণ্যে যে-প্রাণের সাড়া জাগিত তাহা ভাষায় বলিয়া বুঝাইবার নহে, প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার জিনিস। নিবেদিতার এক চরিতকার বলিয়াছেন—"ডন্ সোসাইটি যেন একটি শতদল পদ্ম আর ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যাদায়িনীরূপে ঐ পদ্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। পাঁপড়িগুলি তাঁহার দুই চরণ বেড়িয়া পড়িয়া আছে।" শিল্পীর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিবার মত এই মন্তব্যের মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। এই ভাবে ডন্ পত্রিকায় লিখিয়া এবং ডন্ সোসাইটিতে বক্তৃতা করিয়া নিবেদিতা তাঁহার গুরুর স্বদেশমন্ত্রের অগ্নিবাণী বাংলা তথা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এমন একটি ক্ষিপ্র কার্যকুশলা শিষ্যা যদি তিনি না রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বিবেকানন্দ আজ বাঙালী তথা ভারতবাসীর চিত্তে এমন স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এই দিক দিয়া ভগিনী নিবেদিতার কার্যাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

এই ডন্ সোসাইটির বৈঠকেই নিবেদিতা আরো একজনের সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। গুরুর মুখে নিবেদিতা শুনিয়াছিলেন যে, উপাধ্যায় যখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তখন তাঁহারা একত্রে আখড়ায় লাঠি ও কুস্তী খেলিতেন।

দুরন্ত, দামাল ভবানীচরণ জীবনের প্রথম হইতেই স্বদেশপ্রেমে ভরপুর ছিলেন। বহুভঙ্গিম চরিত্রের এই মানুষটির প্রতি নিবেদিতা তাই সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। "বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে উপাধ্যায়ের মত এরূপ তেজঃপূর্ণ অদ্ভুত জীবন বাংলা দেশে দুইটি দেখা যায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মাটিতে যে কয়জন দেশহিত-ব্রতী লোকনায়কের আবির্ভাবের ফলে পরবর্তী যুগে দেশের জনগণের মনে একটা অদম্য বিপ্লব-প্রচেষ্টার সাহস উদ্দীপিত হইয়াছিল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাদেরই মধ্যে একজন এবং অনেক বিষয়ে অসাধারণ একজন।" যাঁহাদের লেখনী ও কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া সেদিন বঙ্গজননী দেশের জনসাধারণকে জাগরণের যজ্ঞশালায় আহ্বান করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উপাধ্যায়ের একটি গৌরবময় স্থান ছিল। ভারতের শিক্ষিত জন-সাধারণের রাষ্ট্রচেতনার প্রথম গুরু যদি সুরেন্দ্রনাথ হন, তাহা হইলে বাংলার অতি সাধারণ এবং অশিক্ষিত জনগণের অর্থাৎ মুটে, মজুর, মুদীর রাষ্ট্রচেতনার প্রথম গুরু ছিলেন এই ক্যাথলিক সন্ন্যাসী উপাধ্যায়। এই দিক দিয়া ভারতের রাজনীতিতে টিলকের পরেই উপাধ্যায়। তাঁহার 'সন্ধ্যা' তাই বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মবান্ধব ও তাঁহার 'সন্ধ্যা' এক এবং অভিন্ন। সেদিন স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে এই সন্ধ্যা জাতীয়তার ভাবধারা এমন সুললিত ও সহজবোধ্য বাংলায় প্রকাশ করিয়াছিল যে, বাংলার প্রত্যেক ঘরে, সুদূর পল্লীগ্রামের কুটিরে কুটিরে তখন 'সন্ধ্যা' সমাদৃত হইয়াছিল। সন্ধ্যার আসরে ঐকতান বাজিত। শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতির বলিষ্ঠ চিন্তা ও লেখনী এই ঐকতান সৃষ্টি করিয়াছিল। সন্ধ্যার ভেরী নিনাদে বাঙালি চমকিয়া উঠিল। বাংলাভাষায় আর কোনো পত্রিকা রাজশক্তিকে এমন ভাবে আঘাত

করিতে পারে নাই, যেমন করিতে পারিয়াছিল এই 'সন্ধ্যা'। "যাহা শুন, যাহা শিখ, যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙালি থাকিও।" ইহাই উপাধ্যায়ের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

"স্বদেশীর প্রজ্বলিত অবস্থায় উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' যাহা করিল, সমাজের নিম্নস্তরে যে আগুন জ্বালাইয়া দিল তাহা ডন্ সোসাইটি বা ডন্ পত্রিকা পারে নাই। বিবেকানন্দের জ্বলন্ত চিতা হইতে যে দুইটি অগ্নিশিখা বহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহার একটি ভগিনী নিবেদিতা, আর একটি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। এই দুইটি যমজ অগ্নি-শিখাকে কখনো পৃথক করিয়া কখনো বা একত্র করিয়া দেখিলে বাংলার স্বদেশীযুগকে পুরাপুরি দেখা যাইবে।" স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যেই ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ, উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র ও নিবেদিতা সকলেই সেদিন সমস্বরে রব তুলিয়াছিলেন—"যাহা শুন, যাহা শিখ, যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙালি থাকিও।" এই হিন্দুর ভিত্তিভূমি উপনিষদের ধর্মের উদার সার্বভৌম উপলব্ধি, অন্য কিছু নহে। বিবেকানন্দ তাহার অনেক আগেই জাতিকে এই কথা শুনাইয়া বেদান্তের বিশ্বমানবতাবোধে তাহাকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। দেখিতেছি, অর্ধশতাব্দী পরে সেই আহ্বান আজো তাহার মূল্য হারায় নাই।

॥ তেরো ॥

জুলাই মাসে স্বামীজির মৃত্যুর পর নিবেদিতা প্রথমেই বিবেকানন্দ-প্রচারে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার জীবনের 'মিশন' ছিল বিবেকানন্দ, অন্য কিছু নয়। তাঁহার গুরু বিশ্ববিজয়ী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, কিংবা তিনি রামকৃষ্ণের ভক্ত, এই ভাবে গতানুগতিক গুরুর মহিমা প্রচারের কথা নিবেদিতার আদৌ মনে হয় নাই। তাহা মনে হইতেও পারে না। নিবেদিতা বিবেকানন্দকে চিনিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন সত্য করিয়া। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভিতরে যে বিপ্লবী বিবেকানন্দ ছিল তাহারই সাম্যঘন আগ্নেয়রূপ তিনি বাঙালির নিকট, ভারতবাসীর নিকট এইবার তুলিয়া ধরিতে চাহিলেন। সেই বিপ্লবী বিবেকানন্দ স্বদেশীযুগের উষার আহ্বান মাত্র করিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহার স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত ভাবধারা ভারতবাসীর নিকট, বিশেষ করিয়া বাঙালির নিকট প্রচারিত হওয়া দরকার। গুরু কি সেই জন্যই তাঁহাকে রাখিয়া যান নাই? তাই বিবেকানন্দের মৃত্যুর অল্প দিনের মধ্যেই প্রথমে যশোরে এবং তারপর কলিকাতার এক জনসভায় নিবেদিতা স্বামীজি সম্পর্কে একটি ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি বিবেকানন্দকে একেবারে মিশনের গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া বলিলেন—"স্বামীজিই আমার ধর্ম, আমার দেশহিতৈষণা সব……"স্বামীজি আমাদের মহান্ জাতীয় নেতা।" ভারতবাসীর সহিত একাত্ম হইয়াই তিনি এই ঘোষণা করিলেন।

স্বামীজির ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যেই নিবেদিতা প্রথমে কলিকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিবেকানন্দকে ঠিকমত বুঝিবার এবং বুঝাইবার আগ্রহেই তাঁহার এই প্রচেষ্টা। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ ও সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে বিবেকানন্দের মনে যে বলিষ্ঠ জাতীয়তা-বোধের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে এবং তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য এই সমিতির সভ্যদের প্রথম কর্তব্য হইবে ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা। এই ভাবে ভারতের প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণ করিবার পর স্বামীজির গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীন যুগের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পড়িয়া মনের মধ্যে একটা ইতিহাসবোধ জাগ্রত করিতে হইবে। তারপর বর্তমান যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা মানুষ বিবেকানন্দকে পরিপূর্ণরূপে দেখিতে পাইব।" সমাজতন্ত্রবাদী নিবেদিতা সেদিন এইভাবে তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদী গুরুর জীবনাদর্শকে ব্যাখ্যা করিয়া দেশের তরুণদের মনে যেভাবে বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, মনে হয় তাহার প্রয়োজন আজো শেষ হয় নাই।

গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিয়া নিবেদিতা গুরুপূজা করিয়া সময় কাটান নাই। এমন কি বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর "তিনি শুধু বায়ু পরিবর্তনের জন্য ভারত ভ্রমণে বাহির হন নাই। এক দিব্য প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঝড়ের মত বেগে তিনি এই বিস্তীর্ণ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া গেলেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে অনেক দেশ-বিখ্যাত নেতাদের সহিত পরিচিত হইলেন। অনেক সভাসমিতিতে

উত্তেজনাপূর্ণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। পরাধীনতার জ্বালা বুঝাইয়া দিলেন; স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বেদান্তের মোক্ষ প্রচার করিলেন না, সংসার মায়া ও মিথ্যা এ কথাও বলিলেন না। তুরীয়ানন্দ লাভ তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল না।"

এইভাবেই তিনি বিবেকানন্দকে জাতির নিকট জীবন্ত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এ কাজ তিনি ভিন্ন আর কেহই করিতে পারিত না। জাতীয়তার যে অগ্নিমন্ত্রে বিবেকানন্দ কন্যাকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহা সমস্ত অন্তর দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ নাই, কিন্তু তাঁহার আদর্শ রহিয়াছে। সেই আদর্শকে তাঁহার স্বদেশবাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া তুলিবার মধ্যেই নিবেদিতা যেন তাঁহার জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলেন। গুরুর জাতীয়তার সেই আদর্শকেই ভাষা দিয়া, রূপ দিয়া তিনি দেশে-দেশান্তরে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁহার গুরু ভারতের যে অখণ্ড ঐক্যকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, নিবেদিতা সেই ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের জাতীয়তাকে রূপ দিতে অগ্রসর হইলেন।

নিবেদিতার এই কার্যের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারত-প্রেমিক কাকুজা ওকাকুরাও সেই সময় সকলকে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া বেড়াইলেন—"যদিও বিবেকানন্দের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি তিনি তাঁহার মানসকন্যা নিবেদিতাকে রাখিয়া গিয়াছেন তোমাদিগকে পরিচালনা করিবার জন্য। তোমরা অবশ্যই তাঁহার কথা শুনিবে। তাঁহার চারিদিকে আসিয়া দলে দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে।" সেই সুরে সুর মিলাইয়া নিবেদিতাও এই ঘোষণা করিলেন—"আমার জীবনের ব্রত এই জাতিকে জাগ্রত করা।"

নিবেদিতার বিবেকানন্দ-প্রচারের পিছনে আরো একটি নিগূঢ় কারণ

ছিল। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে সারা ভারতের সংবাদপত্রে যেরকম স্বতঃস্ফূর্ত শোকের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল, নিবেদিতা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, যে-উদ্দীপনা, যে-উৎসাহ লইয়া স্বামীজি নিদ্রিত ভারতকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যেন তাঁহার মৃত্যুর পর স্তিমিত হইয়া আসিল। ভারতের প্রাণের কথা যাঁহার কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিত, যাঁহার জীবনদর্শন জীবনের নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে, সেই বীর্যবান স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসীর জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা যেন শূন্যে বিলীন হইতে চলিয়াছে। শোকে মুহ্যমান 'মিশন' তো বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বদেশপ্রেমকে স্বীকারই করিল না এবং সেই দিক দিয়া 'মিশন' তাঁহাকে প্রচার করিতেও অগ্রসর হইল না। রক্ষণশীল ভারতের বুকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে পারস্পরিক সহযোগিতা আনিবার জন্য, বিবেকানন্দ যে-আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভিন্নমুখী হইতে চলিয়াছে দেখিয়া নিবেদিতা বিচলিত হইলেন। তাহার উপর, বিবেকানন্দ সম্পর্কে দেশের মধ্যে তখনও নানা লোকের নানা মত। সমাজ এবং ধর্ম-সংস্কারকের উপর কেহ তাঁহাকে যেন স্থান দিতেই চাহে না। এমন কি, স্বামীজির সন্ন্যাসে অধিকার লইয়া তাঁহার জীবিতকালেই নানাদিক হইতে নানারকম প্রশ্ন উঠিয়াছিল। প্রশ্ন উঠিয়াছিল তাঁহার অমলধবল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র সম্পর্কেও। এই সব কুৎসিত আলোচনা ও লোকনিন্দার উত্তরে স্বামীজি শুধু বলিতেন—"হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুখে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নেহি, সব নিন্দ সংসার।" নিবেদিতা গভীরভাবে এই সব চিন্তা করিলেন। বুঝিলেন এখন প্রয়োজন বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর বিশ্লেষণ ও প্রচার। উজ্জ্বল স্বপ্ন চক্ষে লইয়া নিবেদিতা

তাই ভারতের জনসমাজের দ্বারে দ্বারে বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বমানবতাবোধের বাণী পৌঁছাইয়া দিতে চাহিলেন।

একদিন। গভীর রাত্রে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার জন্য বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শেষ করিলেন নিবেদিতা। প্রবন্ধের বিষয়, "জাতীয় জীবনে বিবেকানন্দ"। প্রবন্ধ শেষ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিবার সময় স্বামীজির ফটোখানি তাঁহার চক্ষে পড়িল। একদা এই ফটোখানি বিবেকানন্দ নিজে হাতে করিয়া দিবার সময়ে নিবেদিতাকে বলিয়াছিলেন: "ভারতের পুনরুত্থানকল্পে তোমার সেবা যেন সার্থক হয়।" গুরুর ছবিখানির দিকে তাকাইয়া এই কথাই আজ নিবেদিতার বিশেষ করিয়া মনে পড়িল। সেই সঙ্গে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, গুরুর জীবনব্রতের উত্তরাধিকারিণী তিনি, বিবেকানন্দের মানসকন্যা তিনি। তিনি থাকিতে বিবেকানন্দ বিস্মৃত হইবেন, কিংবা তাঁহার আদর্শ ঠিকমত প্রচারিত হইবে না, ইহা যে তাঁহার ধারণার বাহিরে।

অতঃপর নিবেদিতা নবীন উদ্যমে বিবেকানন্দ-প্রচারে অগ্রসর হইলেন। ১৯০২ সালের অক্টোবরেই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে চলিলেন স্বামীজির বিশ্বস্ত শিষ্য সদানন্দ। সদানন্দের নীরব পরিচর্যা নিবেদিতার দুঃখকষ্টের অনেকখানি লাঘব করিত। নিবেদিতার তত্ত্বাবধানের ভার স্বামীজি প্রথম হইতেই সদানন্দের উপর দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নিবেদিতার দেহরক্ষী। তাঁহার সহোদরতুল্য।

একে একে লাহোর, বোম্বাই, পুণা, গুজরাট, সুরাট, আমেদাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে প্রায় দুই মাস কাল নিবেদিতা ভ্রমণ করিলেন এবং অক্লান্তভাবে বক্তৃতা করিলেন। সর্বত্র বিষয় একই—বিবেকানন্দ আর বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম। সর্বত্রই বলিলেন: "স্বামীজির

মধ্যে একাধারে লোকোত্তর আধ্যাত্মিকতা আর বিপুল দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। এমন স্বদেশহিতৈষী পৃথিবীতে বড় একটা জন্মায় নাই। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি যখন স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই ক্ষণেই তিনি আসিলেন। নূতনকে তিনি যেমন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, আবার তেমনই তিনি ছিলেন পুরাতনের নৈষ্ঠিক পূজারী। ভারতের নিয়তি তাঁহারই ভিতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছে হিন্দুধর্মের একটি সার্বজনীন ভূমিকার সন্ধানে।···বীর্যের মন্ত্রই তিনি শুনাইয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন—দেশের আশা তাহার নিজের মধ্যেই ঃ তাঁহার স্বপ্নের ভারত ভাবীকালের গর্ভে। দুঃখবেদনার কষাঘাতে যে নবচেতনা আজ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এক দীর্ঘ বিবর্তনের ইহা শুধু প্রথম পর্ব। দেশের অতীত আদর্শ ও পরিবেশ হইতে নিজের মধ্যেই নিজের জীবনকে ভারত নূতন করিয়া আবিষ্কার করিবে—পরের অনুকরণ করিয়া নহে। একটি কথাই বলিবার ছিল স্বামীজির, বারংবার তিনি একটি বাণীই দিয়া গিয়াছেন, উত্তিষ্ঠিত! জাগ্রত! সংগ্রাম করিয়া চলো, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত থামিবে না।”

এই সময়েই নিবেদিতা বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ ও নাগপুরে বালগঙ্গাধর টিলকের সহিত পরিচিত হইলেন। নিবেদিতা জানিতেন মহারাষ্ট্র-কেশরী টিলক স্বামী বিবেকানন্দের একজন বিশেষ অনুরাগী। আর স্বামীজিও টিলকের নির্ভীক দেশপ্রেমের অনুরাগী ছিলেন। এই ভাবে দেশ-দেশান্তরে বিবেকানন্দের সংগ্রামী আদর্শ প্রচার করিয়া নিবেদিতা ভারতের জনসাধারণের হৃদয় জয় করিলেন। “সমাজের নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত কথা বলিলেন, বহু রঙ্গমঞ্চে ভাষণ

দিলেন। টিলক কাগজে-কাগজে সেসব ভাষণের বিবরণী পাঠাইতে লাগিলেন।” ছাত্রেরা আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—“আমরা কি করিব?” নিবেদিতা উত্তর দেন—“যে ভাবেই পারো, মুক্ত মন লইয়া ভারতবর্ষের সেবা কর।”

ইহার পর দক্ষিণ ভারত হইতে আহ্বান আসিল।

নিবেদিতা মাদ্রাজ চলিলেন।

পথে কয়েক দিনের জন্য ভুবনেশ্বরে থামিলেন।

শিবময় পুরী এই ভুবনেশ্বর। উদয়গিরির শিখরে উঠিয়া নিবেদিতার সে কী আনন্দ! সমগ্র একটি পাহাড় কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে মন্দিরের পর মন্দির, আর স্তম্ভগুলি এক-একটি প্রস্তরের তৈরী। নিবেদিতা সঙ্গীদের বলিলেন—“ইহাই তো ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ ইতিহাস।”

মাদ্রাজ।

নিবেদিতা গুরুর মুখে কতদিন শুনিয়াছেন দক্ষিণ ভারতের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসার কথা। বিবেকানন্দ বলিতেন—“এই মহাদেশের বুদ্ধির ক্ষেত্র উত্তর-ভারত, আর দাক্ষিণাত্য ইহার হৃদয়। যেন এক বিরাট পাষাণ-প্রতিমা দৃপ্ত মহিমায় রহস্যগভীর দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে পূর্বাপর তোয়নিধির দিকে।”

সেই দক্ষিণ-ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করিয়া নিবেদিতার মনে পড়িল, ভারতের মধ্যে বিবেকানন্দকে সর্বপ্রথমে স্বীকার করিয়া লইবার সৌভাগ্য এই মাদ্রাজেরই হইয়াছিল। সেই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি নিবেদিতাও লাভ করিলেন এখানে। এখানেও তিনি বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচার করিয়া বহু বক্তৃতা করিলেন এবং বিবেকানন্দ সোসাইটির পত্তন করিলেন। ভারতের নানা কেন্দ্রে এই রকম

সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা ছিল নিবেদিতার। দক্ষিণ-ভারতের মন্দির, মন্দিরের স্থাপত্য, এখানকার জীবনধারা, নর-নারীর ধর্মভাব, আচার-ব্যবহার—সব কিছুর মধ্যেই তিনি উদ্দীপনা খুঁজিয়া পাইলেন। মন্দিরে মন্দিরে চন্দন-তিলক-চর্চিত পূজারী ব্রাহ্মণের স্তোত্রপাঠ, বাতাসে ধূপধূনা, ঘৃত-প্রদীপ আর ফুলের সুঘ্রাণ, ব্রাহ্মণ বালকের শাস্ত্রপাঠ—এই সব দেখিয়া নিবেদিতা যারপর নাই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইলেন।

নাগপুর।

মহারাষ্ট্র-কেশরী বালগঙ্গাধর টিলকের দেশ। ছত্রপতি শিবাজীর দেশ। সেই নাগপুরে আসিলেন নিবেদিতা। নাগপুরে আসিয়া ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি কয়েকটি উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিলেন। এই সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রী জি. ভি. দেশমুখ তাঁহার জীবনস্মৃতি পুস্তকে একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা নাগপুরে আসিয়াছিলেন। তখন দশেরার সময়। মরিস কলেজের ছাত্ররা একটি পুরস্কার-বিতরণী সভার আয়োজন করিল। সেই সভায় সভানেত্রীত্ব করিলেন ভগিনী নিবেদিতা। সভা হইল পাধানের দিন—দশেরার ঠিক আগের দিন। এই দিনটিতে বিশেষ করিয়া অস্ত্রের পূজা হইয়া থাকে। একটি ক্রিকেট খেলায় বিজয়ী ছাত্রদের পুরস্কার দিবার আয়োজন হইয়াছিল এই সভায়; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নিবেদিতার বক্তৃতা শোনা। সিটি স্কুলের ড্রইং হলে এই সভার অনুষ্ঠান হইল সকাল বেলায়। আমি তখন মরিস কলেজের ছাত্র, তাই এই সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। নিবেদিতা পুরস্কার বিতরণ করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের জাতীয় ক্রীড়াকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশী খেলায় গর্ব বোধ করিবার জন্য তিনি মরিস কলেজের ছাত্রদের তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সেই

তেজস্বিনী নারী এমন কথাও বলিলেন যে, তিনি যদি আগে জানিতে পারিতেন তাহা হইলে এই অনুষ্ঠানে তিনি কখনই সভানেত্রীত্ব করিতে সম্মত হইতেন না। নিবেদিতা ঠিক এই কথা কয়টি বলিয়াছিলেন, 'আজ দশেরার পুণ্যতিথি—শস্ত্রপুজা করিবার দিন। আজ জগৎ-জননী শক্তি-রূপিণী মায়ের পুজা। শক্তি-সাধনার এই পীঠস্থানে দশেরা উপলক্ষে যে দেবীর অর্চনা হয় তিনি দেবী দুর্গা—তাঁহার দশ হাতে দশ প্রহরণ। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তোমরা দেবী দুর্গা ও তাঁহার তরবারীকে বিস্মৃত হইয়াছ—ভুলিয়া গিয়াছ তাঁহার শক্তির বাণী। ভোঁসলা রাজাদের স্মৃতি-বিজড়িত এই রাজধানীতে আসিয়া আজিকার দিনে আমি আশা করিয়াছিলাম মারাঠার বীরত্বের নিদর্শন কিছু দেখিব।' এইভাবে নিবেদিতা তাঁহার বক্তৃতার সুতীক্ষ্ণ কশাঘাতে কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের জর্জরিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চৈতন্য হইল। নিবেদিতার মনের ইচ্ছা অবগত হইয়া পরের দিন অর্থাৎ দশেরার দিন তাঁহারা বীরত্ব-ব্যঞ্জক অসি-ক্রীড়া, মল্লক্রীড়া প্রভৃতি প্রদর্শনের আয়োজন করিলেন।

"বক্তৃতা শেষে নিবেদিতা চলিয়া গেলেন। ছাত্র এবং অধ্যাপকমণ্ডলী তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া যারপর নাই মুগ্ধ হইলেন। মল্লক্রীড়া ও অসি-ক্রীড়ায় পারদর্শী এমন কয়েকটি ছাত্রদের খুঁজিয়া বাহির করা হইল। অধ্যাপক এম খুব উৎসাহের সঙ্গে পরবর্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। কেননা, নিবেদিতার তিরস্কার তাঁহার মর্মে বেশী করিয়া বিঁধিয়াছিল এবং নাগপুরের ছাত্রদের সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই তেজস্বিনী শিষ্যা অন্যরূপ ধারণা লইয়া ফিরিয়া যাইবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। আমার উপর বিশেষভাবে ভার পড়িল ক্রীড়াবিদ্‌দের একত্র করিবার জন্য এবং আমাকেও ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য অধ্যাপক এম বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। আমি লাঠি ও তরবারী খেলা উত্তমরূপে জানিতাম। পরের দিন মরিস কলেজের হোষ্টেলের প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তিন ঘণ্টা ধরিয়া বিবিধ খেলার ভিতর দিয়া নাগপুরের ছাত্রদের শক্তিচর্চার পরিচয় পাইয়া নিবেদিতা মুগ্ধ হইলেন। তখন তিনি আমাদের উদ্দেশে বলিলেন: 'আমাদের

দেশে ('আমাদের দেশ' বলিতে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষকেই বুঝিতেন) উচ্চ শিক্ষা অত্যন্ত দ্রুত হারে চলিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে খুব বেশী সংখ্যায় গ্র্যাজুয়েট বাহির হইতেছে। কিন্তু এইসব গ্র্যাজুয়েটদের দিকে তাকাইলে মনে হইবে ইহাদের শরীরে শক্তির লেশমাত্র নাই—ইহারা দুর্বল, ভীরু, ইহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ইহারা বিপদের সময়ে তাহাদের মা ও বোনদের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অসমর্থ। সমাজে এইসব দুর্বলদের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আজ দেশ চায় স্বাস্থ্যে উজ্জল পেশীবহুল শক্তিমান এবং স্বদেশপ্রেমিক তরুণ। বিদেশী সরকারের পদলেহী মানুষের আজ প্রয়োজন নাই। এই শক্তিমান সবলেরাই দেশকে তুলিয়া ধরিবে। একটি বিদেশী গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচার শাসনকে জীয়াইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সেই শাসনযন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে তোমাদের লজ্জা বোধ করা উচিত'।"

১৯০২ সাল। অক্টোবর মাস। স্থান—বরোদা।

নিবেদিতা উত্তর-ভারত ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বরোদায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

উদ্দেশ্য—অরবিন্দ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করা। বাংলায় থাকিতেই নিবেদিতা এই অদ্ভুত-চরিত্রের মানুষটির কথা নানামুখে শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া অবধি তাঁহার কৌতূহল হয়—স্বদেশপ্রেমে ভরপুর কেমন সেই মানুষ যিনি শৈশব হইতে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাল ইংলণ্ডে প্রতিভাদীপ্ত ছাত্র-জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও যিনি অন্তরে-বাহিরে, বেশভূষায়, কার্যে ও চিন্তায় খাঁটি ভারতীয়ই আছেন। এই অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাৎ তাঁহার জীবনে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, যেমন স্মরণীয় ঘটনা লণ্ডনে স্বামীজির সহিত তাঁহার সেই প্রথম সাক্ষাৎ। বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের ফলে মার্গারেট নিবেদিতা হইয়াছিলেন আর অরবিন্দের সহিত সাক্ষাতের ফলে নিবেদিতা বাংলার

আসন্ন বিপ্লবের যোগ্য নায়িকারূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। আদর্শবাদী বিপ্লবী অরবিন্দের সহিত বাস্তব-পন্থী বিপ্লবী নিবেদিতার এই সাক্ষাৎ যে ইতিহাসেরই অভিপ্রেত, পরবর্তী কালের ইতিহাসই তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

"অরবিন্দ ও নিবেদিতা এই দুই মহাবিপ্লবী যেদিন বরোদায় পরস্পর মিলিত হইলেন, বাংলার ইতিহাসে সেইদিনই এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল।" কিন্তু তাহার পূর্বে আমাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, নিবেদিতার সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় কোন্ পটভূমির উপর অরবিন্দ দাঁড়াইয়াছিলেন। "১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পর সমস্ত বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি বুঝিলেন, বাংলার শিয়রে যিনি জাগ্রত প্রহরীর মত ছিলেন এবং যাঁহার কার্য সবেমাত্র শুরু হইয়াছিল, সেই কর্মযোগী বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বাংলাকে পথ দেখাইবার আর কেহ নাই। বিবেকানন্দের ভাবধারা, তাঁহার বৈপ্লবিক আদর্শ, তাঁহার স্বদেশপ্রেম অরবিন্দের তরুণ চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সন্ন্যাসী হইয়াও এই মানুষটির সুগভীর দেশাত্মবোধ দেখিয়া অরবিন্দ বুঝিয়াছিলেন, জাতির সম্মুখে এই জীবন্ত আদর্শ যতদিন থাকিবে ততদিন বাংলার পক্ষে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক তিরোধান সুদূর প্রবাসে অরবিন্দকেও মুহ্যমান করিয়া দিল। বাংলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন।" বিবেকানন্দ যে অরবিন্দের প্রিয় আদর্শ ছিলেন তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে: "বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ—নর-কেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার প্রভাব আজো প্রবলভাবে কাজ করিতেছে।

সেই প্রভাব ভারতের আত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব : বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার দেশজননীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।"

নিবেদিতার কথাও অরবিন্দের কর্ণে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতের মাটিতে এই আইরিশ অগ্নিশিখাটির কার্যকলাপ তিনি বরোদায় বসিয়াই লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং লোকমুখে বিবেকানন্দের এই বিদুষী শিষ্যাটি সম্পর্কে যে-সব কথা শুনিয়াছেন তাহাতে অরবিন্দের মন নিবেদিতার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইল। অরবিন্দের বৈপ্লবিক মন নিবেদিতার বৈপ্লবিক মনকে নিঃশব্দে আকর্ষণ করিল। তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ঠিক সেই মুহূর্তে নিবেদিতার বৈপ্লবিক ভাবধারার সহিত মিলিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। বাংলার রাজনীতিতে সশস্ত্র বিপ্লব যখন অদূরে অপেক্ষা করিতেছে, ইতিহাসের ঠিক সেই শুভক্ষণেই অরবিন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাৎ হইল। "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় অরবিন্দের কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধেই চারিদিকে একটা সাড়া পরিয়া গিয়াছিল। যৌবনদৃপ্ত জ্বালাময়ী ও তীক্ষ্ণধার অপূর্ব চিন্তাসম্বলিত সেইসব প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই নিবেদিতা স্পষ্টই বুঝিলেন, বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় নাই, তিনি বরোদা রাজ-কলেজের এই শান্তশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত অধ্যাপকটির চিন্তার মধ্যে বাঁচিয়া আছেন। দূর হইতেই নিবেদিতা অরবিন্দের নীরব দেশপ্রেমের পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন, ইনিই ইতিহাসের সেই চিহ্নিত মানুষ যিনি বাঙালিকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিবেন। বাংলার বিপ্লবের ভাবী দীক্ষাগুরুর সহিত বাংলার বিপ্লবের ভাবী শিক্ষাগুরুর এই মিলন যে ইতিহাসেরই অভিপ্রেত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

নিবেদিতার সহিত অরবিন্দের এই সাক্ষাৎ আরো একটি কারণে

গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিতার এক চরিতকার তাই লিখিয়াছেন : "বরোদা গিয়া শ্রীঅরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময়েই নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' তাঁহাকে উপহার দেন। এবং এই 'রাজযোগ' পড়িয়াই অরবিন্দ সর্বপ্রথম যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিবেকানন্দের যোগ নিবেদিতার হাত দিয়া অরবিন্দে সংক্রামিত হয়।" বরোদায় আসিয়া অরবিন্দকে প্রথম দেখিয়াই নিবেদিতার মনে হইল—সেই একজনকে তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার গুরু বিবেকানন্দকে আর এই আরেকজনকে দেখিলেন; শান্ত-শিষ্ট, নির্বাক ও নিস্পৃহ এই অরবিন্দও যেন ঠিক সেই রকমই যোগী, তপস্বী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—ইঁহারও দৃষ্টি সেই রকম অন্তর্মুখী।

বরোদার শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বসিয়াই অরবিন্দ নিঃশব্দে দেশমাতৃকার বোধনের আয়োজনে নিমগ্ন ছিলেন। তখনকার অবস্থায় কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে? ইংরেজের পূর্ণ কবলে তখনকার ভারত, তাহার দর্পে দেশ প্রকম্পিত। বিদেশীকে তাড়াইবার শেষ চেষ্টা হইয়াছে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে; তাহার পরে দেশ মুহ্যমান। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাজনীতি জড়তা কিছু পরিমাণে দূর হইয়াছে, কিন্তু দেশের অতি সামান্য অংশের উপর উহার প্রভাব। দেশের প্রাণ তো জাগে নাই; কি করিয়া জাতিকে জাগান যায় ইহাই ছিল মৌন, শান্ত, তপস্বী অরবিন্দের ধ্যান-জ্ঞান। বরোদায় আসিবার অব্যবহিত কাল পরেই অরবিন্দ সাত মাস কাল ধরিয়া বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ইংরেজী-সাপ্তাহিক "ইন্দুপ্রকাশ"-এ সাতটি ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিলেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তাঁহারই কেম্ব্রিজের সহপাঠী ও বন্ধু—কে. জি. দেশপাণ্ডে। এইসব রাজনৈতিক প্রবন্ধে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন মূলক নীতির তীব্র সমালোচনার ভিতর দিয়া অরবিন্দের অপূর্ব দেশপ্রেম এবং

তরুণহৃদয়-নিহিত অন্তরাগ্নি ফুটিয়া উঠিত। মধ্যপন্থী কংগ্রেসী নেতারা সন্ত্রস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এই সমালোচনা সহ্য করিতে পারিলেন না। অরবিন্দের লেখা বন্ধ হইল। লেখা বন্ধ হইল, কিন্তু ভারতকে স্বাধীন করিবার কাজ বন্ধ হইল না।

ইহার কয়েক বৎসর পরেই অরবিন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মপ্রণালী নিরূপণ করিলেন এবং স্বয়ং এই কাজে ব্রতী হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, জাতীয় সংগ্রামকে ত্রিধারায় পরিচালিত করিতে হইবে। একদিকে গুপ্ত-সমিতি গঠন দ্বারা বিদ্রোহমূলক আদর্শ প্রচার করিতে হইবে এবং জাতিকে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। অপর দিকে প্রকাশ্য প্রচার দ্বারা জাতিকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। তৃতীয় পন্থা হইবে, প্রকাশ্যভাবে জনসঙ্ঘ গঠন করা, যাহা সাহসিকতার সহিত সরকারের বিরোধিতা করিবে, এবং বৈদেশিক শাসনের ভিত্তি শিথিল করিবে অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা। বলা বাহুল্য, ইংলণ্ডে থাকিবার সময়ে দুর্ধর্ষ ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র আইরিশ জাতির মুক্তিসংগ্রাম হইতে সেই কিশোর বয়সেই অরবিন্দ বিপ্লবের প্রেরণা লাভ করিয়া ভারতে ফিরিয়াছিলেন। আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক পার্ণেলের বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া লণ্ডনে থাকিবার সময়েই কিশোর অরবিন্দ একটি পার্নেল-প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন।

ভারতে ইংরেজ-বিদ্বেষ মহারাষ্ট্র দেশেই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। মারাঠা বিপ্লব আন্দোলনের নেতা ছিলেন চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়—দামোদর হরি চাপেকার ও রামকৃষ্ণ হরি চাপেকার। তাঁহাদের একটি সমিতি ছিল যেখানে যুবকদলকে গোপনে সামরিক কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইত। অরবিন্দ এই চাপেকার ভ্রাতৃযুগলের সম্পর্কে আসিয়া বিপ্লব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

বাংলা দেশে ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র ম্যাটসিনা ও গ্যারিবল্ডীর জীবন হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া এবং মুখ্যতঃ ওকাকুরার ভর্ৎসনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিবেদিতা এই দলে যোগদান করিয়াছেন। প্রবাসে অরবিন্দের বিপ্লবে দীক্ষা লাভ এবং বাংলা দেশে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা —এই দুইটি ঘটনা প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু বাংলার এই প্রাথমিক বৈপ্লবিক উদ্যমের কোনো সংবাদ তখনো পর্যন্ত অরবিন্দের নিকট পৌঁছায় নাই। নিবেদিতাই এই বার্তা বহন করিয়া বরোদায় অরবিন্দের নিকটে আসিলেন। নিবেদিতার সহিত সাক্ষাতের পূর্বে গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীদের যে একটি গুপ্তচক্র ছিল, অরবিন্দ সেই গুপ্তচক্রের সহিতও সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং ঐ গুপ্তচক্রের সভাপতি ঠাকুর সাহেবের অনুপস্থিতিতে অরবিন্দের উপর ইহার কার্য-পরিচালনার দায়িত্ব পড়িয়াছিল। ঠিক এই সময়েই (১৯০২ সালের প্রথম ভাগে) বরোদার গাইকোয়াড়ের দেহরক্ষী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অরবিন্দ বাংলাদেশে গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। এই যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের সহায়তায় বরোদার সৈন্য বিভাগে পদাতিকরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি নিজেও এই গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপনে কলিকাতা আসিয়াছেন, এবং মেদিনীপুরে গিয়া হেমচন্দ্র কাননগুকে এক হাতে গীতা ও এক হাতে তলোয়ার দিয়া গুপ্ত-সমিতির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন।

ষ্টেশনে যাঁহারা নিবেদেতাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অরবিন্দও ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ষ্টেশনেই নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই

অরবিন্দ ঘোষ। নিবেদিতার দুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া অরবিন্দকে দেখিতে লাগিল। স্বল্পভাষী, শান্ত ও কৃশতনু এবং অত্যন্ত সাদাসিধা পরিচ্ছদে সজ্জিত এই মানুষটি অরবিন্দ ঘোষ! ইনি যে প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরি—নিবেদিতার মন বলিল। ইনি তো সাধারণ মানুষ নহেন—যুগে যুগে যাঁহারা দূরপ্রসারী জ্যোতির্ময় বার্তা লইয়া আসেন—ইনি সেই রকম একটি জ্যোতিষ্ক। যেন স্বর্গের প্রদীপ। ইনিই কেম্ব্রিজে-পড়া অরবিন্দ ঘোষ। ভারত-আত্মার এক জীবন্ত বিগ্রহ নিবেদিতা দেখিয়াছিলেন তাঁহার গুরুর মধ্যে আজ আবার তাঁহারই বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ভারত-আত্মার আর একটি নবীন বিগ্রহ। পদ্মপলাশলোচন—কী যেন একটি অলৌকিক আলো আর আগুন, ঐ চক্ষু দুইটির মধ্যে। দৃষ্টি চলিয়া যায় দূরের পারে। নিবেদিতার মনে হইল—আগামী দিনের ভারতের এবং পৃথিবীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বহুদূর-প্রসারী আলোকরশ্মি এই মানুষটি। অরবিন্দ তাই নিবেদিতাকে প্রবলভাবেই আকর্ষণ করিলেন।

প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতা অরবিন্দকে প্রশ্ন করিলেন—“আপনি কি শক্তির উপাসক ?” অরবিন্দ ঈষৎ হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। তারপর উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল নিরালায়, অরবিন্দের আবাসে।

অরবিন্দ। আপনার দার্শনিক মতবাদ কি ?

নিবেদিতা। অদ্বৈত-বেদান্ত। আপনার ?

অরবিন্দ। আমি লীলায় বিশ্বাস করি। আমার নিকট এই জগৎ সত্য।

নিবেদিতা। দর্শনের আলোচনা এখন থাক। ক’লকাতা আপনাকে চায়। বাংলাই আপনার উপযুক্ত স্থান।

অরবিন্দ। না, আমি অন্তরালে থাকব। আমার কাজ মানুষ তৈরী করা।

নিবেদিতা। বিপ্লব জন্ম নিতে চলেছে। বাংলাদেশে এর সূচনা দেখে এসেছি। এখন দরকার নেতার। গুরুজীর নামে শপথ করছি, আমি আপনার পাশেই দাঁড়াব। আপনি যা চান, আমিও তাই চাই। গৈরিক বাস আমার ছদ্মবেশ।

অরবিন্দ। আমি কি সত্যিই আপনার ওপর নির্ভর করতে পারি ?

নিবেদিতা (প্রসারিত হস্তে)। নিশ্চয়ই। আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। শুধু নির্ভর কেন—আমাকে আপনার বন্ধু বলেই গ্রহণ করতে পারেন।

অরবিন্দ। বেশ, লক্ষ্য যখন আমাদের এক, তখন আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু হলাম। আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আজ থেকে ভারতবর্ষকে ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্ত করাই হবে আমাদের কাজ।

নিবেদিতা। হ্যাঁ—আর সেই কাজ আমরা করবো একত্রে—পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

নিবেদিতার সহিত আলাপ করিয়া অরবিন্দ বুঝিলেন, রামকৃষ্ণ যেমন বিবেকানন্দকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, বিবেকানন্দ তেমনি রাখিয়া গিয়াছেন নিবেদিতাকে, তাঁহার সার্থক ও সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে। তারপর অরবিন্দ ইতিপূর্বে বাংলা দেশে যাইয়া গুপ্ত-সমিতির প্রথম পর্বের যে উদ্বোধন করিয়াছেন, সে-কথা নিবেদিতাকে বলিলেন এবং কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিতা এই সমিতিতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন।

বাংলায় তখন এখানে-ওখানে ছোট-ছোট বিপ্লবীদল গজাইয়া উঠিয়াছে। একটির সহিত আর একটির যোগ নাই। ইহাদের

সংঘবদ্ধ করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য বাংলার বিপ্লবী নেতা প্রমথ মিত্রকে লইয়া অরবিন্দ পাঁচজন সদস্যের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাঁচজনের একজন ছিলেন নিবেদিতা। বরোদায় এই সাক্ষাতের পর হইতেই নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনে, বিবেকানন্দের পরেই, প্রধান স্থান গ্রহণ করিলেন অরবিন্দ এবং এই সাক্ষাতের তিন বৎসর পরেই বাংলা দেশে যে-বিপ্লব দেখা দিল, তাহাতে এই দুইজনেই একত্রে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া ইতিহাস সৃষ্ট করেন। বিপ্লবের দীক্ষাগুরু হইলেন অরবিন্দ এবং শিক্ষাগুরু নিবেদিতা। এইভাবেই অরবিন্দ-নিবেদিতা দুইজনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক আদর্শ সেদিন বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সে-কাহিনী যথাস্থানে বলিব।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বরোদা হইতে কলিকাতা ফিরিয়া নিবেদিতা দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে বাহির হইলেন। মাদ্রাজ তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা জানাইল। সে-অভ্যর্থনায় ছিল শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। বিস্ময়ের কারণ, অতি অল্প কালের মধ্যেই নিবেদিতার খ্যাতি ও প্রভাব সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গুরুর সেই সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে—"একদিন নিবেদিতার নামে সারা ভারত মুখর হইয়া উঠিবে।" নিবেদিতার নির্ভীকতা ও সাহসের জন্য অনেকেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং সকলে মিলিয়া ব্যগ্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মাদ্রাজ হইতে বড়দিনের সময়ে নিবেদিতা উড়িষ্যার খণ্ডগিরিতে আসিলেন। এইখানে আসিয়া তিনি স্বামীজির কয়েকটি সন্ন্যাসী-শিষ্যের সহিত রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভু যীশুখৃষ্ট কবর হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন—বাইবেলের এই গল্পটি নিবেদিতা এইখানে

সন্ন্যাসীদের নিকট পাঠ করিয়া বড়দিনের পুণ্য উৎসব যাপন করিলেন। খণ্ডগিরির পর্বতগুহা ও চারিদিকের ভয়াল অরণ্যানীর মধ্যে তাঁহারাও যেন কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ইহা কি স্বামী বিবেকানন্দেরই পদধ্বনি? নিবেদিতা অতিশয় বিহ্বলচিত্তে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন:

"সন্ধ্যাকাল। আমরা একখানা জ্বলন্ত মোটা কাঠের চারিধারে ঘাসের উপর বসিয়াছিলাম। আমাদের একপার্শ্বে গুহা ও ক্ষোদিত প্রস্তরবিশিষ্ট পর্বতগুলি উঠিয়াছে, আর চারিধারের সুপ্ত অরণ্যানী মারুত হিল্লোলে অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে···আমাদের সঙ্গে একখানি সেণ্ট লিউক প্রণীত ঈশা-জীবনী ছিল—তাহা হইতে দেবদূত-গণের আবির্ভাবের কাহিনী পাঠ করা হইল। গল্পটি পড়িতে পড়িতে আমরা মাতিয়া গেলাম। একটির পর একটি করিয়া ঘটনা পড়া হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে সেই অদ্ভুত জীবনের সমগ্র অংশই আলোচিত হইল, তৎপরে মৃত্যু এবং সর্বশেষ পুনরুত্থান। গল্পটি আমাদের কানে এমন শুনাইতে লাগিল, যাহা পূর্বে আর কখনো হয় নাই।···খৃষ্টের পুনরুত্থানের বর্ণনাটি আমাদের নিকট চিরকালের জন্য একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনারূপে স্থানলাভ করিল।···আমরাও কি ঐরূপ এক পুনরাগমনের কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হই নাই—যাহা পূর্বোক্ত ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে? আমাদের আচার্যদেব স্বয়ং যাহা স্পষ্ট ভাষায় এবং জানিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা সহসা আমাদের মনে পড়িল, এবং তাহার অর্থও তখনি বুঝিতে পারিলাম—'জীবনে আমি অনেকবার পরলোকগত আত্মা সকলকে পুনরায় এ-জগতে আসিতে দেখিয়াছি।'···সেই রাত্রে খণ্ডগিরির সেই সকল গুহা ও অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া খৃষ্টানদিগের এই

পুনরুত্থান-কাহিনা পড়িতে পড়িতে অনুভব করিলাম যে, আমাদের আচার্যদেবের সত্তা আমাদের নিকট চিরকাল জ্বলন্ত-জাগ্রতভাবে সর্বদা আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে।”

১৯০৩ সাল। জানুয়ারী মাস। স্থান—বেলুড় মঠ। সময়—অপরাহ্ণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে কথা হইতেছিল।

ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজি আপনাকে কি জন্য এদেশে আনিয়াছিলেন?

নিবেদিতা। কাজ করিবার জন্য।

ব্রহ্মানন্দ। কি কাজ?

নিবেদিতা। আমার কাজ সর্বতোভাবে ভারতের সেবা করা।

ব্রহ্মানন্দ। “হিন্দু” কাগজে আপনার মাদ্রাজ-বক্তৃতার রিপোর্ট পড়িয়া মনে হইল খুব গরম গরম বক্তৃতা দিয়াছেন।

নিবেদিতা। তাহাতে কি আপনারা ভয় পাইয়াছেন?

ব্রহ্মানন্দ। ভয় ব্যক্তিগতভাবে নয়, ভয় মঠের জন্য। এখনও আপনার নাম মঠের সহিত একটু জড়াইয়া রহিয়াছে।

নিবেদিতা। তাহা হইলে আমাকে কি করিতে বলেন?

ব্রহ্মানন্দ। হয় আপনি রাজনীতি ছাড়ুন, না হয় আমাদিগকে ছাড়ুন। এই দুইয়ের একটি আপনাকে বাছিয়া লইতে হইবে।

নিবেদিতা। কেন? গুরুজী তো এমন কথা আমাকে বলিয়া যান নাই।

ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু স্কুলের কাজই কি আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

নিবেদিতা। না।

ব্রহ্মানন্দ। আমাদের ভয় পাছে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে এই মঠের উপর।

নিবেদিতা। হেতু?

ব্রহ্মানন্দ। আপনার মাদ্রাজ-বক্তৃতা।

এইভাবে কিছুক্ষণ দুইজনের মধ্যে কথাবার্তা চলিবার পর, মুখে মৃদুতা ও হৃদয়ের দৃঢ়তা লইয়া নিবেদিতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন—"আমি রাজনীতি ছাড়িতে পারিব না। আমি উহার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছি। আমি বরং প্রাণত্যাগ করিব, তবু উহা ছাড়িব না।" এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন—"এই অল্প কয়টি কথার মধ্য দিয়া নিবেদিতা-চরিত্রের যে রূপ ফুটিল, কোন চিত্রকর বা কোন ভাস্কর ইহা অপেক্ষা অধিক দক্ষতার সহিত নিবেদিতা-চরিত্রকে অঙ্কিত করিতে পারিত না। নিবেদিতাকে দেখিলাম একখানি কোষমুক্ত তরবারী।"

ব্রহ্মানন্দ। তাহা হইলে আপনি এক কাজ করুন। একখানি খোলা চিঠি লিখিয়া কলিকাতার সব কাগজে ছাপাইয়া দিন এবং এই চিঠিতে আপনি বলিয়া দিন যে, আপনি স্বেচ্ছায় মঠ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

তাহাই হইল। পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় এই মর্মে সংবাদ বাহির হইল যে, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের সহিত ভগিনী নিবেদিতা স্বেচ্ছায় সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীগিরিজা-শঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁহার 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ' পুস্তকে লিখিয়াছেন: "স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খৃঃ হইতে ১৯০২ খৃঃ পর্যন্ত যে-নিবেদিতাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া ভারতের সেবাকার্যে প্রয়োগ করিবার জন্য তৈয়ারী করিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও মঠের অপরাপর সন্ন্যাসীগণ তাঁহাকে বিপজ্জনক ভাবিয়া পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার জীবিতকালে এইরূপ হইত কি-না সন্দেহ।" কিন্তু বেলুড় মঠের সহিত সংস্রব ছিন্ন হইলেও, নিবেদিতা রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ দুইজনের একজনকেও কখনো ত্যাগ করেন

নাই। দীক্ষার সময়ে গুরু যে পরিচয় তাঁহার ললাটে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা তো মুছিবার নহে। তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আশ্রিতা, একথা তিনি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত একান্ত শ্রদ্ধার সহিত ঘোষণা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি সর্বদাই আত্মপরিচয় দিতেন এই বলিয়া—"সিষ্টার নিবেদিতা অব রামকৃষ্ণ এ্যাণ্ড বিবেকানন্দ।" অর্থাৎ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা, রামকৃষ্ণ মিশনের নহে। তাঁহার এই নাম-স্বাক্ষরটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; সে-কথা পরে বলিব। এই ঘটনার পর নিবেদিতা স্কুলের জন্য সংগৃহীত টাকা-পয়সার হিসাব বুঝাইয়া দিয়া, মঠের সংশ্রব হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার ঈপ্সিত রাজনৈতিক কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব অবশ্য নিবেদিতার উপরই রহিল।

॥ চৌদ্দ ॥

১৯০৩ সাল। এপ্রিল মাস।

নূতন বাড়িতে স্কুল উঠিয়া আসিল।

তিন বৎসর পূর্বেই বাগবাজারে নিবেদিতা সঙ্ঘ-জননী আর গুরুর আশীর্বাদ লইয়া জ্ঞানের যে প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন, সেই প্রদীপের আলোকরশ্মি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া বিস্তার লাভ করিতেছে। উপকরণের বিরলতা লইয়া আরম্ভ হইলেও, বিদ্যালয়টি ক্রমশঃই জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল। জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা বসু তাঁহার অগ্রজের নির্দেশে নিবেদিতার স্কুলে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্কুলের ছাত্রীদের আসা-যাওয়ার জন্য জগদীশচন্দ্র নিজে একখানি ঘোড়ার গাড়ি কিনিয়া দিয়াছেন। মিসেস ওলিবুল ও রামকৃষ্ণপুরের নবগোপাল ঘোষও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্কুলের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। পূর্বাপেক্ষা ছাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরস্ত্রী ও বিধবাদিগের জন্য একটি গীতা-ক্লাস খোলা হইয়াছে। যোগীন-মা তাহাদের গীতা পড়াইবার ভার লইয়াছেন। সেলাইয়ের ক্লাসও আরম্ভ হইয়াছে। বাগবাজারের হিন্দু-সমাজ এখন তাঁহার এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যথেষ্ট সহযোগিতা করিতেছেন। ভগিনী ক্রিষ্টিন পূর্বের ন্যায় তাঁহার সহজ নিষ্ঠা ও তৎপরতা লইয়া বিদ্যালয়ের কাজে নিবেদিতাকে সহায়তা করিতেছেন। নূতন স্কুল-গৃহের প্রবেশ-পথে বাহিরের দেয়ালে আঁটা কাঠের একটি বোর্ড যখনই কোন পথচারীর দৃষ্টিতে

পড়িত, সে দেখিতে পাইত উহাতে লেখা আছে : "ভগিনী-নিবাস। নারী-সমিতি-পাঠশালা-গ্রন্থাগার।" ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিত যে, এই বাড়িতে মেয়েদের জন্য স্কুল আছে, সমিতি আছে এবং একটি গ্রন্থাগারও আছে।

মধ্যে মধ্যে স্কুলের চত্বরে কথকতা হইত। নিবেদিতা পাড়ার সকলকে তাহাতে আমন্ত্রণ করিতেন। বিকালবেলা বন্ধ গাড়িতে পুরস্ত্রীরা আসিতেন, উঠানের পাশে সবুজ রঙের চিকের আড়ালে তাঁহারা বসিতেন। সকলেই অবগুণ্ঠনবতী। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বসিত উঠানের মাঝখানে। শালুতে মোড়া আর পত্রপুষ্পে সজ্জিত ছোট্ট একটি মঞ্চ। তার উপর জ্বলিতেছে একটি পেট্রোল ল্যাম্পের আলো। কথকঠাকুর সেইখানে বসিয়া কথকতা করিতেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুরাণের গল্প বলিতেছেন সুমধুর স্বরে, অভিনয়ের ভঙ্গিতে। সকলেই তন্ময় হইয়া শুনিতেছে।

দীক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা এইভাবেই বাগবাজার পল্লীটি প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। গোঁড়া হিন্দুর বাড়ির মেয়েদের আসা-যাওয়া ক্রমে সহজ হইয়া উঠিল। নিবেদিতা সকলকেই আপন করিয়া লইয়াছেন। এখন আর কেহ তাঁহাকে ম্লেচ্ছ বা মেমসাহেব মনে করিয়া দূরে সরিয়া থাকেন না ; নিবেদিতার স্কুল-বাড়িতে আসিতে আর কাহারও সঙ্কোচ বোধ হয় না। এখন সকলেই বিশ্বাস করিয়া ছেলেমেয়ে পাঠায় এইখানে। নিবেদিতার নিকট জীবন-শিল্পের পাঠ লইতে—মামুলি শিক্ষা নয়। হিন্দুর আচারনিষ্ঠা বা ধর্মবোধ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া ছাত্রীদের মনের মধ্যে যাহাতে কিছু খাঁটি জিনিস দেওয়া যায়, নিবেদিতা সর্বদাই সেই চেষ্টা করিতেন। তাহাদের মনে আত্মবিকাশের একটি ইচ্ছা জাগ্রত করিয়া তোলাই হইল তাঁহার প্রথম কাজ। এইভাবে তিনি বাগবাজারের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের

হৃদয় জয় করিলেন—তাঁহার বিদ্যালয় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিল। অভিভাবকের সম্মতি লইয়াই নিবেদিতা বিদ্যালয়ে সকল বর্ণের ছাত্রীরা এক সঙ্গে পড়িতে আসিত। দূর হইতে সবিস্ময়ে চাহিয়া সকলে বলিত—"নিবেদিতা যেন মা সরস্বতী, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। তেমনি শুভ্রবর্ণ, তেমনি নির্মল দুইটি চক্ষের দৃষ্টি। আর কণ্ঠে কী মধু আর কী স্বচ্ছ স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাঁহার চক্ষে।"

এই ভাবে নিবেদিতাকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃহৎ পরিবার দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। রামপ্রসাদ কি চণ্ডীদাসের পদ গান করিতে করিতে সেলাইয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত। মুখে গান, হাতে সূঁচ-সূতা। দেয়ালের গায়ে বিলম্বিত ভারতবর্ষের মানচিত্র। মানচিত্র দেখিয়া ছাত্রীদের কল্পনা পাখা মেলে। এই স্কুলবাড়ির আঙিনা হইতে শহর, তারপর বাংলা দেশ, তারও পরে ভারতবর্ষ—ইহাদের মধ্যে কি যে সম্পর্ক তাহা নিবেদিতা ছাত্রীদের বুঝাইয়া দেন। ছাত্রীরা মধ্যভারতের নিবিড় অরণ্যের কালো বিন্দুগুলির উপর হাত বুলায়। নিবেদিতা বলেন, এখানে দেবতারা আছেন। তাহারা অবাক হইয়া শোনে। হাত বুলাইয়া দেখে পাঞ্জাবের তপ্ত মরুভূমি। ঐ মানচিত্রকে সম্মুখে রাখিয়াই তাহারা যেন কন্যাকুমারীকার শুভ্র বেলাতট আর পার্বতীর প্রিয় বাসস্থান হিমগিরির চিরতুষার দেখিয়া আসে। শিক্ষার আসরে প্রার্থনা আর 'ভারতবর্ষ' মন্ত্র জপ। এইভাবেই নিবেদিতা স্কুলে দেশাত্মবোধ আর বীরপূজার ভাব প্রবর্তন করা হয়। গুরু বলিয়া গিয়াছেন—"মেয়েরা আজ ভীরু হয়ে গেছে, এদের সিংহিনীর মত তেজী করে তুলতে হবে।" গুরুর এই আদেশকে সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদিতা ছাত্রীদের গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন।

বিদ্যালয়ের তহবিল সংকীর্ণ হইয়া আসে। উন্নতির জন্য আরো অর্থের প্রয়োজন। কিছু কিছু টাকা আসে আমেরিকার বান্ধবীদের

নিকট হইতে ; লণ্ডনের সিসেম ক্লাবও তাঁহাকে অর্থ দিয়া মাঝে মাঝে সাহায্য করিতেছে। কলিকাতার অনেক উৎসাহী ধনী অগ্রসর হইয়া আসেন বিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করিতে। কিন্তু নিবেদিতা ঠিক করিয়াছিলেন বাহিরের লোকের দান তিনি লইবেন না। তাঁহার গুরুর নিষেধ ছিল। নিজের দায় তিনি নিজেই বহন করিবেন। ক্রমাগত লেখা আর ভাষণ দিয়া যাহা উপার্জন করিতেন সেই অর্থে নিবেদিতা স্কুলটি চালাইতেন। স্কুলের জন্য তাই তাঁহার পরিশ্রমের অন্ত ছিল না—সারাটা দিনই তাঁহার নিজের ঘরে বসিয়া লেখাপড়ার কাজ লইয়া থাকিতেন।

মাঝে মাঝে বাক্স হইতে স্বামীজির একখানি পুরাতন চিঠি বাহির করিয়া নিবেদিতা পড়িতেন। চিঠিখানির তারিখ, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ সাল। কাশী হইতে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে লিখিতেছেন: "তোমার মধ্যে সকল শক্তি সংহত হউক! জগজ্জননী মা তোমার হাত ও মনকে চালনা করুন!…রামকৃষ্ণের মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে এই কর্মক্ষেত্রে পরিচালনা করিবেন, যেমন তিনি আমাকে একদিন করিয়াছিলেন—তাহার চেয়ে সহস্রগুণে বেশী করিবেন, জানিও।" ১৯০০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের আরেকখানি পত্রে ক্যালিফর্নিয়া হইতে বিবেকানন্দ স্কুল সম্পর্কে নিবেদিতাকে লিখিয়াছিলেন: "টাকার জন্য কিছু ভাবিও না ; তোমার স্কুলের জন্য টাকা আপনি জুটিয়া যাইবে—নিশ্চয়।" চিঠিগুলি যখনই পড়িতেন তখনই নিবেদিতা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও অসীম উৎসাহ বোধ করিতেন। সাহস পাইতেন। এমন দিনও গিয়াছে যখন তাঁহাদের সামান্য আহার্য জুটিয়াছে—হয়তো দুইখণ্ড পাঁউরুটি ও দুইটি কলা—তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া নিবেদিতা হাসি মুখে স্কুল চালাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ একবার প্রস্তাব করিলেন, একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার বিরাট পৈতৃক বাড়িখানি নিবেদিতাকে দিতে তিনি সম্মত আছেন। তবু নিবেদিতা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। বাগবাজারে বসিয়াই তিনি তপস্যা করিবেন, অন্যত্র যাইবেন না। গুরু তাঁহাকে এই ব্রত দিয়া গিয়াছেন। এই নিরাসক্ত বৈরাগ্যের ব্রত লইয়াই যে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার চিত্তের এই দৃঢ়তার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন: "তিনি বাগবাজারের একটি ক্ষুদ্র গলির নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।" নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে কবির পরিকল্পনা তিনি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন। যদি কেহ প্রশ্ন করিত—"রামায়ণ মহাভারতের উপর আপনি এত জোর দেন কেন?" উত্তরে নিবেদিতা অমনি বলিতেন—"শিশুদের কল্পলোকের ভিত্তি হওয়া উচিত রামায়ণ-মহাভারত, কারণ দেশের পুরাণ-ইতিহাসের সূতাতেই আমাদের আশার মালা গাঁথিতে হইবে। তবেই ভারতে জাতীয় সত্তার উন্মেষ ঘটিবে।"

দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে চাহিয়া নিবেদিতার এই কথা কয়টি আজ আমাদের নূতন করিয়া মনে পড়িতেছে।

সেই সঙ্গে আরো মনে পড়িতেছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতার মনে দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা যে দ্বিদল বীজটি রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা হইল দেশসেবা ও দেশপ্রেম। এই বীজ হইতেই নিবেদিতা বিদ্যালয়টি আজ এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। কত অনাথাকে আশ্রয় দিয়া সুশিক্ষা দান করিয়া নিবেদিতা যে তাঁহার প্রগাঢ় গুরুভক্তিকে প্রকাশ করিতেন, তাহা কেবলমাত্র হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার জিনিস। আজ সামান্য আছে, কিন্তু একদিন ইহাই

তো অসামান্য হইয়া উঠিতে পারে, এই বিশ্বাস লইয়াই নিবেদিতা বাগবাজারের সেই সংকীর্ণ গলিটির জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় বাড়িতে বসিয়া সেদিন বিবেকানন্দের অভীপ্সিত কার্যকে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেন। সে-চেষ্টা তপস্যারই সমতুল্য। কৌমার্য ও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে প্রতিদিন কী ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত নিবেদিতা এই স্কুলটির জন্য সাধনা করিতেন, সে-ইতিহাস কোনো দিনই কেহ জানিতে পারিল না। ভারতবর্ষে নারীজাতির মধ্যে কার্য করিবার জন্য স্বামীজি চাহিয়াছিলেন একদল ব্রহ্মচারিণী যাঁহারা ঈশ্বরমাত্র সম্বল করিয়া অসীম সাহসের সহিত এই দুরূহ ব্রত সংসাধন করিবার জন্য অগ্রসর হইবে। স্বদেশে ঠিক এইরকম একটি দেশসেবিকা তিনি পান নাই বলিয়াই নিবেদিতাকে আনিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাঁহার আদর্শে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সর্বোপরি ছিল শিক্ষা সম্পর্কে নিবেদিতার আশ্চর্য মনীষা। ১৭নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা অতি সাধারণ ভাবে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে ছিল অসাধারণ তেজস্বিতা—যাহার আকর্ষণে বোসপাড়ার ঐ বাড়িতে তদানীন্তন ভারতবর্ষের বহু বিখ্যাত মনীষী ও দেশনায়ক তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আসা-যাওয়া করিতেন। এমন যে তেজস্বিনী, কিন্তু ছাত্রীদের নিবেদিতা ভালবাসিতেন ঠিক মায়ের মতন।

বাংলাদেশের সমস্ত ছেলেমেয়েদেরই নিবেদিতা মায়ের মতন ভালবাসিতেন। তাই দেখিতে পাই বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতা সমস্ত বাঙালির অন্তর জুড়িয়া বসিলেন। কলিকাতায় তাঁহার বক্তৃতা তখন শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণের বিষয় ছিল। সে যুগে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা কোথাও হইবে

জানিতে পারিলেই শিক্ষিত বাঙালি সে আসরে গিয়া ভীড় জমাইত এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। কী উন্মাদনা ছিল সেই বক্তৃতায় তা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তাহা ভাষায় বুঝাইবার জিনিস নয়। তাঁহার ভাষণ দিবার ভঙ্গিটি ছিল অপূর্ব। উদাত্ত, সুমিষ্ট কণ্ঠ, ওজস্বিনী ভাষা আর ভাবের ছটা—শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিত। বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন প্রথমে ধীরে, পরে সেই কণ্ঠস্বর যখন উচ্চগ্রামে উঠিত, তখন তাহার বেগ ও আবেগ শ্রোতাদের হৃদয় ও মনকে স্পন্দিত ও অভিভূত করিয়া তুলিত। ১৯০২ সালে এমনি দুইটি বক্তৃতার বিবরণ দিয়াছেন মিঃ এস. কে. র‍্যাটক্লিফ্। র‍্যাটক্লিফ্ তখন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এবং নিবেদিতার অন্তরঙ্গ ও অনুরাগী বন্ধুদের মধ্যে একজন। 'নিবেদিতার স্মৃতি-প্রসঙ্গে র‍্যাটক্লিফ্ লিখিয়াছেন :

"কলিকাতায় তাঁহার দুইটি বক্তৃতার কথা আমার বিশেষভাবে স্মরণ হয়। ১৯০২ সালের শরৎকালের এক রবিবার। সন্ধ্যায় তাঁহার বাগবাজারের স্কুলে গিয়াছি। এই স্কুলেই তিনি বাস করিতেন। সন্ধ্যার অবসরেই তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের সহিত মিলিত হইতেন, আলাপ-আলোচনা করিতেন। কিন্তু সেদিন আমি যাওয়া মাত্র বলিলেন—'আজ গল্প করিবার সময় নাই; এখন বক্তৃতা দিতে যাইতে হইবে।' জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোথায়?' বলিলেন—'কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; একটি স্কুলে।' নিবেদিতার সঙ্গেই চলিলাম। স্কুলের উঠানটি লোকে ভরিয়া গিয়াছিল—বেশীর ভাগই যুবক এবং পুরুষ। বক্তৃতামঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন একজন কথক; তাঁহার পাশে একটি মাটির টবে তুলসী গাছ। উপরে শামিয়ানা টানানো। আমরা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কথক ঠাকুর রামায়ণ হইতে একটি আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা ধরিয়া কথকঠাকুর আবৃত্তি করিলেন—সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই সুন্দর কথকতা শুনিতে লাগিল। একজন দোভাষী রামায়ণের যে অংশটুকু কথক আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন—কোন্ অংশ তাহা

আমার সঠিক মনে নাই। কথকের আবৃত্তি শেষ হইলে পরে নিবেদিতা উঠিলেন বক্তৃতা করিতে। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই (নিবেদিতা তাঁহার বক্তৃতায় কখনো ভনিতা করিতেন না, একেবারে সোজাসুজি বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিতেন) তিনি ভারতীয় ছাত্রদের আদর্শ সম্পর্কে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কথকের আবৃত্তির ছিন্নসূত্র অবলম্বন করিয়া রামায়ণের নীতির প্রতি শ্রোতাদের মনকে আকর্ষণ করিলেন এবং শ্রোতাদের মনে তাহার আশ্চর্য ফল প্রত্যক্ষ করিলাম। নিবেদিতা বলিলেন—'তোমরা কী মনে কর কেবল রামায়ণ আবৃত্তি করিলে কিম্বা রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করিলেই রামায়ণ-পাঠ সার্থক হইল? যে আদর্শ প্রাচীন ভারতের নর-নারীদের জীবনকে উদ্বোধিত করিত, সেই আদর্শের গৌরব বোধ করাই কী যথেষ্ট কিম্বা সেই গৌরবজনক আখ্যায়িকা জানাই কি যথেষ্ট? আমি মনে করি তাহা যথেষ্ট নয়। যে সমাজ হইতে রামায়ণের উদ্ভব, সেই সমাজ কী চিরদিনের মত মৃত? রামায়ণের কাহিনী কী অতীতের মধ্যেই নিঃশেষিত? না, তাহা নয়। রামায়ণের কাহিনী, রামায়ণের ভাবধারা ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হইতে আজো উৎসারিত হইতেছে। আমি তাই ভারতের তরুণ সম্প্রদায়কে বলি—তোমরা তোমাদের নিজস্ব রামায়ণ রচনা কর; রচনা কর আখ্যায়িকা দিয়া নয়, জন্মভূমির প্রতি অন্তরের সেবা দিয়া। জীবনের প্রত্যেকটি কর্মে ও চিন্তায় ফুটাইয়া তোল রামায়ণকে, তবেই তো রামায়ণ পাঠ সার্থক হইবে।' বলা বাহুল্য, শ্রোতারা নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইল, উদ্বুদ্ধ হইল।"

"আর একদিনের ঘটনা মনে আছে। স্থান—ড্যালহৌসি ইনস্টিটিউট। শ্রোতা বেশীর ভাগই ভারতীয়, কয়েকজন উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয়ও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য।' নিবেদিতার পক্ষে অদ্ভুত বিষয়। চৈতন্য লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন স্যার এডমণ্ড এলিস—ভাইসরয়ের পরিষদের সামরিক সদস্য। ভাইসরয়ের অর্থসচিব স্যার এডওয়ার্ড ল ব্রহ্মচর্যের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিলেন আর সিভিল সার্ভিসের একজন বর্ধিষ্ণু পার্শী সভ্য বলিলেন বিবাহের স্বপক্ষে। এই পার্শী সিভিলিয়ান তখন বাংলা প্রদেশের

আবগারী বিভাগের কমিশনার ছিলেন। তারপর উভয়ের বক্তব্যের আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দিলেন ভারতীয় বিচার বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি বিবাহ সম্পর্কে প্রচলিত ভারতীয় চিন্তাধারাই ব্যাখ্যা করিলেন। সর্বশেষে সভাপতি ভগিনী নিবেদিতাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। নিবেদিতা বক্তৃতা মঞ্চে তাঁহার এক য়ুরোপীয় মহিলার পাশেই বসিয়াছিলেন। নিবেদিতা ধীরভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন এবং প্রারম্ভেই সভাপতিকে তিনি শিষ্টতাপূর্ণ সকৌতুক ভর্ৎসনা করিলেন। তারপর কয়েকটি তীক্ষ্ণ ও সুচিন্তিত কথার ভিতর দিয়া জায়াত্ব সম্পর্কে প্রাচ্য আদর্শের ভাবধারা বিশ্লেষণ করিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য নারীর সহিত ভারতীয় নারীর একটি সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করিলেন। সমাজে ও গৃহে জননী ও জায়ারূপে নারীর যে বৈশিষ্ট্য তাহা তিনি নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। সেদিন নিবেদিতার এই দশ মিনিটের বক্তৃতাটি এত উপভোগ্য হইয়াছিল যে তাহা আমার চিরদিন মনে থাকিবে।"

এইভাবেই সেদিন বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণের হৃদয়ে ভগিনী নিবেদিতা যে শ্রদ্ধার ও স্নেহের আসন লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্যের আর কোনো নারীর জীবনে সে সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। এমনি করিয়াই তিনি সেদিন ভারতের যুবচিত্ত ও জনচিত্ত একসঙ্গে জয় করিয়াছিলেন।

॥ পনেরো ॥

বাংলায় প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

নিবেদিতা এই গুপ্ত সমিতিতে তাঁহার লাইব্রেরীর প্রায় দুই শত বই দিলেন। শুধু বই দেওয়া নয়, সমিতির যুবকদের নানাভাবে পরামর্শও দিতে লাগিলেন। কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মী গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন নিবেদিতা। শিক্ষার বিষয় ইতিহাস, জীবনী ও অর্থনীতি। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং দাদাভাই নৌরজীর অর্থনীতির বইগুলির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল। তারপর সারা বাংলাদেশের শহরে শহরে তাহাদের পাঠাইয়া সমগ্র দেশ বিপ্লবের ছোট বড় মৌচাকে ছাইয়া দিতে হইবে। অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র প্রথম ছাত্র। তারপর আসিলেন দেবব্রত বসু, নলিন মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বাছাই করা কয়েকজন তরুণ। বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভূপেন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় তাঁহার আগেই হইয়াছিল। গুরুজীর ভাইকে বিপ্লবের মধ্যে পাইয়া নিবেদিতার সে কী আনন্দ। বিপ্লবী বিবেকানন্দ তাঁহার বিপ্লবী কন্যাটিকে রাখিয়া গিয়াছিলেন বাংলার ভাবী বিপ্লবীদের শিক্ষা দিবার জন্য এবং সেই বিপ্লবীদের মধ্যে তরুণ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে পাইয়া নিবেদিতার হৃদয় গর্বে ভরিয়া উঠিল। প্রথম দিন হইতেই ভূপেন্দ্রনাথের উপর ভগিনী নিবেদিতার সজাগ ও সস্নেহ দৃষ্টি ছিল এবং যতদিন নিবেদিতা বাঁচিয়াছিলেন ততদিন কি এদেশে, কি প্রবাসে, তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে

আপনার পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আর একজন মারাঠি তরুণ আসিয়া যোগদান করিলেন। তাহার নাম সখারাম গণেশ দেউস্কর। দেশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিবার এমন একটি দল আছে শুনিয়া এই শিবাজী-ভক্ত মহারাষ্ট্র-সন্তান তো আনন্দে অধীর। সখারাম সমিতির সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের অর্থনীতি শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

১৯০৩ সালের জানুয়ারীতে মহাসমারোহে দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠিত হইল। লর্ড কার্জন তখন বড়লাট। সেই দাম্ভিক এবং ক্ষমতাগর্বী ইংরেজ রাজপুরুষ খুব জাঁক-জমক সহকারে এই দরবারের আয়োজন করিলেন। বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্ত এবং জনসাধারণের অর্থের এই অপব্যয় দেখিয়া রমেশচন্দ্রের মত সিভিলিয়ানও দিল্লী-দরবারকে একটি প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী বলিয়া উল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। রবীন্দ্রনাথও লর্ড কার্জনের এই দরবারী ব্যাপারের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিলেন। ইহাতে নিবেদিতা উল্লসিত হইলেন—ভারতবাসী আজ ইংরেজ রাজপুরুষের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে শিখিয়াছে। নিবেদিতাও কলম ধরিলেন। লিখিলেন—"গত দরবারের পর এই পঁচিশ বৎসরে ভারতবর্ষ অনেকখানি রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সঞ্চয় করিয়াছে—শতাব্দীর আর এক পাদে কত দূর সে অগ্রসর হইবে?" বাংলা সংবাদপত্রে এই প্রথম কঠোর সমালোচনার ভাষায় জনমত প্রকাশ পাইল।

এই সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইউনিভার্সিটি বিল পাশ। এই বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিবার কথা বলা হইয়াছিল। আসলে লর্ড কার্জনের এই বিল দেশের উচ্চ শিক্ষাকে রোধ করিতে উদ্যত হইল। জাতীয়তাবাদীরা এই বিলের

পিছনে সরকারের কূটনীতির ইঙ্গিত পাইলেন ; তাঁহারা বুঝিলেন যে, শিক্ষিত শ্রেণীর বর্তমান মনোভাব ইংরেজ রাজপুরুষগণ আতঙ্কের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই তাঁহারা ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। বাঙালির জননায়কেরা বিলের বিরোধিতা করিলেন—তথাপি বিল পাশ হইয়া গেল। দেশশুদ্ধ লোকের প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া জবরদস্ত লাট আইন পাশ করিলেন। ইহাতেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এই বিলের বিরোধিতা করেন স্বনামধন্য স্যার রাসবিহারী ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হিসাবে বাংলার তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গভর্নর, এণ্ড্রু ফ্রেজার তাঁহাকে একজন 'Pushing lawyer' বলিয়া বিদ্রূপ করেন। রাসবিহারী সেদিন এই বিদ্রূপের সমুচিত জবাব দিয়া যে-পুস্তিকা ছাপাইয়া বিলি করেন, তাহা তিনি ছাপিবার পূর্বে নিবেদিতাকে দিয়া একবার দেখাইয়া লইয়াছিলেন। নিবেদিতা সেই পুস্তিকায় এই লাইনটি যোগ করিয়া দিয়াছিলেন : "ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ইংরেজি ভাষায় এই স্কচ্‌ম্যানের বিদ্যার দৌড় কতদূর।" ফ্রেজার যে স্কচ্‌ ছিলেন, তাহা নিবেদিতাই জানিতেন।

কার্জনী যুগের এই মধ্যাহ্ন কালেই একদিন (১৯০২, ১৫ই ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভার অনুষ্ঠান হইল। এই উপাধি বিতরণ-সভায় চ্যান্সেলার হিসাবে লর্ড কার্জন তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের শিথিলতার প্রতি কার্জন কটাক্ষ করিলেন—"প্রাচ্য দেশবাসিগণ অত্যুক্তিবাদী ও অতিরঞ্জনপ্রিয়।" কার্জনের আসল রাগ ছিল দেশের সংবাদপত্রের উপর, কিন্তু তাহা পড়িল গিয়া সমস্ত দেশের লোকের চরিত্রের উপর। সেই কনভোকেশন সভায় অন্যান্য

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নিবেদিতাও ছিলেন। স্যার গুরুদাসের পার্শ্বেই তিনি বসিয়াছিলেন। বড়লাটের এই দাম্ভিকতাপূর্ণ কটূক্তি নিবেদিতার মনে তৎক্ষণাৎ ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল; তিনি যেন ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। যে-ভারতকে তিনি গুরুর আদেশে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মভূমি বলিয়া মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের নর-নারীর চরিত্রের উপর ইংরেজ রাজপুরুষের এই হীন কটাক্ষ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রসারিত-ফণা ভুজঙ্গীর মত দুর্বার, তেজদৃপ্ত ভঙ্গিতে স্যার গুরুদাসকে তখনি বলিলেন—"ইহা মিথ্যা কথা।" একজন বিদেশীনীর মুখে এই কথা শুনিয়া স্যার গুরুদাস পর্যন্ত বিচলিত হইলেন—নিবেদিতার ভারত-প্রীতি সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিল।

সভা ভাঙিলে পরে নিবেদিতা স্যার গুরুদাসকে এক রকম জোর করিয়াই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাকে একখানি বই খুলিয়া দেখাইলেন। বইখানি লর্ড কার্জনের লেখা। নাম—"দি প্রবলেম্‌স্ অব্ দি ঈষ্ট্।" নির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া স্যার গুরুদাস তো বিস্মিত। "দেখিলেন, কার্জন নিজে কত বড় মিথ্যাবাদী?"—নিবেদিতা বলিলেন। তাঁহার রাগ তখনও কিছুমাত্র কমে নাই। ঠিক হইল স্যার গুরুদাস এই কটাক্ষের প্রতিবাদ করিবেন। তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বাগবাজারে নিবেদিতার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। নিবেদিতা পড়িয়া দেখিলেন যে সমুচিত জবাবই হইয়াছে। স্যার গুরুদাসের নামে ইহা প্রকাশিত হইবার উপায় নাই। কারণ, তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি। সন্ধ্যার সময়ে সেই প্রবন্ধটি লইয়া নিবেদিতা অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে আসিয়া শিশির ঘোষ এবং মতি ঘোষের সহিত দেখা করিলেন ও সব কথা তাঁহাদের খুলিয়া বলিলেন। বলা বাহুল্য, পরদিন প্রাতে 'পত্রিকার'

প্রধান সম্পাদকীয় হিসাবে স্যার গুরুদাসের প্রবন্ধটি তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল। এই উপলক্ষে পত্রিকার স্বনামধন্য ঘোষ-ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পাইল।

লর্ড কার্জনের এই উক্তি দেশের মধ্যে বিশেষ ক্ষোভ ও আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। কয়েকদিন পরেই বিখ্যাত আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে প্রতিবাদ সভা হইল। কার্জনের বিরুদ্ধে বাঙালির এই প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ। নিবেদিতাও নীরব থাকিতে পারেন নাই। সেই প্রতিবাদ-সভায় বাঙালি যে নিবেদিতাকে দেখিল, সে-নিবেদিতা বিবেকানন্দের স্বহস্ত-প্রজ্বলিত একটি দীপ্তিময়ী অগ্নিশিখা। বিদায়ের কালে তিনি ইহাকেই তাঁহার স্বজাতির হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে এক পত্রে নিবেদিতা লিখিয়াছেন :

"ভারতের উপর অনেক অবিচার হইতেছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, ভারতের—ভারত হওয়ার অধিকার ইংরাজ কাড়িয়া লইয়াছে। নিজের জন্য নিজে চিন্তা করিতে পারে না এই দেশ, কিছু জানিবার অধিকারও তাহার নাই। আমি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারি না। এই দেশের অন্ন চাই, সুবিচার চাই, আরো কত কিছু চাই। এই সব দাবির কথা চিন্তা করিতে গেলে মন আগুন হইয়া উঠে, কিন্তু ঐ এক বেদনায় আর সব দুঃখ ছোট হইয়া যায়।"

এই ঘটনার পর বাংলার সকল মনীষীর দৃষ্টি নিবেদিতার উপর গিয়া পড়িল। পাল্টা জবাব দিয়া সরাসরি বড়লাটকে এইভাবে আক্রমণ—এ কী কম সাহসের কথা! বাঙালি রাগিয়া আগুন হইল, আর তাহাদের হইয়া সেই রাগ প্রথম প্রকাশ করিলেন নিবেদিতা। এই দেশকে কতখানি ভালবাসিলে এই নির্ভীকতা সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিলে নিবেদিতার সুকঠিন চরিত্রের প্রতি আমরা

শ্রদ্ধা না জানাইয়া পারি না। দুই-এক দিন বাদেই মতিলাল ঘোষ আসিলেন নিবেদিতার সহিত দেখা করিতে।

নিবেদিতা তখন একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি অনেকগুলি পত্র-পত্রিকার সহিত জড়িত ছিলেন, অনেকগুলিতেই আবার সম্পাদকীয় লিখিতে হইত। এতদিন বক্তা ছিলেন, এখন পুরোদস্তুর লেখিকা। আর সে-সব রচনা কি জ্ঞানগর্ভ! তাঁহার প্রতিভা, আর ঐতিহাসিক জ্ঞান নিবেদিতা এইবার নিয়োগ করিলেন ভারতের সেবায়। শুধু যে কলিকাতার কাগজে লিখিতেন, তাহা নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রের দুই-একখানি কাগজেও তাঁহাকে লিখিতে হইত। টিলকের দেশ মহারাষ্ট্র—বাংলার পরই নিবেদিতার প্রিয় ছিল। টিলক যখন রাজদ্রোহের অভিযোগে ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই সময় মহারাষ্ট্রের একটি পত্রিকায় নিবেদিতার "টিলক কেস্—অ্যান আপীল টু দি হাইকোর্ট" প্রবন্ধটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। যে কাগজে নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রবন্ধ বাহির হইত, সেই কাগজের উপরই গিয়া সরকারের শ্যেন-দৃষ্টি পড়িত। তাঁহারই জন্য 'ষ্টেটসম্যান' এক সময়ে পুলিশের নজরে পড়িয়াছিল এবং নিবেদিতার বন্ধু, সম্পাদক মিঃ এস. কে. র‍্যাটক্লিফকে পর্যন্ত এই জন্য বেশ দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। মতিলাল আসিতেই নিবেদিতার তাই মনে হইল, কি জানি কার্জনের ব্যাপারে 'পত্রিকায়' স্যর গুরুদাসের প্রবন্ধের জন্য ঘোষ মহাশয় বিব্রত বোধ করিয়াছেন কিনা। "আসুন, আসুন"—বলিয়া নিবেদিতা মতিলালকে অভ্যর্থনা করিলেন।

"কী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মেয়ে আপনি! একেবারে স্যর গুরুদাসকে দিয়ে লিখিয়ে কার্জনকে অপদস্থ করলেন—একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন।" এই বলিয়া মতিলাল হাসিলেন।

"আপনি বিব্রত হননি তো ?"

"কিছুমাত্র না। পারেন তো আরো মালমসলা জুটিয়ে দেবেন—ছাপব। ওটা কি লিখছেন ?"

"সাম্ মেজার্স্ অব্ এডুকেশনাল রিফর্ম'—এটা র‍্যাট্‌ক্লিফ চেয়েছে।"

"বলছিলাম কি, কলম যখন ধরেছেন তখন প্রাণ যা চায় লিখে যান। 'পত্রিকায়' আপনার ইচ্ছামত মত প্রকাশে কোনো বাধাই নেই, জানবেন।"

"দেখছি আপনারও সুর পাল্টে গেছে।"

সেদিন আর বেশী কথা হইল না। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল। নিবেদিতা ও মতিলাল পরস্পরকে বিশ্বাসও করিলেন অকপটে। ইহার পর নিবেদিতার কাছে মতিলালের যাওয়া-আসা প্রায় নিয়মিত হইয়া উঠিল। তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, নিবেদিতা শৈবযোগিনী। মতিলাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা চৈতন্য-চরিতামৃত পরিবেশন করিতেন, নিবেদিতা একমনে রুদ্রাক্ষের মালা ফিরাইতেন। একজনের হাতের অস্ত্র ভাগবত, অন্যের অস্ত্র অদ্বৈত-বেদান্ত। একে অন্যের মত পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিতেন এবং এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধও বাধিত এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকিলে সে-দৃশ্য উপভোগ করিতেন। তথাপি নিবেদিতা ও মতিলালের মধ্যে যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রতি বৎসর ভাইফোঁটা উৎসবে প্রকাশ পাইত।

কার্জনকে অপদস্থ করিবার জন্য ১৬ই ফেব্রুয়ারীর অমৃতবাজার পত্রিকায় স্যার গুরুদাসের লিখিত সম্পাদকীয় ভিন্ন আরো একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ছিল। সেটি নিবেদিতার রচনা। এই রচনাটির মারফৎ সেদিন নিবেদিতা যেভাবে কূটনীতির মর্মোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহা

তাঁহারই প্রতিভারই পরিচায়ক। নিবেদিতা প্রথমে চ্যান্সেলারের ভাষণ হইতে ভারতবাসীর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষমূলক লাইন কয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। এই উদ্ধৃতির পাশাপাশি তিনি জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জনের 'দি প্রব্লেম্স্ অব্ দি ঈষ্ট' নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত লর্ড কার্জনের সহিত কোরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের সভাপতির সাক্ষাৎকারের যে প্রসঙ্গটি ছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। এই সময় কার্জনের বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বৎসর। কিন্তু পূর্ব হইতেই তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কোরিয়াতে গিয়া জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি যেন তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর না বলিয়া ৪০ বৎসর বলেন, কারণ চল্লিশের কম বয়সের লোককে সেই দেশে শ্রদ্ধা দেখান হয় না। কোরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরে বসিয়া কার্জন এই নির্জলা মিথ্যাটি বলিয়াছিলেন—তেত্রিশকে বাড়াইয়া চল্লিশ করিয়াছিলেন। কনভোকেশনের ভাষণ এবং কোরিয়ার এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ—এই দুইটি পাশাপাশি তুলিয়া দিয়া নিবেদিতা মন্তব্য করিলেন—"প্রবলেমস্ অব দি ঈষ্ট" পুস্তকের এই উদ্ধৃতিটি এই পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণ হইতে বেমালুম বাদ দেওয়া হইয়াছে—লেখক অবশ্য একই আছেন সেই—জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন—অর্থাৎ লর্ড কার্জন। এখন পাঠক বিচার করিতে পারেন প্রকৃত মিথ্যাবাদী কে এবং কে অতিরঞ্জনপ্রিয়?"

এমনই ছিল নিবেদিতার কৃতিত্ব, কারণ কার্জনের ঐ বইখানির প্রথম সংস্করণে যে ঐ রকম একটি সাক্ষাতের বিবরণ ছিল, তাহা একমাত্র নিবেদিতাই জানিতেন। তাই তাঁহার পক্ষে কার্জনের প্রতি এই মর্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করা সেদিন সহজ হইয়াছিল। 'পত্রিকার' ইহাতে সুনাম বাড়িল, জনপ্রিয়তাও বাড়িল। "পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর

সততা"র স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়া নিবেদিতা সেদিন ভারতবাসীর যে কি মহৎ উপকার করিয়াছিলেন তাহা সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিয়া পরবর্তী কালে মতিলাল ঘোষ বলিতেন—"এই একটিমাত্র ব্যাপারের জন্যই নিবেদিতার কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধনীয়। লণ্ডনের একাধিক পত্রিকার সম্পাদক পর্যন্ত সেদিন অমৃতবাজারকে এই জন্য প্রশংসা করেন—কিন্তু তাঁহারা কেহই জানিতেন না যে, এই শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপের কৌশল একমাত্র নিবেদিতারই ছিল।" নেপথ্য হইতে তিনি সেদিন এই ভাবেই ভারতবাসীর আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৯০৩, ৩রা ডিসেম্বর—বাংলা ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১০। বাংলার শিরে অকস্মাৎ বজ্র পড়িল। এই তারিখে কলিকাতা গেজেটে বাঙলা দেশকে শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা হইবে এই ওজুহাতে দ্বিধা-খণ্ডিত করিবার সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। বাঙলা দেশ বলিতে তখন বুঝাইত একটি বিরাট দেশ—বিহার, উড়িষ্যা ও সমগ্র বাঙলা দেশ। এই ঘোষণা জাতির জীবনে 'শাপে বর' হইয়া দাঁড়াইল। আত্মশক্তির উপর ব্যবহারিক রাজনীতির প্রতিষ্ঠা-আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হইল বাঙ্‌লাদেশেই এই বঙ্গচ্ছেদ ব্যপদেশে। নিবেদিতার স্পর্শচেতন দেহমনকে বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন নাড়া দিল। আনন্দমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশনায়কগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবেদিতা দেশবাসীকে কপটতা ত্যাগ করিয়া এই উদ্যত আঘাতের যাহা শিক্ষা, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য 'আহ্বান করিলেন। চারিদিকে বিক্ষোভ দেখা দিল। বাঙ্‌লার শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদ জানাইল। কলিকাতা এবং সমগ্র বাংলাদেশের জেলায় জেলায় প্রতিবাদ সভার আয়োজন হইল।

দূর-দূরান্তে নিভৃত পল্লীতেও সাড়া পড়িয়া গেল। মন্দিরের শঙ্খ-ধ্বনিতে গর্জিয়া উঠিল বিপ্লবের সুর, পূজার্থীরা পূজারীর নিকট পাইলেন বিপ্লবের দীক্ষা, অধ্যাপক অগ্নিমন্ত্র দিলেন ছাত্রের কর্ণে। এক প্রাণ বাঙালি শতকোটি কণ্ঠে একই প্রতিবাদ জানাইল। সহস্র কণ্ঠ-উচ্চারিত সেইসব প্রতিবাদের মধ্যে, নিবেদিতাও তাঁহার প্রতিবাদ যোগ করিয়া দিলেন একটি অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধের ভিতর দিয়া। 'ভক্স্ ইগ্নোটা' এই ছদ্মনামে লিখিত সেই প্রবন্ধটির নাম—'দি ভাইস্রয় এণ্ড দি পার্টিসন কোশ্চেন"। প্রবন্ধটি 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং নিবেদিতার এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মিঃ এস, কে, র্যাটক্লিফ সেই সময় কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন আর ইংরেজ-রাজপুরুষদের সতর্ক দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে গিয়া পড়িল নিবেদিতার উপর।

'ভক্স ইগ্নোটা' বা 'অপরিচিত কণ্ঠস্বর', এই ছদ্মনামের অন্তরালে থাকিয়া সেদিন—বাংলার নব জাগরণের সেই অগ্নিযুগে—নিবেদিতা একাধিক ভারতীয় পত্রিকায় যে-সব সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি দেশের লোকের মনে উগ্র জাতীয়তা, ইংরেজ-বিদ্বেষ এবং দেশপ্রেম উদ্বোধন ও প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের কি ধূমায়িত, কি প্রজ্জ্বলিত এই উভয়বিধ স্তরেই নিবেদিতার উদ্দীপনাময়ী লেখনী সমানে প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলিবার আছে! স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা ভারতবাসী বলিতে কেবল হিন্দুদের বুঝিতেন না, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এই দেশ, ইহা তিনি অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা অপেক্ষা বেশী বুঝিতেন। ভারতবর্ষের জাতীয়তার বিরাট চেতনা কেবল হিন্দুকে লইয়া নহে, অথবা মুসলমানকে লইয়া নহে—হিন্দু-মুসলমান উভয়কে লইয়াই। 'ন্যাশনালিটি' বলিতে তিনি ইহাই

বুঝিতেন এবং তাঁহার এই সময়কার প্রত্যেকটি রচনা এবং বক্তৃতা এই বোধেই উদ্দীপ্ত ছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবনাকে এই ভাবে আত্মসাৎ করিয়া ইতিহাসের নূতন অর্থের আলোকেই ভারতের নব-জাগ্রত জাতীয়তাকে তিনি পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। সেখানে হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদ ছিল না। এইখানে রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতায় মিল ছিল। নিবেদিতা-চরিত্রের এই দিকটি কেহই আলোচনা করেন নাই।

আটবৎসরব্যাপী বাঙালির এই ইতিহাস-বিখ্যাত আন্দোলনের প্রথম হইতেই প্রায় শেষ পর্যন্ত নিবেদিতা যে রকম ঘনিষ্ঠভাবে ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন, সে-ইতিহাস জানিবার মতন। এই সময়ে মহিমময়ী এই নারী যাহা বলিয়াছিলেন এবং যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় বাঙালির প্রাণ সত্যই চমকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

॥ ষোলো ॥

ওকাকুরা ধরিয়া বসিলেন নিবেদিতাকে একবার জাপানে যাইতে হইবে। বেলুড়মঠে ওকাকুরার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়। সেখানে টোকিও শহরে তিনি একটি বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছেন। স্বামীজি বাঁচিয়া থাকিতেই ওকাকুরা তাঁহাকে এই সম্মেলনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"যদি শরীর সুস্থ থাকে, তবে নিশ্চয়ই যাইব।" কিন্তু স্বামীজির অকাল মৃত্যুতে ওকাকুরার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। ওকাকুরা ভাবিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য প্রতিনিধি তো রহিয়াছেন। তাই তিনি নিবেদিতাকে টোকিও সম্মেলনে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতমা মার্কিন শিষ্যা মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলিয়ডও টোকিও যাইবার জন্য নিবেদিতাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু কলিকাতার কাজ তখন এত বেশী তাঁহার চিন্তা ও সময় দাবী করিতেছে যে, ওকাকুরার প্রস্তাবে নিবেদিতা শেষ পর্যন্ত সম্মত হইতে পারিলেন না।

ওকাকুরা যখন আসিলেন, নিবেদিতা তখন তাঁহারই 'প্রাচ্যের আদর্শ' বা 'আইডিয়ালস্ অব্ দি ঈস্ট' বইখানির পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ওকাকুরার বক্তব্যকে মূর্ত করিলেন নিবেদিতা তাঁহার আশ্চর্য লিপিকুশলতায় ও সম্পাদনায়। "ওয়া গুরুজী কি ফতে" এই বলিয়া নিবেদিতা অভ্যর্থনা করিলেন ওকাকুরাকে। একটি ছোট্ট জলচৌকির উপরই ওকাকুরা বসিয়া পড়িলেন। কালো সিল্কের

একটা কিমোনো গায়ে। হাতে ফুলকাটা একখানি জাপানী পাখা। মুখে অনির্বাণ সিগারেট। বেঁটেখাটো মানুষটি, সুন্দর চেহারা, আয়ত চক্ষু, ধ্যান-নিবিষ্ট গম্ভীর মূর্তি। আকৃতিতে একটি রাজোচিত মহিমা, প্রকৃতিতে মহাপুরুষসুলভ প্রসন্নতা। নিবেদিতা জানিতেন মানুষটি একেবারে স্বপ্নবিলাসী নয়। সামুরাই তিনি, জাপানী ক্ষাত্রবীর্য তাঁহার রক্তে। তাঁহার ভাবভঙ্গিতেই ইহা ফুটিয়া উঠিত। নিবেদিতার মতন তিনিও সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়া জাগরণের বাণী, ভারতের অতীত শৌর্যবীর্যের কথা প্রচার করিয়াছেন। এইখানেই দুইজনার মধ্যে মিল। ভারতবর্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছেন ওকাকুরা। ভারতের সব তীর্থ পরিক্রমা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধতীর্থগুলি। বাকী আছে উড়িষ্যা। সেই প্রসঙ্গ তুলিয়া ওকাকুরা বলিলেন—

"টেগোর বলছিলেন, কোণারকের মন্দিরটা একবার ঘুরে আসতে।"

"নিশ্চয়ই যাবেন। নয় তো ভারতবর্ষের আসল জিনিসই দেখা হবে না।"

"হ্যাঁ, টেগোরও তাই বলছিলেন, ভারত-শিল্পের প্রাণের খবর মিলবে ওখানে।"

"ঠিক তাই।"

"ভারতের শিল্প-কীর্তি যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।"

"সত্যি তাই। গুরু বলতেন ভারতের শিল্পীর হাতে গড়া দেবমন্দির ও দেবতা সবই সুন্দর। কোণারক যখন যাবেন, অমনি পুরীর মন্দিরটা ঘুরে আসবেন।"

"তাও টেগোর বলেছেন। বললেন—'জগন্নাথের ডাক পড়েছে আমার বিদেশী শিল্পী ভাইকে।' যাক সে-সব কথা। কিন্তু আপাততঃ মাথায় রয়েছে টোকিও সম্মেলন। আপনার যাওয়া সম্বন্ধে কী ঠিক করলেন?"

"যাওয়া অসম্ভব। এমন সব কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি যে, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আপনার বইটা দেখে দিলাম।"

ওকাকুরা হাসিয়া বলিলেন—"দেখে দিলাম নয়, বলুন, লিখে দিলাম।"

"কিন্তু ভাবটা তো আপনার।"

"ভূমিকা?"

"তাও লিখে ফেলেছি।"

"কি লিখলেন, একটু পড়ে শোনান না?"

"লিখলাম—সমগ্র এশিয়াখণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশে এখন একই জীবন স্পন্দিত হইতেছে। প্রাচীন মানব-সভ্যতার প্রসূতি এশিয়া চিরদিন এক এবং অখণ্ড। ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতবর্ষ হইতেই এই সভ্যতা জন্মলাভ করিয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক তেমনই উন্নত।"

এই প্রসঙ্গে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন ঃ

"ওকাকুরা ইংরেজি বিশেষ জানিতেন না, তবে তিনি নিখিল এশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি নূতন করিয়া ওকাকুরার বইখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। এশিয়া সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের স্বাক্ষর এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

দার্জিলিঙ। গ্রীষ্মের অবকাশে একটু বিশ্রাম লইবার জন্য ভগিনী ক্রিষ্টিনকে সঙ্গে লইয়া নিবেদিতা দার্জিলিঙ আসিলেন। দার্জিলিঙ-এ তখন জগদীশচন্দ্র রহিয়াছেন, গোখ্‌লে রহিয়াছেন এবং তাঁহার পুরাতন অনেক রাজনীতিক বন্ধুই রহিয়াছেন। এখানেও তাঁহার অবকাশ বলিতে কিছুই রহিলনা—সেই কাজ আর কাজ। বিশ্রাম দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। গোখ্‌লে একদিন নিবেদিতাকে বলিলেন—

"সামনেই মাদ্রাজ কংগ্রেস। বড়দিন, তখন আপনার স্কুল বন্ধ। যাচ্ছেন তো? আপনি কংগ্রেস থেকে দূরে সরে আছেন কেন?"

নিবেদিতা বলিলেন—"কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও, বিশ্বাস করুন, কংগ্রেস আমার চিন্তার বাইরে নয়।"

তারপর ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজ কংগ্রেস হইতে ফিরিবার পথে নিবেদিতা ১৯০৪ সালের জানুয়ারীর শেষাশেষি বাঁকীপুর আসিলেন। সেখানে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী সম্বন্ধে অতিশয় সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। বলিলেন,—"আমি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিতে পারি যে, মুসলমান যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতীতের এই দীর্ঘ শতাব্দীগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান এই দেশে একই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে বাস করিয়াছে।"

উত্তর-ভারতের আরো কয়েকটি অঞ্চলে এই হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী সম্পর্কে নিবেদিতা বক্তৃতা করিলেন। বারম্বার বিপুল জনতার সংস্পর্শে আসিয়া নিবেদিতা নিত্য-নূতন প্রেরণা লাভ করেন। গুরুর সমন্বয়মন্ত্র তাঁহার অজপা, তাই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ। "যে ঐক্যের বাণী আমি প্রচার করি, আমি অন্তরে সেই অখণ্ড ঐক্যকে অনুভব করিয়াছি বলিয়াই অন্যের হৃদয়ে সে অনুভূতি সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছি।" রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র উভয়েই তাই বলিতেন—নিবেদিতা যেন বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের প্রাণ-প্রতিমা। এই উদার দৃষ্টির মূলে ছিল তাঁহার সেই উপলব্ধি, যে-উপলব্ধি দ্বারা নিবেদিতা ভারতবর্ষকে দেখিতেন জ্যোতির্ময়ী সাবিত্রীরূপে। অখণ্ড ভারত—ইহাই ছিল নিবেদিতার ইষ্টমন্ত্র।

তাই না তিনি মুসলমানের দেওয়া এক ঝুড়ি কমলালেবু উপহার পাইয়া প্রফুল্লচিত্তে উহা গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

১৯০৪। ২৬শে ফেব্রুয়ারী। স্থান—কলিকাতার টাউন হল। হাজারের উপর শ্রোতা আসিয়াছে নিবেদিতার বক্তৃতা শুনিতে। বক্তৃতার বিষয়—হিন্দুধর্ম। সভাপতি—বিপিনচন্দ্র পাল। ২৭শে ফেব্রুয়ারীর ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত নিবেদিতার এই বক্তৃতার সারাংশ এইরূপ ঃ

"হিন্দুধর্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মই পরিবর্তন মুখে এতখানি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। বিভিন্ন যুগে যে সকল বিভিন্ন ধর্ম অথবা সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের সম্মুখে আসিয়াছে, হিন্দুধর্ম সেগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছে। আত্মরক্ষাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ নয়। অপরকেও আমরা এখন আমাদের ধর্মমতে আনিব। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতবাসী বিদেশীর নিকট হইতে আঘাতের পর আঘাত পাইয়াছে। সেই আঘাতেই হিন্দুধর্ম এখন আক্রমণশীল হইয়া উঠিয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সমাজ-সংস্কারকের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া একদল মানুষ দেবা-বিষ্টের মত দেখা দিয়াছে। তারপর আদর্শ-রাষ্ট্রের স্বপ্নে পাগল হইয়া মানুষ সেইদিকে ছুটিয়াছে। ধর্মজগতে আজ নূতন করিয়া সাড়া আসিয়াছে নানা ভাবে। ভারতবর্ষের মূল সমস্যা যদিও আধ্যাত্মিক, তথাপি 'ন্যাশনা-লিটি' কথাটির বিপুল ব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করিলে তবেই সিদ্ধি আসিবে। যে-সব আচার-বিচারে মানুষে-মানুষে ভেদ ঘটে, ধর্ম তাহার মধ্যে নাই। আজ সকলের আগে প্রয়োজন সঙ্ঘশক্তির। সেই ধর্মই ধর্ম যাহাতে জাতির প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠে।"

নিবেদিতার এই বক্তৃতা সম্পর্কে সেই সভার সভাপতি হিসাবে বিপিনচন্দ্র সোল্লাসে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"ইহা বক্তৃতা নয়, বিস্ফোরণ।"

তারপর সেই সভাতেই নিবেদিতা আহ্বান করিলেন ভারতের নারীসমাজকে। বলিলেন—"দেশের প্রত্যেকটি পুরুষের সব চেয়ে বড় কর্তব্য বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া। নারী-জাগরণেই

ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে বিদ্যুৎসঞ্চার হইবে, নূতন প্রভাত জাগিবে—আমি দিগন্তে তাহারই আভাস দেখিতে পাইতেছি।”

একদা বিবেকানন্দের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া যেমন নবীন ভারত কথা বলিয়াছিল, আজ তেমনি তাঁহারই মানস-কন্যা নিবেদিতার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া বিবেকানন্দ যেন কথা বলিলেন। ভারত সম্পর্কে বিবেকানন্দের আদর্শেরই প্রতিধ্বনি নিবেদিতা এবং ভারতের সমসাময়িক সমস্যাগুলি সম্পর্কে নিবেদিতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তাই বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ছায়াপাত হইত। তাই না তিনি একদা স্বামীজির অনুজ, বাংলার অন্যতম বিপ্লবী-সন্তান, ভূপেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন—“ভূপেন, তুমি কি মনে কর কোনো বিদেশীর কাছে ভারতীয় জীবন-ধারা ব্যাখ্যানে আমার মতন দ্বিতীয় একটা বিবেকানন্দ তোমরা পাবে ?”

এমনই উদ্দীপনাময়ী ছিল নিবেদিতার বক্তৃতা।

ভাষায় ছিল পরাবাণীর মন্ত্রবীর্য,
রসনায় বজ্রযোগিনীর শক্তি,
আর কণ্ঠে রণ-নির্ঘোষ।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—“আপনার কাজ কি ?”
—উত্তরে নিবেদিতা বলিতেন—“আমি শিক্ষয়িত্রী।”

শিক্ষয়িত্রীই বটে। আকৃতি পরুষ-কঠিন, প্রকৃতি করুণায় স্নিগ্ধ। এই লোকমাতা বাঙালিকে যে কত কি শিখাইয়া গিয়াছেন, এবং কত ভাবে শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য নির্ণয় করা সহজ নয়।

মুহূর্তের বিশ্রাম নাই নিবেদিতার।
কেবল কাজ, আর কাজ।
কেবল চলা আর চলা।

দেশের নর-নারীর মধ্যে গুরুর ভাব ছড়াইয়া দিতে হইবে—সেই তাঁহার ব্রত, সেই তাঁহার তপস্যা। গুরুর চিতাভস্মে নবযৌবনকান্তি সেই সুকুমার তনু ধূসরিত করিয়া লইয়া যে-নারী মঙ্গলময়ী, দীপ্তিময়ী মাতৃমূর্তিতে ত্যাগ, তপস্যা ও সেবার ভিতর দিয়া নিজের জীবন সার্থক করিয়া তুলিলেন, কঠোর তপস্যারতা উমার মতই যিনি কর্তব্যে অটল, সঙ্কল্পে স্থির, সেই নিবেদিতার চরিত্রের অপরিমেয় শক্তি, তাঁহার তপঃকৃচ্ছ্রতা—সবই যেন মহাকাব্যের গরিমা লইয়া আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

কলিকাতায় ফিরিয়াই নিবেদিতা শুনিলেন, সরকারের তীক্ষ্ণ ও বক্রদৃষ্টি যাঁহাদের উপর ছিল, সেই তালিকায় তাঁহার নামও উঠিয়াছে। পুলিশ তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। বাগবাজারে তাঁহার বাড়ির দরজা পর্যন্ত আসিয়া পুলিশ গোপনে খোঁজ-খবর লইতেছে। রাত্রির অন্ধকারে কাহারা এখানে আসে, কেন আসে, কখনই বা যায়, ইত্যাদি বিষয়ে পুলিশের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সীমা-পরিসীমা ছিলনা সেদিন ১৭নং বোসপাড়া লেনের বাড়িটিকে ঘিরিয়া।

বিপিনচন্দ্র আসেন—লেখা চাই নিউ ইণ্ডিয়ার জন্য।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আসেন—লেখা চাই প্রবাসীর জন্য।

মতিলাল আসেন—অমৃত বাজারের জন্য লেখা চাই।

র‍্যাটক্লিফ আসেন—ষ্টেটসম্যানের জন্য লেখা চাই।

সতীশচন্দ্র আসেন—ডন্-এর জন্য লেখা চাই।

পৃথ্বীশ রায় আসেন—নিউ ওয়ার্লডের জন্য লেখা চাই।

এ ছাড়া, ডাকযোগে অনুরোধ আসে মাদ্রাজের 'হিন্দু' কাগজ হইতে, টিলকের 'মহারাষ্ট্র' হইতে, বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' হইতে। আবার লণ্ডনের 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ' আছে, আমেরিকায় 'বোষ্টন হেরাল্ড'

আছে। সকল কাগজেই নিবেদিতাকে লিখিতে হয়। তাই তাঁহার মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। শুধু লেখা? সেইসঙ্গে বক্তৃতাও বড় কম দিতে হইত না। লেখনী ও রসনা সমান তালে চলিত।

এত যে লিখিতেন কিন্তু কখনো কাহারো ফরমাশী লেখা লিখিতেন না তিনি। এই প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন:

"নিবেদিতার রচনা-নৈপুণ্য এমনই উচ্চস্তরের ছিল যে, অতি সাধারণ বিষয়বস্তুও তাঁহার রচনার গুণে এক অনুপম সৌন্দর্য লইয়া ফুটিয়া উঠিত। তবে তিনি নিজের ইচ্ছামত লিখিতেন এবং যখন প্রেরণা বোধ করিতেন, কেবলমাত্র তখনই কলম ধরিতেন, তাহা নহিলে আদৌ লিখিতেন না। একবার বিদেশী একটি পত্রিকা তাহাদের নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিতে নিবেদিতাকে অনুরোধ করে এবং তাহার জন্য প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়, কিন্তু নিবেদিতা সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।"

লিখিতেন প্রধানত দুইটি কারণে—স্বামীজির অসমাপ্ত ভারতপ্রচার ব্রত আর এই স্কুল। এই স্কুলের দায় ও দায়িত্ব আজ সম্পূর্ণ তাঁহার একার। লিখিয়া সামান্য পারিশ্রমিক যাহা পাইয়া থাকেন, তাহার সবটাই স্কুলের উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন। কাহারো দাক্ষিণ্যের দুয়ারে হাত পাতিতেন না; গুরুর নিষেধ আছে। যেমন করিয়া হউক, এই আলোটুকু জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে।

সেদিন রামানন্দ বাবু আসিলেন।

প্রবাসীতে প্রতি মাসে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতির চিত্র বাহির হয়। নূতন ঢঙের শিল্প-রীতি। না বুঝাইয়া দিলে লোকে বুঝিবে না। সেই কঠিন কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় লইয়াছেন নিবেদিতা। সেইসব চিত্রের লিপিভাষ্য করেন তিনি। বাংলা প্রবাসীতে তাঁহার ইংরেজি লেখা বাহির হইত এবং মূল ইংরেজির সহিত একটি বাংলা অনুবাদও দেওয়া হইত। অনুবাদ করিতেন সম্পাদক স্বয়ং। সেইসব ছোট ছোট

রচনার ভিতর দিয়া ভারতের শিল্প-মহিমা সম্বন্ধে নিবেদিতার গভীর জ্ঞান ফুটিয়া উঠিত। এখানে নিবেদিতা যেন শিল্প-ভারতী।

কথায় কথায় রামানন্দ বাবুকে নিবেদিতা বলিলেন—"একখানা ইংরেজি মাসিক বাহির করুন। তাহা হইলে সারা ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে ভাব প্রচারের সুবিধা হয়।"

রামানন্দ। ইচ্ছা তো আছে।

নিবেদিতা। ইচ্ছা যখন আছে, তখন কাগজ নিশ্চয়ই হইবে। এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ-দুঃখের কথা লইয়া ব্যস্ত আছেন, একখানা ইংরেজি কাগজ হইলে, তখন আপনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশ করিতে পারিবেন। আমি জানি, বিধাতা আপনাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন। আমি আপনাকে লেখা দিয়া সাহায্য করিব।

রামানন্দ। আপনি কি করিয়া এত আগে হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করেন?

নিবেদিতা। সবই গুরুজীর আশীর্বাদ আর প্রেরণা। গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার মতই তাহাতে আলোক শক্তি দেন। আপনি এই যে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়াছেন, আমি দেখিতেছি, ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। আপনার মনীষা একদিন প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।

নিবেদিতার এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই। ১৯০৭ সালে যখন 'মডার্ণ রিভিয়ু' বাহির হইল তখন নিবেদিতার সে কী আনন্দ! আর এই 'মডার্ণ রিভিয়ু'ই পরবর্তীকালে রামানন্দবাবুকে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি আনিয়া দিয়াছিল।

রামানন্দ-নিবেদিতা প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচরিত-লেখিকা লিখিয়াছেন:

"ভগিনী নিবেদিতার সহিত রামানন্দ বাবুর বন্ধুত্ব ও কর্মক্ষেত্রে যোগ কলিকাতায় আসার পর আরো ঘনিষ্ঠ হয়। প্রায়ই দেখা যাইত প্রবাসী অফিস হইতে ছবি কিম্বা প্রবন্ধের প্রুফ লইয়া কেহ তাঁহার সেই বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে চলিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রবন্ধ কাহাকেও সংশোধন করিতে দিতেন না। ভগিনী নিবেদিতার নিকট যাঁহারা কাজ লইয়া যাইতেন, তাঁহাদেরও তিনি শুধু পত্রবাহক হিসাবে দেখিতেন না। রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের কতটা জ্ঞান, দেশের বিষয় তাঁহারা কিছু জানেন কিনা সব খোঁজ লইতেন। যদি দেখিতেন হিন্দুর ছেলে হইয়াও হিন্দুর মহাকাব্য সম্বন্ধে ইহারা তেমন কিছু জানেন না, তাহা হইলে ভগিনী নিবেদিতা চটিয়া যাইতেন। রামানন্দবাবু প্রায় নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এবং কখনো বা জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকে নিবেদিতার সহিত নানাবিধ আলোচনা করিতেন। ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর গৃহেও ইহাদের নানা প্রসঙ্গ হইত। বাঙালিদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা সবের মধ্যেই নিবেদিতা যে সৌন্দর্যের সন্ধান করিতেন ইহা তাঁহাদের কথোপকথন হইতে বুঝা যাইত। 'প্রবাসী'র প্রথম বৎসরেই অজন্তা গুহা বিষয়ে নিবেদিতা সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং ক্রমে অবনীন্দ্র প্রভৃতি অগ্রগামী শিল্পীদের চিত্রে কাগজ অলঙ্কৃত করিতে থাকেন। অজন্তা গুহার চৈত্য ও বিহারগুলির সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। একদিন পীড়িত রামানন্দবাবুকে তিনি দেখিতে আসিলেন। সুদীর্ঘ, শুভ্র পরিচ্ছদ ও বিলাতি জুতা পরিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। রোগীর ঘরের সামনে আসিয়াই জুতা জোড়া খুলিয়া রাখিলেন। য়ুরোপীয় মহিলাকে জুতা খুলিতে দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই নিবেদিতা ইংরেজিতে বলিলেন—"আমি জানি, জুতা খুলিতে হয়"।...তিনি "মডার্ণ রিভিয়ু'র জন্মকাল হইতেই (১৯০৭) লেখা দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে সম্পাদককে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তেমন সাহায্য সচরাচর কাহারও নিকট মিলে না। রামানন্দ বাবু বলিতেন যে, নিবেদিতা সাধারণ কথাবার্তার

সময় সম্পাদকের কাজের দোষত্রুটী যাহা দেখিতেন, তাহার কঠোর সমালোচনা করিতেন। সেই সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল না। নিবেদিতা প্রকৃতই তাঁহার ভগিনী ছিলেন এবং নিবেদিতার জীবনপথে যাঁহারা তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের কাছেই নিবেদিতা সত্যই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়াছিলেন। নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁহার।"

সেদিন বিপিনচন্দ্র পাল আসিলেন।

কথায় কথায় বলিলেন—"নিউ ইণ্ডিয়ায় একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?"

নিবেদিতা। হ্যাঁ, কাল রাত্রেই উহা আরম্ভ করিয়াছি, এই নিন। লণ্ডনে রমেশচন্দ্র দত্তের সহযোগিতায় ইহার সূত্রপাত। আপনার কাগজ কেমন চলিতেছে ?

বিপিনচন্দ্র। ভালই, তবে প্রেসের দেনা বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিপিনচন্দ্র চলিয়া গেলে নিবেদিতা বসিয়া বসিয়া বাংলার এই বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ, নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা রাজনৈতিক-দার্শনিকের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা ভাবিতে লাগিলেন। কী সব ক্ষণজন্মা পুরুষ এই বাংলাদেশে একই সময়ে আসিয়াছেন! প্রাণের আগুন তো ইঁহারাই জ্বালাইয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে সেই ১৯০০ সালের কথা মনে পড়িল। নিবেদিতা তখন আমেরিকায় মিসেস ওলি বুলের বাড়িতে। বিপিনচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেইখানেই।

এই প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"সেই সময়েই মিস্ নোবলের (ভগিনী নিবেদিতা) সঙ্গেও আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে অদ্ভুত পরিচয়। আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইলেই একটা ঝগড়া পাকাইয়া উঠিত অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঝগড়ার দরুণ উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে এক মুহূর্তের জন্যও বোধ হয় কোন বৈরিতার

লেশমাত্র জাগে নাই। এ সকল ঝগড়ার ফলে আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধারও কোন ব্যাঘাত কখনও জন্মে নাই। সেই প্রথম পরিচয়ের কথা মনে করিয়াই নিবেদিতার গোটা ছবিটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক, নিবেদিতা ইহা জানিতেন। আর, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁহার একটা গভীর অশ্রদ্ধা ছিল। নিবেদিতার স্বচ্ছচিত্তে কখনও কোন মনোভাব ঢাকা থাকিত না। সুতরাং সৌজন্যের খাতিরেও আমার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে তিনি তাঁহার অন্তরের অশ্রদ্ধা গোপন করিতে পারিলেন না। একেবারে সোজাসুজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্ম সমাজকে আক্রমণ করিলেন। বলিলেন,—'ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা, বিশেষতঃ মেয়েরা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িতেছেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি ব্রাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়াছেন ত?'

নিবেদিতা। হাঁ।

আমি। মিসেস পি. কে. রায়কে চেনেন?

নিবেদিতা। চিনি। অমন মেয়ে অতি অল্পই দেখিয়াছি।

আমি। মিসেস জে. সি. বোসকে চেনেন?

নিবেদিতা। মিসেস বোস রমণীর শিরোমণি।

আমি। এঁদের ছোট বোনকে জানেন?

নিবেদিতা। সী ইজ লাভ্‌লি।

আমি। শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়েকে দেখেছেন—মিসেস সরকার?

নিবেদিতা। হাঁ, দেখেছি। সী ইজ ভেরি গুড্‌।

আমি। আপনি বোধ হয় জানেন, এঁরা সকলেই ব্রাহ্ম মেয়ে।

এইখানেই প্রথম পালা শেষ হইল। পরদিন সন্ধ্যায় আমাদের উভয়ের সংগ্রামের তৃতীয় পালার অভিনয় হয়।...সেদিন মিসেস বুল বোষ্টনের স্কুল সমূহের শিক্ষয়িত্রীদিগকে তাঁহার বাটিতে চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই-তিনশত শিক্ষয়িত্রী এই উপলক্ষে মিসেস বুলের বাড়িতে সমবেত হন। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া আমি একটা ঘরে একপাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। দৈবদুর্বিপাকে সে ঘরে নিবেদিতা অনেকগুলি শিক্ষয়িত্রীর

নিকটে ভারতবর্ষের কথা কহিতেছিলেন। আমি নীরবে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। ক্রমে জাতিভেদের কথা উঠিল। নিবেদিতা জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় আমার উপর তাঁহার চোখ পড়িল। আমাকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন:—'ঐ মিঃ পাল বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানেন না এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি অপরিমিত নয়। মিঃ পালও জাতিভেদ মানেন না এবং সনাতন ধর্মের উপর তাহার আস্থা নাই।' তখন সকলের চোখ আমার উপরে পড়িল। এ অবস্থায় আমার নীরব থাকা অসম্ভব হইল। আমি কহিলাম—'জাতিভেদ সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের একটা ভুল ধারণা আছে। সেটা এই যে, এই জাতিভেদ আছে বলিয়াই ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না; এবং যতদিন এই জাতিভেদ উঠিয়া না যাইবে, ততদিন ভারতবর্ষের লোক এক জাতিতে পরিণত হইয়া আত্মশাসনের অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। এই কথাটা নিতান্তই ভুল। জাতিভেদ থাকা বা না থাকার উপরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কিছুতেই নির্ভর করে না। আমাদের দেশে জাতিভেদ আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রেণীভেদ সাঙ্ঘাতিক আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ড ও আমেরিকার শ্রেণীভেদ থাকা সত্ত্বেও যেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কোন সাঙ্ঘাতিক ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই, সেইরূপ ভারতে জাতিভেদ আছে বলিয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের কোন অন্তরায় নাই। কিন্তু অন্যদিকে একথা মানিতেই হইবে যে এই জাতিভেদ হিন্দু ভারতের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতিভেদ আছে বলিয়া আমরা অবাধে আমাদের মানুষ বলিয়া যে একটা অধিকার আছে, সেই অধিকার সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না।'

নিবেদিতা অমনি একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'একথা ঠিক নহে। আপনি ব্রাহ্ম বলিয়া হিন্দুধর্মের উপর আক্রমণ করিতেছেন।'

আমি কহিলাম—'হিন্দু শাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতর জাতির ধর্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।''' ইংরেজি শিক্ষা এই প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছে বলিয়াই আমরা আজ ব্রাহ্মণ না হইয়াও বেদ

পড়িতে পারিতেছি, বেদান্ত-ধর্মের আলোচনা করিতে পারিতেছি এবং ধর্ম প্রচার করিতে পারিতেছি। প্রচলিত শাস্ত্রের প্রাচীন প্রভাব যদি আজ থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের নিকটে ধর্ম-প্রচার করিবার অপরাধে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দের এবং আমার কণ্ঠে চারি আঙুল পরিমাণ গরম গলান সীসা ঢালিয়া দিয়া আমাদের এই অনধিকার চর্চার প্রায়শ্চিত্ত করাইত।” নিবেদিতা এই কথাতে একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন—'মিথ্যা কথা। স্বামীজিকে হিন্দুরা ধর্মগুরুর পদে বরণ করিয়া লইয়াছে।' আমি কহিলাম—'মিস্ নোবল, আপনি স্ত্রীলোক না হইলে এই অপমানের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিতাম। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুদিগের ধর্মগুরু নহেন। হিন্দু সমাজ তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করে নাই। তিনি রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির মতন একজন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক মাত্র।' নিবেদিতার কোমল প্রাণে এ আঘাত সহ্য হইল না। আমার কথায় তাঁর গুরুর অপমান হইয়াছে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মর্মাহত হইয়া নিবেদিতা নীরব হইয়া গেলেন।”

আর একদিনের ঘটনা। সেদিন আষাঢ়ের অপরাহ্ণে নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়ির একটি ঘরে বসিয়া আছেন বিপিনচন্দ্র ও নিবেদিতা। স্বদেশী কাপে করিয়া দুইজনে চা খাইতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশ নববর্ষার মেঘে ঢাকিয়া গেল। অমনি বিপিনচন্দ্র সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে, বর্ষার সেই শ্যাম সমারোহ নিবেদিতার মনের উপরও ছায়া ফেলিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ নিবেদিতার মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। প্রকৃতির সেই করাল-রুদ্র মূর্তি তাঁহারও মুখে-চোখে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে যে আর কেহ আছে, ইহা বিস্মৃত হইয়া নিবেদিতা নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। বসিয়া বসিয়া জানালার ভিতর দিয়া আকাশে নববর্ষার পুঞ্জীভূত মেঘের

শোভা দেখিতে লাগিলেন। ঝড় উঠিল। বিপিনচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, সেই উদ্দাম ঝটিকার বেগ নিবেদিতার সর্বদেহে যেন এক প্রবল শিহরণ জাগাইয়া তুলিয়াছে। তারপর সেই মেঘাবৃত আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমকাইল, বাজ ডাকিল, তখন নিবেদিতা নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—"কালী, কালী"। তাই বোধ হয় বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"নিবেদিতা সত্য সত্যই প্রকৃতির কোলের শিশু—যেমন সহজ তেমনি সরল।"

১৯০৪ অক্টোবর। স্থান—বুদ্ধগয়া।

নিবেদিতা বুদ্ধগয়া দেখিতে আসিলেন। সঙ্গে আছেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু, স্বামী সদানন্দ (গুপ্ত মহারাজ), ব্রহ্মচারী অমূল্য আর পাটনা হইতে আসিয়াছেন অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। ইতিপূর্বে নিবেদিতা সাঁচীর বৌদ্ধস্তূপ দেখিয়াছেন। সাঁচীর সরল ও অনাবিল ভাস্কর্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সাঁচীর সেই ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে নিবেদিতা বলিয়াছিলেন—"এই যে স্তূপাকার পাথরের ভগ্নাবশেষ, আমি শুধু ভাবিতেছি, যে কল্পনা ও শক্তি লইয়া একদিন এই সব স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল, ভারতবাসীর মধ্যে সেই শক্তি এখনও বিদ্যমান আছে।"

এইবার তিনি বুদ্ধগয়া দেখিতে আসিলেন। বুদ্ধগয়ায় পদার্পণ করিয়াই নিবেদিতার মনে পড়িল বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামীজির প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কথা। এই বুদ্ধকে বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া উপলব্ধি করিতেন। কতবার না স্বামীজি তাঁহার কাছে বুদ্ধ-চরিতের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। এই পুণ্য ভূমিতে তাই পদার্পণ করিয়াই একদিন নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রে নিবেদিতা একবার দূর অতীতকালের

দিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন—কত শত শতাব্দী হইয়া গিয়াছে একদা শাক্য রাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করিবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। তাই বোধ হয় স্বামীজি ভগবান বুদ্ধকে দেখিতেন মানব-মনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যাঁহার মধ্যে অতীতকালের মহৎ প্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ তাঁহারই নিকটে বলিতে পারিয়াছিল—বুদ্ধের শরণ কামনা করি। আপন মানব-মহিমায় দেদীপ্যমান সেই বুদ্ধদেবের স্মৃতিপূত এই বুদ্ধগয়ার মাটি নিবেদিতা ভক্তিভরে মাথায় তুলিয়া লইলেন। ক্ষণেকের জন্য অন্তরের মধ্যে তিনি যেন উপলব্ধি করিলেন—সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায় সার্থক সেই মহামানব আপনার মধ্যেই বিশ্ব-মানবের সত্যরূপ প্রকাশ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর এইখানকার বিল্ববৃক্ষের নির্জন অরণ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন। নিবেদিতার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া নীরব প্রার্থনা উঠিল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

বুদ্ধগয়ায় এই ভ্রমণ-প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন :—

"সন্ধ্যাকালে আমরা সকলেই বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া ধ্যান করিতাম। বুদ্ধদেব যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসিয়া আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষটি তাহারই বংশধর। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ইহার একটি শাখা সিংহলে লইয়া গিয়া সেখানকার রাজা তথায় প্রোথিত করেন। অল্প কিছু দূরে একখানি গোলাকার প্রস্তরখণ্ড ছিল, তাহার উপরে একটি বজ্র খোদিত ছিল। কথিত আছে, এই বজ্রটি স্বয়ং ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে দিয়াছিলেন। এই বজ্রটি দেখিয়া নিবেদিতা বলিলেন, ইহাকে ভারতের জাতীয় চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করা কর্তব্য। আমরা সকলে ইহার অর্থ জানিতে চাহিলে নিবেদিতা বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, যখন কেহ সমগ্র

মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেন, তখন তিনি এই বজ্রের মতই শক্তিশালী হইয়া দেবতাদের নির্দিষ্ট কার্য করেন। এই জন্যই বোধ হয় নিবেদিতা এই বজ্রচিহ্নকে তাঁহার পুস্তকের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই একই কারণে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের শীর্ষদেশে জগদীশচন্দ্র এই বজ্রচিহ্ন স্থাপন করেন। সন্ধ্যাবেলা নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ এবং আমরা একত্রে বাহির হইতাম। সুজাতা বুদ্ধদেবকে সোনার থালায় করিয়া পায়েস খাইতে দিয়াছিলেন। সুজাতার পায়েস ভক্ষণ করিয়াই বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেন। সুজাতার বাড়ি ছিল উরুবেলা গ্রামে। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা একটি গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। ঐ গ্রামটিকে এখন উর্বিল বলা হয়। নিবেদিতা বলিলেন, এই গ্রামেই সুজাতা বাস করিতেন। উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে নিবেদিতা সেই গ্রামের কিছু মৃত্তিকা তুলিয়া লইলেন, এবং বলিলেন, সুজাতার গ্রামের মৃত্তিকা পবিত্র। নিবেদিতা ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং এই তীর্থগুলির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

"আমরা যে মোহান্তের বাড়ি উঠিয়াছিলাম, সেইখানে প্রতিদিন নিবেদিতা আমাদের সকলকে ওয়ারেন-এর বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বই হইতে এবং এড্‌উইন আর্ণল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে আমরা সকলে যখন বোধিবৃক্ষ তলে গিয়া বসিলাম, তখন লক্ষ্য করিলাম একটি আশ্চর্য-চরিত্রের মানুষকে। তাহার নাম ফুজী। একজন দরিদ্র জাপানী সে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কষ্ট করিয়া পয়সা জমাইয়াছে তাহার জীবনের একটি স্বপ্ন চরিতার্থ করিবার জন্য। ভগবান তথাগত যে স্থানটিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, ফুজীর ইচ্ছা, সেই পুণ্য তীর্থস্থানটি সে একবার দর্শন করিবে। অবশেষে সে এইখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং যাত্রী-নিবাসের একটি ঘরে অতি সামান্য ভাবে সে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফুজী আসিয়া বোধিবৃক্ষ তলে বসিয়া এই স্তোত্রটি পাঠ করিত :

নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়
নমো নমো গোতমচন্দিমায়,
নমো নমোনন্তগুণণ্ণবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়।

সন্ধ্যার সেই নিস্তব্ধ ও শান্ত মুহূর্তে জাপানী কণ্ঠে এই সংস্কৃত স্তোত্রটি যেন মন্দিরের সুমধুর ঘণ্টাধ্বনির মত শুনাইত। নিবেদিতা সযত্নে ফুজীকে প্রতিদিন আহার্য দিতেন। ফুজীর কণ্ঠে উচ্চারিত এই স্তোত্রটি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। তাঁহার 'নটীর পূজায়' শ্রীমতীর প্রার্থনায় কবি এই ফুজীর স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।"

তারপর নিবেদিতা রাজগৃহে আসিলেন। বুদ্ধগয়া হইতে রাজগৃহ মাত্র ৫০ মাইল পথ। সঙ্গে সকলেই আছেন—রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু, যদুনাথ সরকার, সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্য। ভারত ইতিহাসের এই অতি প্রাচীন স্থানটি দেখিয়া নিবেদিতা বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ইহার পাহাড়, ঝর্ণা, শস্যক্ষেত্র, ইহার আকাশ বাতাস তাঁহাকে সেই সুদূর অতীতে লইয়া গেল। রাজগৃহের সেই গৌরবময় অতীতকে নিবেদিতা ধ্যানস্থ হইয়া অন্তরে অনুভব করিলেন। এই রাজগৃহ সম্বন্ধে নিবেদিতার রচনা অতি সুন্দর। তাঁহার অন্যতম পুস্তক, 'ইতিহাসের পদধ্বনি' বা 'ফুটফলস্ অব্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি'-তে রাজগৃহ সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"বুদ্ধদেব হইতেই রাজগৃহের ইতিহাস আরম্ভ। তখন বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকাল। খৃঃ পূঃ ৫৯০ সালে এই স্থানটি ভারতের ইতিহাসে অতিশয় জমজমাট ছিল। সেই সময় ব্যাবিলন, মিশর, ফিনিসিয়া প্রভৃতি স্থানগুলি ইতিহাসে জীবন্ত ছিল। বুদ্ধদেব এই সময়ের কোন এক প্রভাতে অথবা সন্ধ্যায় এই পথ দিয়া আসিয়াছিলেন। একটি খোঁড়া ছাগশিশুকে কাঁধে লইয়া তিনি রাজপ্রাসাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। তাঁহার পশ্চাতে এক হাজার ছাগ বলির জন্য রাজপ্রাসাদের দিকে যাইতেছিল। অনুকম্পায় বুদ্ধের হৃদয় ভাঙিয়া যাইতেছিল।

"যে প্রবেশদ্বার দিয়া বুদ্ধ নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বারটি আবিষ্কার করিলাম। পরে অম্বপালির আম্রকাননটিও আবিষ্কার করিলাম। এই ধ্বংস-

স্তূপের মধ্যে আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এখনও যেন রাজগৃহের গুহাগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। রাজগৃহের বৌদ্ধযুগের মধ্য দিয়া মহাভারতের যুগে পৌঁছিলাম।"

ফিরিবার পথে বাঁকীপুরে নামিয়া নিবেদিতা সেখানকার খোদাবক্স লাইব্রেরীটি দেখিলেন। এই প্রসঙ্গে স্যর যদুনাথ লিখিয়াছেন:

"লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ ভগিনী নিবেদিতাকে সম্রাট শাহজাহানের স্বাক্ষরিত একখানি পারস্যদেশীয় পাণ্ডুলিপি দেখাইলেন। নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা তিনি একটিবার স্পর্শ করিতে পারেন কিনা। অনুমতি মিলিল। তিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত শাহজাহানের স্বাক্ষরের উপর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তালু রাখিলেন এবং দুই চক্ষু বুঁজিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল, তিনি যেন দূর-অতীতকে এই নিকট-বর্তমানের সহিত তাঁহার মনের দ্বারা সংযুক্ত করিতে চাহিলেন। নিবেদিতার কাছে ভারতের অতীতকালের কোনো কিছুই সামান্য বলিয়া মনে হইত না। নালন্দার একটি ইষ্টকখণ্ড কি সারনাথের একটি প্রস্তরখণ্ড তাঁহার নিকট কখনো তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত না। এই দুইটি জিনিসই তাঁহার ঘরে শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত ছিল।"

নালন্দা ও সারনাথ দেখিয়া নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরিলেন। সেখানে তখন শত শত কার্য তাঁহার অঙ্গুলীসঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

॥ সতেরো ॥

মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনই এই পুরাতন প্রাচীন দেশের কোলে বাস করিবার সময় একটি জীবনপূর্ণ, স্নেহ ও শ্রদ্ধামণ্ডিত মৃদু উত্তাপ চারিদিক হইতে নিবেদিতাকে সর্বদা ঘিরিয়া থাকিত। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হইলেও, সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর স্নেহ হইতে তিনি কোনো দিন বঞ্চিত হন নাই। সারদাদেবী সর্বদাই নিবেদিতার খোঁজ-খবর লইতেন। বলিতেন—"ও আর জন্মে হিন্দু ছিল। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই ওদেশে জন্মেছে।" সারদাদেবীর এক জীবন-চরিতকার নিবেদিতা ও শ্রীমা-র প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

"বিদেশিনী ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রীমা আপন কন্যার ন্যায় আদর-যত্ন করিতেন এবং তিনি আসিলে পার্শ্বে বসাইয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতেন। উভয়ে উভয়ের ভাষা জানিতেন না; কিন্তু তবু ভাবের আদান-প্রদানে কোন অসুবিধা হইত না; কারণ স্নেহের প্রকাশ শুধু মুখের কথার উপর নির্ভর করে না। একদিন নিবেদিতা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলে, শ্রীমা কুশল প্রশ্নের পর পশমের তৈয়ারী একখানি ছোট পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন 'আমি এখানি তোমার জন্যে করেছি।' নিবেদিতা উহা পাইয়া একবার মাথায় ঠেকান, একবার বুকে রাখেন, আর বলেন, 'কি সুন্দর, কি চমৎকার!' শ্রীমা দেখিয়া বলেন, 'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ? আহা কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে কি ভক্তিই করে! নরেন এদেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কাজ করছে।

কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!' ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমাকে জার্মান সিলভাবেরর একটি কৌটা দিয়াছিলেন; শ্রীমা উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কেশ রাখিতেন। তিনি বলিতেন, 'পুজোর সময় কৌটোটি দেখলেই নিবেদিতাকে মনে পড়ে।'

একদিন সায়াহ্নের কথা। সঙ্ঘজননী তখন কলিকাতায় বাগবাজারের বাড়িতে থাকেন। নিবেদিতা প্রণাম করিতে আসিলেন। শ্রীমা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। তারপর শ্রীমা নিবেদিতাকে বলিলেন—"আমি তোমাকে স্বপ্নে গেরুয়া-পরা অবস্থায় দেখেছি। তোমার তো সম্পূর্ণ দীক্ষা হয়নি। আমার কাছে দীক্ষা নেবে?"

নিবেদিতা। নতুন করে আর গেরুয়া পরব না। স্বামীজি আমাকে সন্ন্যাস দিয়ে গেছেন। তিনি আমাকে শিবমন্ত্র দিয়ে গেছেন। আমি সেই ভাবেই চলব।

সারদা। কী অসাধারণ তোমার গুরুভক্তি। ধন্য মেয়ে তুমি।

সেইদিনের এই ঘটনায় নিবেদিতার গুরুভক্তি ও চরিত্রের দৃঢ়তা দুই-ই প্রকাশ পাইল। নিবেদিতার চরিত্র হইতে সুদূরতম কোনো জিনিস যদি থাকে তাহা হইল ভাবাবেগ। জীবনের কোনো অবস্থাতেই তিনি কখনো ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হন নাই। এমনই অনমনীয় ছিল তাঁহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই নিবেদিতা নিবেদিতা।

সঙ্ঘজননী সারদাদেবীকে নিবেদিতা যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, তেমনই শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন স্বামীজির গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরীকে। বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের উদ্যোগ পর্বেই স্বামীজির অনুজ, ভুপেন্দ্রনাথের সহিত নিবেদিতার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়।

বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার কালে ভূপেন্দ্রনাথ নিবেদিতার হাত হইতে তিনখানি গ্রন্থ উপহারস্বরূপ পাইয়াছিলেন—ক্রোপোটকিনের লেখা 'বিপ্লবীর জীবন-স্মৃতি', 'রাশিয়া এবং ফরাসীর কারাগারে' এবং ম্যাট্‌সিনির বক্তৃতাবলী। এই সময়ে ভূপেন্দ্রনাথ একদিন নিবেদিতাকে যখন বলিলেন—"মা-কে তো অনেক দিন দেখেন নি। মা প্রায়ই আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন।"

নিবেদিতা হাসিয়া বলিলেন—"দেখছ তো দিনরাত কত কাজ, নিঃশ্বাস ফেলতে সময় পাইনে। চলো, আজই, এখনি যাবো।" তারপর ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতা চলিলেন, শিমলার দত্ত বাড়িতে। নিবেদিতা আসিয়া প্রণাম করিয়া ভুবনেশ্বরীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বসিয়া বসিয়া নিস্তব্ধ হৃদয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নিবেদিতা ভাবিতে লাগিলেন—ভুবনবিজয়ী পুত্র বিবেকানন্দের মা ইনি। কী রত্নগর্ভা এই নারী!"

মেমসাহেব দেখিয়া বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া কৌতূহল ভরে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। নিবেদিতা যখনই বাহিরে যাইতেন তখনই তাঁহার হাতে একটি থলি থাকিত। থলিটির মধ্যে সব সময় থাকিত চকোলেট আর লজেন্স। সেদিনও থলির ভিতর হইতে চকোলেট আর লজেন্স বাহির করিয়া প্রত্যেক ছেলেমেয়ের হাতে পরম স্নেহভরে দিলেন। বিদেশিনীর এই রকম মমতাময়ী মূর্তি দেখিয়া দত্ত-বাড়ির পুরস্ত্রীদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এখন হইতে নিবেদিতা সময় পাইলেই ভুবনেশ্বরীকে নিয়মিত দেখিতে আসিতেন। বিবেকানন্দের মা বলিয়া নহে, ভূপেন্দ্রনাথের মত বিপ্লবীকেও তিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া নিবেদিতা তাঁহাকে চিরকাল বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

১৯০৪। নভেম্বর মাস। এলবার্ট হলে আজ নিবেদিতার বক্তৃতা। বিষয়—"মাতৃরূপা কালী।" প্রথমে কথা ছিল বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ এন. এন. ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কিন্তু বক্তৃতার দিন কি কারণে অধ্যক্ষ ঘোষ অসম্মত হইলেন। নিবেদিতার বক্তৃতা—শিক্ষিত বাঙালি শ্রোতার ভীড় জমিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ে নিবেদিতা আসিয়া শুনিলেন সভাপতি আসিবেন না। বিনা সভাপতিতেই তিনি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার আরম্ভেই তিনি সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"আজ যাঁহার সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁহার অসম্মতি জানাইয়াছেন। সভাপতি না আসুন, সভা বন্ধ হইতে পারে না। তাছাড়া, সভায় সভাপতি বড় নয়, বক্তাও বড় নয়, বক্তৃতার বিষয়ই বড়।" সেদিনের বক্তৃতায় নিবেদিতা রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের মাতৃসাধনার মর্ম কথা যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অনেক কালীভক্ত সাধকও সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে নিবেদিতার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। কঠিন বিষয়ের এমন প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ তাঁহারা কখনো শোনেন নাই।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বৎসর, ১৯০৪ সাল শেষ হইয়া ১৯০৫ সাল আরম্ভ হইল। ১৯০০ হইতে ১৯০৪—এই পাঁচ বৎসর বাংলার জাতীয় জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ। এই পাঁচ বৎসরে বাংলাদেশ যেন এক শতাব্দীর পথ অতিক্রম করিয়াছিল।

সকলের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাইয়া ১৯০৫-এর ২০শে জুলাই ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, পার্লিয়ামেণ্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। বাঙালির সমস্ত প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল। হাজার হাজার সভা আর ভারত-সচিবের নিকট সুরেন্দ্র-

নাথের মুসাবিদা-করা আশী হাজার লোকের স্বাক্ষর-সম্বলিত আবেদন—সবই ব্যর্থ হইল। শীঘ্রই ইহাকে আইন করিয়া ঘোষণা করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইল। স্বদেশী আন্দোলনের এই প্রজ্জ্বলিত পরিবেশে নিবেদিতাকে আমরা দেখিতে পাই একেবারে রণ-রঙ্গিণী মূর্তিতে। সে-বিপ্লব তরঙ্গে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাঁপ দিলেন—তাঁহার যৌবনের অগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার চরণে যেন ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাজিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসিনী রুদ্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

শান্ত তাপসী হইলেন সিংহবাহিনী রণচণ্ডী।

বাঙলার জলস্থল ও জনপদ কাঁপাইয়া একসঙ্গে উঠিল ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার। মেঘের গর্জন। জলধির কল্লোল। তাহারই মাঝখানে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখারূপে দাঁড়াইয়া নিবেদিতা আহ্বান করিলেন বাঙালি সন্তানকে। তাহাদের ডাকিয়া বুঝাইয়া দিলেন—স্বদেশী কি। বলিলেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ—এই স্বদেশীও ঠিক তাই।" বলিলেন—"স্বদেশী মানে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ, রাজসরকারের সঙ্গে একটি অসহযোগ চেষ্টা। স্বদেশী তোমার কাছে চায় প্রাত্যহিক জীবনে বীর্যের সাধনা। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হইতে হইবে আমাদের। 'স্বদেশী' তোমার জীবন-মরণ সংগ্রাম। কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা আর অসম্ভব ত্যাগ স্বীকারের পথ দিয়া চলিতে হইবে।"

এইভাবেই সেদিন নিবেদিতা বাংলার জননেতাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বদেশী আন্দোলনে শুধু বক্তার অংশই গ্রহণ করেন নাই, অর্থনৈতিক ব্যাপারে হিন্দুকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা অনুসারে একটি আন্দোলনও আরম্ভ করিয়া

দিয়াছিলেন তিনি। পরাধীন জাতির পক্ষে এমনি একটি পরিকল্পনারই একান্ত প্রয়োজন ছিল সেদিন। দেখিতে দেখিতে বিক্ষোভের তরঙ্গ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বন্যার জলের মত খরবেগে স্বদেশীর বেগ পরিব্যাপ্ত হইল শহর হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে জনপদে।

এই সময় নিবেদিতার তিলমাত্র বিশ্রাম ছিল না। 'ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু'-তে লিখিলেন—"স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের জন্য মরণ-পণ করিতে হইবে। মাত্র মনোবল সহায় করিয়া এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। দেশবাসীর স্বজাতি সম্বন্ধে যে ন্যায়বুদ্ধি আজ জাগ্রত হইয়াছে এই স্বদেশী আন্দোলন তাহারই একটি প্রতীক।" এমনি ভাবেই সেদিন নিবেদিতা এই নবজাগরণের মুখে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিলেন। নিবেদিতার এক চরিতকার তাই লিখিয়াছেন: "যেমন চালচিত্রের উপর দুর্গা প্রতিমা, তেমনি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকার উপর ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। বাঙালির এই স্বদেশী যুগের সহিত ভগিনী নিবেদিতার জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নিবেদিতার জীবন-ইতিহাস বাদ দিয়া স্বদেশী যুগের ইতিহাস লেখা যায় না।"

ইতিপূর্বে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া অরবিন্দের নির্দেশে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং "নিবেদিতা তাহাতে ঘর্মাক্ত কলেবরে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন;" তরুণ বিপ্লবীদের শিক্ষা দিবার মহড়া পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। নিবেদিতা তাঁহার লাইব্রেরীর প্রায় দুই শত বই গুপ্ত সমিতিকে স্বেচ্ছায় দান করিয়াছেন—সবই আয়ার্ল্যাণ্ড, ফরাসী এবং রাশিয়ার বিপ্লব-চেষ্টার ইতিহাস-সংক্রান্ত বই। সেসব বইয়ের অধিকাংশই ভারতবর্ষে সেদিন দুর্লভ ছিল। ছেলেরা উৎসাহের সহিত সেগুলি পড়ে। যখন বুঝিতে না পারে, নিবেদিতার কাছে

Sunday Dec. 11. 1910. Cambridge. Mass.

Beloved Mother — This morning, early, I went to Church — to pray for Sara. All the people there were thinking of Mary, the Mother of Jesus — and suddenly I thought of you. Your dear face, your loving look, your white Sari, your bracelets. It was all there. And it seemed to me that yours was the Presence that would soothe & bless poor S. Sara's sickroom. And — do you know? — I thought I had been very foolish to sit in your room, at the Evening Service to Sri Ramakrishna, trying to meditate. Why did I not understand that it was quite enough to be a little child, at your dear feet? Dear Mother! You are full of love! And it is not a flushed & violent

love, like ours, & like[2] the world's — but a gentle peace, that brings GOD to everyone, & wishes ill to none. It is a golden radiance — full of play. What a blessed Sunday that was, a few months ago, when I ran in to you, the last thing before I went on the Ganges, & ran back to you for a moment, as soon as I came back! I felt such a wonderful freedom, in the blessing you gave me. And your blame too! Dearest Mother — I wish we could send you a wonderful hymn, or a prayer. But somehow even that would seem too loud, too full of noise! Surely you are the most wonderful thing of GOD — Sri Ramakrishna's own Chalice of His

Love for the World[3] — a token left with His children, in these lonely days, and we should be very still & quiet before you — except indeed for a little fun! Surely the "wonderful things of GOD" are all quiet — stealing unnoticed into our lives — the air & the sunlight & the sweetness of gardens & of the Ganges — These are the silent things, that are like you!

Do send to poor S. Sara the mantle of your peace. Isn't your thought, now, then, of the high ~~peace~~ station that within knows no hate — Isn't that sweet benediction that trembles in GOD, like the dewdrop on the lotus-leaf, & touches not the world — Ever, my darling Mother, Your foolish Khooki, Nivedita.

সারদাদেবীকে লেখা নিবেদিতার চিঠি। এডিনবরা হইতে ১৯১০ সালের নভেম্বরে লিখিত।

আসে, তিনি তাহাদের বুঝাইয়া দেন। বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িটি সেদিন এইভাবে সন্ত্রাসবাদীদের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। নিবেদিতা সেই তরুণ ছেলেদের যে কী ভালই বাসিতেন! যখনি তাহারা তাঁহার কাছে আসিত, নিবেদিতা তখনি তাহাদের কর্ণে বিবেকানন্দের সেই প্রাণবাণী উচ্চারণ করিতেন: "তোমার দেবতা আজ চায় তোমার জীবন বলি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সাম্‌নে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা সে তোমার জননী জন্মভূমি।" নিবেদিতার প্রভাবে পড়িয়া সেদিন অনেক তরুণ বিপ্লবী কর্মযোগকেই জীবনের আদর্শ করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন:

"ম্যাটসিনির আত্মচরিতের প্রথম খণ্ড, যাহা ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে দিয়াছিলেন, তরুণ বিপ্লবীদিগের নিকট বাইবেল-স্বরূপ ছিল। বিপ্লবাত্মক আরো শতাধিক পুস্তক তিনি বাংলার বিপ্লব সমিতিকে দান করিয়াছিলেন। সেই সব বই সারা দেশের মধ্যে ঘুরিত। ম্যাটসিনির আত্মচরিতে 'গরিলা যুদ্ধের' পরিকল্পনা ছিল। পরবর্তী কালে আলিপুর বোমার মামলার সময়ে পুলিশ নিবেদিতার দেওয়া এই সব নিষিদ্ধ পুস্তক বাংলার নানাস্থান হইতে খানাতল্লাসী করিয়া উদ্ধার করিয়াছিল। নিবেদিতা বলিতেন—'একে একে আমার প্রিয় বইগুলি আত্মপ্রকাশ করিতেছে'।"

সেদিন স্বদেশী শিল্প-প্রচেষ্টার পিছনে নিবেদিতার যে আপ্রাণ চেষ্টা ও উৎসাহ ছিল সে-ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে পণ্য উৎপাদনের ধূম লাগিয়া গেল। দেশলাই, সাবান, কাগজ, কালি হইতে আরম্ভ করিয়া মাটির বাসন-পত্র জিনিস—এই সব তৈরী হইতে লাগিল। চরকার ঘর্ঘর শব্দে বাংলার পল্লীর অন্তঃপুর মুখরিত হইয়া উঠিল। বহু ভদ্রঘরের শিক্ষিত বাঙালি সন্তান স্বেচ্ছায় তাঁতী হইয়া বাড়ির পিছনে তাঁতঘর বসাইল।

ম্যাঞ্চেষ্টারের সূক্ষ্ম ধুতি-শাড়ির পরিবর্তে মোটা খদ্দর প্রচলিত হইল। কালীঘাটের মন্দিরে যাইয়া সহস্র সহস্র লোক শপথ লইল, "স্বদেশী ভিন্ন কিনিব না।" দোকানে দোকানে রকমারি দেশীয় পণ্যসম্ভার দেখা দিতে লাগিল। এই শহরের একটি অঞ্চলে নিবেদিতা ডন্ সোসাইটির ছেলেদের লইয়া একটি বিক্রয়কেন্দ্র খুলিলেন। দেখিতে দেখিতে এই রকম তিনটি দোকান দাঁড়াইয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন:

"বাজারের দোকান-পসারের মধ্যে কোনো বিলাতি জিনিস দেখিলেই নিবেদিতার রাগ হইত। অথচ সাদাসিধা গড়নের এ-দেশী তৈজসপত্র—মাটির খুরি কি সুগঠন একটি প্রদীপ চোখে পড়িলেই যেন মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। দেশের লোককে দেশীয় পণ্যদ্রব্যের প্রতি সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার বর্ণনাগুণে সামান্য জিনিসের রেখাশিল্প লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, রুচিবোধের পারিপাট্য জন্মাইত। বাঙালি দেশের জিনিসে যে-সৌন্দর্য দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, নিবেদিতার রসজ্ঞান আবার তাহা তাহাদের কাছে ফিরাইয়া আনিল।"

তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে নিবেদিতা অরবিন্দের অনুজ বারীন ঘোষকে শহর ও পল্লীগ্রামের বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। একদিন বারীনের হাতে একটি পয়সাও নাই। অমনি তিনি ছুটিলেন বাগবাজারে। নিবেদিতার পরামর্শ চাই। সব কথা শুনিয়া নিবেদিতা বলিলেন—"ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" নিবেদিতা তখন একটি সাহায্য তহবিল খুলিলেন। নিবেদিতা কাজ করিতেন শহরে, রবীন্দ্রনাথ গ্রামাঞ্চলে। এইভাবে স্বদেশীর প্রথম যুগে শিল্প-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নিবেদিতা আর রবীন্দ্রনাথ একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। শিল্প-প্রচেষ্টায় নিবেদিতার উদ্যম কিন্তু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না। একদল ছেলেকে বিদেশে যথারীতি

শিল্প-শিক্ষার ট্রেনিং লইবার জন্য নিবেদিতা একটি পরিকল্পনা করিলেন। . সে-পরিকল্পনা সফল হইল। তাঁহার সেই পরিকল্পনায় সেদিন অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন বাংলার দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তাঁহার সহিত নিবেদিতার প্রথম পরিচয় হয় কলিকাতার সেই প্লেগের সময়। নিবেদিতার অনুরোধেই সেদিন মহারাজা তাঁহার শ্যামবাজারের বসতবাড়ি সেবার কাজে সাময়িক ভাবে দান করেন। নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়া ছেলেরা যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহারা যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, নিবেদিতা সেইমত ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে, বাংলার অনেকগুলি সমৃদ্ধ শিল্প-প্রচেষ্টার মূলে ছিল ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণা এবং তাঁহারই আর্থিক সাহায্য। এই অর্থ তিনি বিদেশ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সেদিন নিবেদিতা যেন মূর্তিমতী ভারতলক্ষ্মী হইয়া সকলের দ্বারে দ্বারে ভিখারিণীর বেশে ফিরিয়াছিলেন। বন্ধ দ্বারে সবলে করাঘাত করিয়া বাঙালিকে স্বদেশীর দীক্ষা দিয়াছেন। কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে আর সকলের সঙ্গে স্বদেশী চরকা, টেকো, খদ্দর, সাবান, পেনসিল প্রভৃতি ফিরি করিতে পর্যন্ত তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। নিরভিমান হৃদয়ে তিনি দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করিয়াছেন, কবে বাঙালি মনে-প্রাণে স্বদেশী হইয়া উঠিবে, কবে বাঙালি তাঁহার গুরুর সেই প্রাণবাণী—"তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা তোমার জননী জন্মভূমি"—শিল্পপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া সফল করিয়া তুলিবে। তাই মনে হয়, সেদিন নিবেদিতা না থাকিলে স্বদেশী শিল্প-প্রচেষ্টা এতখানি সার্থক হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।

•

দিবারাত্র এত পরিশ্রম সহ্য হইল না। পরিশ্রমের তুলনায় অবসর ও আহার্য দুই-ই ছিল অত্যন্ত পরিমিত। নিবেদিতার শরীর

ভাঙিয়া পড়িল। ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে হঠাৎ তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিল—টাইফয়েড। প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিল। নিবেদিতার অসুখের সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, গোখ্‌লে আর সারদা দেবী। ত্রিশ দিন ধরিয়া সমান জ্বর। জীবনের আশা নাই। ভগিনী ক্রিষ্টিন উদ্বিগ্ন অন্তরে শুশ্রূষা করিতেছেন। গোখ্‌লে মাথায় আইসব্যাগ ধরিয়া বসিয়া আছেন। নিবেদিতার উপযুক্ত চিকিৎসার যাহাতে কোনো ত্রুটি না হয় সেজন্য জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বাগবাজারের সংকীর্ণ বাড়ি হইতে নিবেদিতাকে জগদীশচন্দ্রের বাড়ির সন্নিকটে একটি আলোবাতাস-যুক্ত বাড়িতে আনা হইল। সাহেব-ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসায় নিবেদিতার ঘোর আপত্তি। তখন ডাক্তার নীলরতন সরকার তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। দুই-দুইবার মনে হইয়াছিল যেন তিনি আর বাঁচিবেন না। কিন্তু অবশেষে তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য বসু-দম্পতী নিবেদিতাকে দার্জিলিঙ্‌ লইয়া গেলেন। এইখানে আরোগ্য-শয্যায় বসিয়া নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের একখানি গ্রন্থ লিখিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

নিবেদিতা যখন প্রাণ-সংশয় পীড়ায় আক্রান্ত, তখন ৭ই আগষ্ট, কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ, 'বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ' সংকল্প গৃহীত হইল। সেই স্মরণীয় সভার সভাপতি ছিলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে 'বয়কট' জন্মলাভ করিল। সভায় এত জনসমাবেশ হইয়াছিল যে, একটি সভা ভাঙিয়া চারিটি সভা করিতে হয়। সেদিন এই বয়কটের প্রস্তাব আসিয়াছিল বরোদা হইতে। অরবিন্দই

ইহার রচয়িতা। রাজনীতিতে 'বয়কট' অরবিন্দের প্রতিভারই মৌলিক দান। সেদিনকার সভায় এই কথা কেহই জানিতে পারে নাই। কারণ, এই বয়কট প্রস্তাব অরবিন্দ নেপথ্য হইতে পাঠাইয়াছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অসমসাহসিক পুরোধা সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে। দূর হইতেই অরবিন্দ বাংলার হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতেছিলেন এবং নেপথ্য হইতে বঙ্গভঙ্গের প্রতিকার হিসাবেই তিনি বাংলার জননায়কদের সম্মুখে এই 'বয়কট' প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন সেদিন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বাঙালি শপথ গ্রহণ করিল: "যদি বঙ্গভঙ্গ আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে বাঙালি বিলাতি কাপড়, বিলাতি জিনিস বর্জন করিবে।" বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের এই স্মরণীয় তারিখটি আরো একটি কারণে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। দ্বি-খণ্ডিত বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল নর-নারীকে এক ঐক্যের মন্ত্রে, মিলনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে এইদিন যে-ঐতিহাসিক বাণী উপহার দিয়াছিলেন, তাহা এই:

"উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্যন্ত নদীজাল-জড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রান্ত হইতে চিত্তকে প্রসারিত কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণ ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজারী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও।"

কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিতা শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—"এমন রচনা, এমন কল্পনাশক্তি দুর্লভ।"

পরে নিবেদিতা ইংরেজিতে উহা অনুবাদ করেন এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা রঙে ও রেখায় রবীন্দ্রনাথের ঐ উদ্দীপনাময়ী বাণীটি রূপান্তরিত করাইয়া বিদ্যালয়ের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখেন।

২২শে সেপ্টেম্বর টাউন হলে আর একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হইল। বাঙালি পূর্বসঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিবার প্রস্তাব পুনরায় গ্রহণ করিল। তারপর ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাখীবন্ধন উৎসব। বাংলার কবির কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল জাগরণের এক নূতন মাঙ্গলিক। বেদনার প্রতিঘাতে মিলনের রাখীসূত্র হস্তে বাঁধিয়া বাঙালি শপথ গ্রহণ করিল: ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।

সেই উত্তাল পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন:

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।

নিবেদিতার সমস্ত মনপ্রাণ পড়িয়াছিল কলিকাতায়। আরোগ্য লাভ করিয়া, শরীরে বল পাইয়া তিনি এইবার কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন।

১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন প্রবর্তিত হইবার পর কলিকাতায় যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত আনন্দমোহন বসু মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দার্জিলিঙের এক

সভায় নিবেদিতা বলিতেছিলেন: "যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ইংরেজকে এই বঙ্গভঙ্গ আইন উঠাইয়া লইতে বাধ্য না করে, ততদিন আমরা সংগ্রাম করিয়া যাইব।" সেই সভায় দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন এক প্রিয়দর্শন বাঙালি যুবক; স্বদেশ-প্রেমে তাঁহারও তরুণ হৃদয় পরিপূর্ণ। তিনি ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস, পরবর্তিকালে যিনি 'দেশবন্ধু' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

দার্জিলিঙ হইতে ফিরিবার আগে একদিন। সন্ধ্যাবেলা। টেবিলের উপরে ছোট্ট একটি বুদ্ধমূর্তি। তাকাইয়া তাকাইয়া দেখেন নিবেদিতা। দেখেন আর মনে মনে ভাবেন—জীবনের যাত্রাপথে এক তুঙ্গতা হইতে আর এক তুঙ্গতায় চলিয়াছেন ভগবান তথাগত—চিরনিঃসঙ্গ তিনি। অকম্প্র তাঁহার উদ্দীপনার শিখা। বীচিভঙ্গে এতটুকু বিক্ষুব্ধ নয় তাঁহার অটল প্রশান্তি। তাঁহার জীবনও তো এমনি নিঃসঙ্গ, এমনি উদ্দীপনাময়। তিনি কি পারিবেন না বুদ্ধের মতন অকম্প্র উদ্দীপনার শিখা লইয়া জীবনের পথে চলিতে?

॥ আঠার ॥

ডিসেম্বরে নিবেদিতা কলিকাতায় ফিরিলেন।

ইতিমধ্যে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই শিখা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নবজাগরণের প্রাণ-সঙ্গীতে বাংলার আকাশ-বাতাস, বাঙালির মন ভরিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, কাব্যবিশারদ, কামিনীকুমার আর রজনীকান্তের গানে দেশের তরুণ চিত্তে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। ময়দানে বিক্ষুব্ধ নিরস্ত্র জনতার উপর লাঠি চলিয়াছে। কার্লাইল সার্কুলারের বলে 'বন্দেমাতরম্' নিষিদ্ধ হইয়াছে। জীবনের ও-পারে দাঁড়াইয়া বাংলার বর্ষীয়ান জননায়ক আনন্দমোহন মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। জাতীয় ভাণ্ডারের উদ্বোধন হইয়াছে। 'সন্ধ্যার' ভেরী নিনাদ আরো তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। রংপুরে ছাত্রদের প্রতিবাদে গোলদীঘিতে ছাত্রদের সভা হইয়াছে। পান্তির মাঠে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প গৃহীত হইয়াছে এবং উহার জন্য সুবোধ মল্লিক এক লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। স্বদেশীয় শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ফাণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে ফাটল ধরিয়াছে। এই পান্তির মাঠে মডারেটদের আবেদন-নিবেদন নীতির সমাধি রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীসমাজের অনুসরণে চরমপন্থী দলের সম্পূর্ণ গভর্ণমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া আত্ম-

প্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। বিপিন পালের নেতৃত্বে চরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠান "স্বদেশী মণ্ডলী" ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং সাত বৎসর প্রভুত্ব চালাইয়া লর্ড কার্জন বিদায় লইয়াছেন। অপ্রত্যাশিত দ্রুত গতিতে এইসব ঘটনা একটির পর একটি ঘটিয়া গিয়াছে গত পাঁচ মাসের মধ্যে—যে-পাঁচ মাস ভগিনী নিবেদিতা অসুস্থ ছিলেন। এইসব শুনিয়া তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। সন্তানের ব্যথা মায়ের বক্ষে বাজিল। স্বদেশী আন্দোলনের এই প্রজ্জ্বলিত অবস্থার মধ্যে নিবেদিতা দার্জিলিঙ্ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

নিবেদিতা ফিরিয়াছেন শুনিয়া নেতৃস্থানীয় অনেকেই সন্ধ্যায় বাগবাজারের সেই বাড়িতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তরুণের দল আসিয়া পরামর্শ চাহিল। সবাইকে তিনি বলিলেন—"বুক বাঁধ। নিষ্ঠা আর আনুগত্য চাই। সব চেয়ে বড় কথা, আমাদের তৈরী থাকতে হবে।"

তারপর নিবেদিতা একদিন জোড়াসাঁকোয় যাইয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। উদ্দেশ্য বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঠিক বিবরণ অবগত হওয়া। প্রথমেই বলিলেন—"যা গান লিখেছেন, ওতেই কাজ হবে।"

রবীন্দ্রনাথ। কোন্ গানটার কথা বলছেন ?

নিবেদিতা। ঐ যে বারীনদের মুখে শুনলাম— 'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে···ললাট-নেত্রে আগুন-বরণ'···চমৎকার ভাব। যাক্, এখন এদিকের নতুন খবর কি ?

রবীন্দ্রনাথ। বয়কট প্রস্তাবের পর থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। অব্যর্থ শর-সন্ধান এই বয়কটের প্রস্তাব। একেবারে বাসুকীর ফণায়

কেঁপে-ওঠা ধরিত্রীর মতই সারা বাংলা দেশ দুলে উঠেছে আচ্ছা, গোখ্‌লে নাকি বিলাতে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছেন ?

নিবেদিতা। ওটা গুজব। উঠি আজ।

১৯০৫। ডিসেম্বর। এইবার কংগ্রেসের অধিবেশন বারাণসীতে। স্মরণীয় এই অধিবেশনের সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে। সবেমাত্র লণ্ডন হইতে ফিরিয়াছেন তিনি। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। কংগ্রেস বসিবার তিন দিন পূর্বে নিবেদিতা কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতের এক তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই অধিবেশন। মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাব ভিন্ন ভারতের অপর কোনো প্রদেশই সেদিন বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন নাই—নিবেদিতা ইহা জানিতেন। বারাণসী কংগ্রেসে নিবেদিতার আসিবার আরো একটি কারণ ছিল। কলিকাতায় থাকিতেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে অরবিন্দও কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিতেছেন। অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করাও দরকার নিবেদিতার। গোখ্‌লেকে নিবেদিতা বলিলেন—"কংগ্রেস যেন বয়কট সমর্থন করে।"

গোখ্‌লে। কিন্তু বয়কট্ কথাটার মধ্যে একটা প্রতিশোধ ও বিদ্বেষের ভাব রয়েছে না ?

নিবেদিতা। প্রতিশোধ ও বিদ্বেষই তো এখন আমাদের একমাত্র পন্থা।

গোখ্‌লে। কংগ্রেস তা সমর্থন করতে পারে না।

নিবেদিতা। কিন্তু বাঙালি তা পারে—এটুকু তো বলতে পারবেন ?

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গোখ্‌লে নির্দিষ্ট সময়ে কংগ্রেস তোরণে

আসিয়া পৌঁছিলেন—তাঁহার পশ্চাতে শোভাযাত্রা। গোখ্‌লে নামিলেই তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য নিবেদিতা অগ্রসর হইলেন। ইহাই এ-অঞ্চলের নিয়ম। নিবেদিতা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন এক পাত্র দুগ্ধ—বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। তারপর গলায় পরাইয়া দিলেন শেফালি জরির থোপনা-গাঁথা ফুল কর্পূরের মালা; অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"দেখবেন, বয়কটের দাবী কংগ্রেস যেন ন্যায্য বলিয়া ঘোষণা করে—এ জনতারই দাবী।" তারপর রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া 'বন্দেমাতরম্‌' গাহিবার পর গোখ্‌লে মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন, জনতার দাবীকে ন্যায্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নিবেদিতার প্রভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত।

•

স্থান—কাশীর তিলভাণ্ডেশ্বরের সংকীর্ণ গলিতে অবস্থিত নিবেদিতার বাড়ি। সময়—কংগ্রেসের অধিবেশনের একদিন পরে। সন্ধ্যাবেলায় অরবিন্দ আসিলেন নিবেদিতার সহিত দেখা করিতে। চরমপন্থী দলের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কয়েকজন আসিলেন। রমেশচন্দ্র প্রমুখ নরমপন্থীরাও এখানে আসিয়া নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করিতেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার তিলভাণ্ডেশ্বরের বাসাটি নেতাদের বৈঠকখানা হইয়া উঠিত। অনেক রাত্রি অবধি এখানে বৈঠক চলিত। ঘরের এক কোণে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া নিবেদিতা স্বাগত জানাইতেন অভ্যাগতদের। তাঁহাকে ঘিরিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে মণ্ডলী করিয়া বসিতেন সকলে। গোখ্‌লে পর্যন্ত আসিতেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রদত্ত গোখ্‌লের বক্তৃতা নিবেদিতা দেখিয়া দিয়াছিলেন। নিবেদিতার তিলভাণ্ডেশ্বরের এই বাড়িতেই একদিন সান্ধ্যবৈঠকে বিখ্যাত 'ভারত সেবক-সংঘ' ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

গোখ্‌লের সহিত নিবেদিতার যে-সব কথাবার্তা হইয়াছে, নিবেদিতা তাঁহাদের কাছে সব খুলিয়া বলিলেন। চরমপন্থীরা গোখ্‌লের মনোভাব সমর্থন করিলেন না। অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইবার পর নিবেদিতা অরবিন্দকে বলিলেন—"বিপ্লব আসিতে আর দেরী নাই। আপনার কি মনে হয়?"

অরবিন্দ। বিপ্লব আসিয়া গিয়াছে।

নিবেদিতা। এ বিপ্লবের নেতা কে?

অরবিন্দ। টিলক। আমার বিশ্বাস তিনি একজন অসামান্য বিপ্লবী নেতা। চরমপন্থীদলের নেতৃত্ব তাঁহাকেই দেওয়া উচিত।

নিবেদিতা। বয়কট্‌-প্রস্তাব কি আপনার রচনা?

অরবিন্দ। হাঁ? আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

নিবেদিতা। প্রস্তাবটি পাঠ করিয়াই বুঝিয়াছিলাম।

অরবিন্দ হাসিলেন।

নিবেদিতা। কিন্তু আর কতকাল অন্তরালে থাকিয়া কাজ করিবেন? 'ভবানীমন্দির'-কে বাস্তবে রূপায়িত করিবেন না? এইবার সম্মুখে আসুন। লগ্ন তো আসিয়া গেল। আমরা আপনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছি।

বারাণসী কংগ্রেসে প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞেরা দেখিলেন যে, চরমপন্থীর দল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়াছে আর ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এইবার নরমপন্থীদের উচ্ছেদ অনিবার্য। লোকমান্য টিলক, সিংহের মত বাঙালির পক্ষ হইয়া কংগ্রেস মণ্ডপে গোখ্‌লে প্রভৃতি নরমপন্থীদের আক্রমণ করিলেন আর লাজপৎ রায় বাংলার আন্দোলনকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন যে, বাংলার সিংহ এতদিন শৃগালের মত ছিল, কিন্তু লর্ড কার্জনের উৎপীড়নে বাংলা এখন সিংহ-বিক্রমে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেদিন বাংলার প্রতি পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের এই দুই

সিংহের নির্ভীক আচরণে সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হইয়াছিলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন: "ভগিনী নিবেদিতা কাশী কংগ্রেসের বিবরণী 'এ্যান ইংলিশ অবজার্ভার' এই ছদ্মনাম দিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফকে কলিকাতায় পাঠাইতেন। এই বিবরণগুলির মধ্যে কংগ্রেস রাজনীতির দুর্বলতা কোথায়, তাহা তিনি নিখুঁত ও নির্মমভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

ইহা ভিন্ন, কংগ্রেস বসিবার কিছুদিন আগে নিবেদিতা বিভিন্ন কাগজে লিখিলেন—কংগ্রেসের প্রকৃত কার্য কি? সদস্যদের নূতন-ভাবে নূতন চিন্তায় এবং স্বদেশপ্রেমে অভ্যস্ত করাই কংগ্রেসের কার্য, যাহার ফলে জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ় হইবে। তিনি লিখিলেন: "দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ ও কর্মতৎপর করিয়া তুলিতে হইবে আর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা ওদিকে মণিপুর হইতে পারস্য সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট দেশের অগণ্য অধিবাসীদের মনে আত্মীয়তার বোধকে উজ্জ্বল করাই মহাসভার কর্তব্য।"

'ডন্ সোসাইটি'র মাধ্যমে নিবেদিতা যেমন বাংলাদেশের সকল জ্ঞানীগুণীর সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন, কাশী কংগ্রেসের নেপথ্যে থাকিয়াও তিনি ভারতের সকল প্রধান রাজনৈতিক নেতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার ও মিশিবার সুযোগ পাইলেন। কোন একজন বিদেশী মহিলা ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব এমনই অসাধারণ ছিল যে, তিনি নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলকেই দক্ষিণ ও বামে রাখিয়া ভারতের রাজনীতিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছেন। এবং সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছেন। তাই না

তিনি রমেশ দত্ত, গোখ্‌লে, টিলক, বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ—সকলের হাত ধরিয়া ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সকল ক্ষেত্রে অবাধে চলাফেরা করিয়াছেন। রাজনীতিতে এমন অপূর্ব সমন্বয়-সাধন একমাত্র বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতার পক্ষেই সম্ভব, অন্য কাহারও পক্ষে নহে। ইহার আরো একটি কারণ ছিল। নিবেদিতা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে দলাদলি পছন্দ করিতেন না। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে একটি দল থাকাই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। তাই তিনি বলিতেন—দুই দলের কলহ ইংরেজের রাজনীতির অন্ধ-অনুকরণ। সেই অন্ধ অনুকরণ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার মহৎ উদ্দেশ্যেই নীলকণ্ঠী নিবেদিতা সকল শিবিরেই যাওয়া-আসা করিতেন।

১৯০৬। মার্চ।

কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল, কিন্তু জাতির জীবনে সন্ধিক্ষণ আসিতে বিলম্ব হইল না। কাশী কংগ্রেসের তিন মাসের মধ্যেই সশস্ত্র বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য অরবিন্দ-নিবেদিতার প্রেরণায় বিপ্লবী-দলের মুখপত্র 'যুগান্তর' আবির্ভূত হইয়া দেশের তরুণদের চেতনায় যুগান্তর সৃষ্টি করিল। প্রথম হইতেই যুগান্তর পত্রিকা খোলাখুলি-ভাবে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে লাগিল। যুগান্তরের সূচনা হইতেই নিবেদিতা ইহার সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন। বাংলাদেশে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ এইখান হইতেই। নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে বসিয়াই বারীন্দ্র ও ভূপেন্দ্রনাথ যুগান্তরের সকল রকম পরিকল্পনা স্থির করিয়া প্রথম সংখ্যা লিখিয়া ফেলিলেন। সম্পাদক কে হইবে?—এই প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন ভূপেন্দ্রনাথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিবেদিতা বলিলেন—"ভূপেন"।

যুগান্তরের স্তম্ভে দিনের পর দিন নির্জলা বিপ্লব প্রচারিত হইতে লাগিল—পিছন হইতে প্রেরণা দিতে লাগিলেন নিবেদিতা ও অরবিন্দ। অরবিন্দ এই সময় বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তখন হইতে বিপ্লবের ত্রিধারা প্রবাহিত হইল। অরবিন্দ আসিতেই বাংলায় যেন নব-প্রাণের সঞ্চার হইল। ঘটনার স্রোত ইতিহাসের বুকে দ্রুত আবর্তিত হইয়া চলিল যৌবন জল-তরঙ্গের মতন। ১৪ই এপ্রিলের ইতিহাস-বিখ্যাত বরিশাল সম্মেলনের প্রভাব নিবেদিতা ও অরবিন্দের জীবনে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। নিবেদিতা এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন না; অরবিন্দ ছিলেন। "বরিশালে ফুলারী দমননীতির চরম প্রকাশ বিপ্লবী অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইলেন। বাঙালি সেদিন রক্তদান করিয়া রাজাদেশ অমান্য করিল, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল—বিপ্লবী অরবিন্দ তাহা দেখিলেন এবং এই প্রত্যক্ষ ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁর মুখ নীরব ছিল, কিন্তু মন নীরব ছিল না। ফরাসী বিপ্লববের কথা, আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহের কথা একে একে তাঁহার সদ্য উত্তেজিত মনের উপর দিয়া চলচ্চিত্রে ছবির মত ছায়াপাত করিয়া গেল। আর তাঁহার বিপ্লবী মন যে স্তব্ধ হইয়া কি সংকল্প করিল"—তাহা তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া সর্বপ্রথমে নিবেদিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। বরিশালের সব সংবাদই নিবেদিতা কলিকাতায় বসিয়া পাইয়াছিলেন। তারপর "নিরীহ, নীরব অরবিন্দ সেদিন বরিশাল হইতে যে অহিংসভাব অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই"—ইহা জানিতে পারিয়া নিবেদিতার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—জয় মা কালী। ওয়া.গুরুজী কি ফতে!

বরিশালের অভাবনীয় দমন-নীতি এবং রক্তপাত হইতেই বাংলার নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা আত্মপ্রকাশ করিল বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে।

বাংলার দুই কুল প্লাবিত করিয়া বিপ্লবের ভাবগঙ্গা বহিয়া চলিল। সেই উদ্দাম স্রোতোধারাকে সেদিন পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন দুইজন—অরবিন্দ আর নিবেদিতা। ফুলার-বধের আয়োজন চলিল যুগান্তরের আড্ডায়। বাংলার এই প্রথম বৈপ্লবিক কর্মের—ফুলার-বধের এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়িকা সেদিন ছিলেন নিবেদিতা। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন—"অরবিন্দ ও নিবেদিতার একত্রে মিলিত পরামর্শ অনুসারেই এই ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মের সূত্রপাত হইয়াছিল।" স্বীয় জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডের অপূর্ব স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃষ্টান্ত নিবেদিতার চক্ষের সম্মুখে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া উঠিত। পুনরভ্যুত্থানের প্রাণস্পর্শী আহ্বানে ভারতবাসীর মন জাগিয়া উঠিয়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যখন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই নিবেদিতার ললাট-নেত্রের প্রদীপ্ত আগুনে ইতিহাসে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর বাংলার আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠিল বিপ্লবের দুন্দুভি। নিবেদিতাকে আমরা দেখিতে পাই নাগমাতারূপে। উদ্ধত রাজশক্তির ভ্রূকুটিকে হেলায় উপেক্ষা করিয়া নিবেদিতা সেদিন বাংলার নাগশিশুদের কর্ণে মাভৈঃ মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন।

১৯০৬। ৪ঠা জুন।

স্বদেশীযুগের প্রজ্জ্বলিত অবস্থা।

আজ টাউন হলে শিবাজী-উৎসব হইবে।

বাঙ্‌লার রাজনৈতিক আন্দোলনকে সর্বভারতীয় করিয়া তুলিবার ইচ্ছা ছিল এই উৎসবের পশ্চাতে। উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব' এবং প্রধান হোতা বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত। উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে একদিন সন্ধ্যায় তাঁহারা দুইজনেই বাগবাজারে আসিলেন নিবেদিতার সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে।

উপাধ্যায় আসিলেন—অঙ্গে সেই গৈরিকবাস, নগ্নপদ, গায়ে একখানা গৈরিক উত্তরীয়। নিবেদিতার চক্ষে উপাধ্যায় যেন মানুষের মতন মানুষ ; দিগ্বিজয়ী বাঙালির জীবন্ত বিগ্রহ! অশ্বিনীবাবুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া উপাধ্যায় বলিলেন—"এই অশ্বিনী দত্ত।" তারপর অশ্বিনীবাবুর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন—"এই আমাদের সিস্টার নিবেদিতা—স্বামীজির মানসকন্যা।" নিবেদিতা হাত তুলিয়া অশ্বিনী বাবুকে সপ্রীতি নমস্কার জানাইয়া বলিলেন—"গুরুজীর কাছে আপনার কথা শুনিয়াছিলাম। একবার আলমোড়ায় আপনার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আপনাকে সেই সময় কি বলিয়াছিলেন, মনে আছে?"

অশ্বিনীবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ, স্বামীজি আমাকে বলেছিলেন, বাঙলার যুবকদের হাড় থেকে যে বজ্র তৈরী হবে, সেই বজ্র দিয়েই ভারতবর্ষের অধীনতা ঘুচে যাবে।"

নিবেদিতা বলিলেন—"শুনিয়াছেন বোধ হয় যে, সেই বজ্র তৈরীর কাজেই আমরা এখন হাত দিয়াছি। স্বামীজির দুইটি কথা আমার ইষ্টমন্ত্র—কর্মযোগ আর অখণ্ড ভারত। আমার সকল কাজের প্রেরণার উৎস এই দুইটি কথা।"

উপাধ্যায় বলিলেন—"আমাদেরও ইষ্টমন্ত্র তাই।"

নিবেদিতা বলিলেন—"থাক্—এখন কি উদ্দেশ্যে এসেছেন, বলুন।"

উপাধ্যায়। টিলক আসছেন। আমরা শিবাজী-উৎসব করব। আপনি একবার রবি ঠাকুরকে বলুন এই উপলক্ষে একটা কবিতা লিখে পাঠ করতে।

তারপর নিবেদিতা একদিন জোড়াসাঁকোয় আসিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সব কথা বলিলেন। কবি বলিলেন "আপনার

অনুরোধ আমার কাছে দেশ-মাতৃকার আদেশের মতনই"। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

টাউন হল। বিরাট সভা। আজ শিবাজী-উৎসবের সাম্বৎসরিক অধিবেশন। ১৯০২ সালে মারাঠার বীরপূজা বাংলাদেশে প্রথম প্রবর্তিত করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং ইহার ভিতর দিয়াই মারাঠি ও বাঙালির মধ্যে সেদিন এক জাতীয়তাসূত্রের সখ্য-সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইয়াছিল। শিবাজী উৎসবের প্রবর্তক টিলক। তিনিই মারাঠা জাতির মধ্যে এইভাবে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেন। এই উৎসবে তাই বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন বালগঙ্গাধর টিলক, ডাক্তার মুঞ্জে প্রমুখ মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট জননায়কবৃন্দ। উৎসবের সঙ্গে একটি স্বদেশী মেলার আয়োজনও করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে টিলক মেলার উদ্বোধন করিলেন। এই স্বদেশী মেলা দেখিয়া সারা ভারতবর্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিচিত্র দেশীয় পণ্যসম্ভারের আয়োজন ছিল; ছিল উৎকৃষ্ট তাঁতের জিনিস, পালিশ-করা কাঠের লাঙল, আচার-মোরব্বা, রকমারি মিষ্টি, সূচী শিল্প আর ফুলকারি। নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা জাতীয় পতাকায় সূচের কাজ করিয়া দিয়াছিল। মেলার সাফল্য দেখিয়া নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না।

মহারাষ্ট্র-কেশরী টিলককে অভ্যর্থনা করিলেন নিবেদিতা। উৎসবে ভবানী পূজা হইল। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র দুইজনেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতার অনুরোধে। জাতির কবি রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতামঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া দৃপ্ত মধুর কণ্ঠে যখন পাঠ করিলেন:

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজি'
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।

তখন সভামধ্যে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হইল। কবির কণ্ঠে সেইদিন নিবেদিতা আর একবার তাঁহার গুরুর অখণ্ড-ভারতের আদর্শের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার সমস্ত অন্তর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। টিলক সেই সভায় বলিলেন—“মারাঠার সঙ্গে বাঙলার মিলন ইতিহাসেরই অভ্রান্ত ইঙ্গিত। আজ ভারতের হিন্দুগণকে এক শক্তিতে পরিণত করিবার, এক পতাকার তলে আনিবার দিন। আজিকার এই উৎসব অনাগত সেই দিনটিকে ত্বরান্বিত করিয়া দিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

টিলকের কথা নিবেদিতার অন্তর স্পর্শ করিল। মনে পড়িল অতীত দিনের কথা। শুনিয়াছিলেন যে প্রথমবার আমেরিকা যাইবার সময় স্বামীজি টিলকের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আবার স্বামীজির জীবনসায়াহ্নে অর্থাৎ ১৯০১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সময় টিলক কলিকাতা হইতে বেলুড়মঠে, স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজির দেশাত্মবোধের প্রতি টিলকের অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

সখারাম গণেশ দেউস্করের ‘দেশের কথা’ প্রকাশিত হইল। সখারামই প্রথম এই বইতে জাতির কর্ণে একটি নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—স্বরাজ। সেই পুস্তকে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির ইতিহাস পাঠ করিয়া দেশবাসী ক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সখারামের পুস্তকে শুধু বাংলার স্বদেশী আন্দোলনই ব্যাপক হইয়া উঠিল না, বিপ্লববাদও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল।

আজিকার বাঙালি হয়ত সখারামকে বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু সেদিন এই তরুণ মারাঠি বাঙালির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাপ্তাহিক ‘হিতবাদী’র ভিতর দিয়া যেভাবে স্বদেশী আদর্শের প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং ‘দেশের কথা’ পুস্তকে অতি সরল ভাষায় বহু বাস্তব তথ্য প্রকাশ

করিয়া ইংরেজ শাসনের কুফল অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিয়া, বাঙলার যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবার মতন। মারাঠি সখারাম গণেশ দেউস্কর নিঃসন্দেহে বাঙালির মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। এই মারাঠি তরুণের দেশপ্রেম তাঁহাকে নিবেদিতার বিশেষ প্রিয়পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল।

২২শে জুলাই। স্থান—মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ। চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে আজ এখানে একটি সভার আয়োজন হইয়াছে। সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছে। নিবেদিতাও উপস্থিত আছেন। স্বদেশী যুগের প্রথম পর্বে কলিকাতায় এমন সভা খুব কমই হইয়াছিল, যে সভায় নিবেদিতা উপস্থিত না থাকিতেন। সেই দিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ "স্বদেশী সমাজ" পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে জনসেবার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভারত কিভাবে শ্রেয়ের পথকে অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই দেখাইলেন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশের নেতাদিগকে বলিলেন যে, ভারতের মর্মস্থল তাহার গ্রামে ; সেই গ্রামের সমস্যা ভারতের সমস্যা। গ্রামে নূতন প্রাণ আনিতে পারিলে ভারতের কল্যাণ। রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশী সমাজের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী গভর্ণমেণ্টের ভিতরেই আর একটি স্বদেশী স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথই এই সময়ে ইংরেজি 'পেট্রিয়টিজম্'-এর বাংলা প্রতিশব্দ করিলেন "স্বাদেশিকতা"।

অরবিন্দ বাংলায় আসিলেন।

কলিকাতা তখনো ভারতবর্ষের রাজধানী

সেই রাজধানীতে আসিলেন অরবিন্দ যেমন ভাবে নিবেদিতা.

একদিন আসিয়াছিলেন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে। নিবেদিতার মতনই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সম্ভাবনাময় জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া, বরোদা রাজ-কলেজের উচ্চবেতনের চাকুরী ত্যাগ করিয়া, অরবিন্দ বাংলায় আসিলেন। যে মুহূর্তে স্বদেশী আন্দোলনের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া দেশ-জননী তাঁহার আকুল আহ্বান পাঠাইলেন, অরবিন্দ সেই মুহূর্তেই ইতিহাসের গতিপথে উদ্ভূত বাংলার অগ্নিগর্ভ বিপ্লব-তরঙ্গে নিঃশঙ্কচিত্তে ঝাঁপ দিলেন।

এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ভারতের জন্য নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ আর পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য অরবিন্দের এই আত্মোৎসর্গ, উভয়েরই ঐতিহাসিক প্রেরণা ও মূল্য এক। অরবিন্দ বাংলায় আসিয়া দেশব্যাপী যে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করিলেন, নিবেদিতা তাঁহার সকল শক্তি লইয়া তাহাতে যোগদান করিলেন। বলিলেন—"আর কথা নয়, এইবার চাই কাজ।" এইভাবে সেদিন বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে অরবিন্দ এবং নিবেদিতার যুগ্ম-নেতৃত্ব বহ্নি-বলয় ঘেরা এক নূতন যুগের সূচনা করিয়া দিয়াছিল। সে ইতিহাস আজো সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হয় নাই।

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিলেন অরবিন্দ নামমাত্র বেতনে। সেই সঙ্গে নেতৃবর্গ ও কর্মীবৃন্দের সহিত মিলিয়া তিনি কাজও আরম্ভ করিয়া দিলেন। একদিকে চলিল গুপ্তসমিতি গঠনের কাজ, অন্যদিকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলগঠন ও জাতীয় আদর্শ প্রচারের কাজ। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন :

"জাতীয় আন্দোলনকে অধ্যাত্ম সাধনার মর্যাদা দেওয়ার জন্যই যেন অরবিন্দ আসিয়াছিলেন। দেশহিতৈষণাকে ইষ্টনিষ্ঠার গুরুত্ব দিলেন তিনি। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন অসাধারণ দৃঢ়চেতা, অমোঘ তাঁহার বীর্য। যাহা কিছু তাঁহার

জন্ম আর কর্মদ্বারা অর্জিত, যাহা কিছু তাঁহার নিজস্ব সবই ছিল ঈশ্বরে অর্পিত—আর সে ঈশ্বর তাঁহার দেশ। ভারতবর্ষ ত একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র নয়, অরবিন্দের নিকট তিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা।"

অরবিন্দের দেশসেবার এই আদর্শের মধ্যে নিবেদিতা যেন তাঁহার গুরুর দেশপ্রেমের আদর্শকে নূতন করিয়া পাইলেন; তাই না শান্তশিষ্ট এই নিরীহ মানুষটির স্বদেশপ্রেম অজগরের নিঃশ্বাসের মত সেদিন নিবেদিতাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

"অরবিন্দ ছিলেন আন্দোলনের কাণ্ডারী। তিনি যে জাতীয়তার পাঠ দিতেন, আসলে তাহা আধ্যাত্মিকতা। ক্রমে জাতির আচার্য হইয়া উঠিলেন অরবিন্দ। যাহারা বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিবে তাহারা যেন উপলব্ধি করে যে দেবতার হাতে তাহারা যন্ত্রমাত্র, এই ছিল তাঁহার আদর্শ। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশসেবাকে গ্রহণ করিতে হইবে জীবনধর্ম হিসাবে। এই ব্রত হইবে আত্মনিবেদন আর আনুগত্যের সাধনা।...এই কর্মযোগ বিনা দ্বিধায় দুঃখ-বরণের ব্রত।"

নিবেদিতার মনে পড়িল বিবেকানন্দও তো জাতিকে এই কর্মযোগে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বাঙালির হইয়া নিবেদিতা তাই অরবিন্দকে জাতীয় আন্দোলনের এবং সশস্ত্র বিপ্লবের দীক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। নিবেদিতা সবিস্ময়ে দেখিলেন—দৈববাণীর মতন অরবিন্দের কথা; দিন দিন লোকের নিকট সেই কথার মূল্য বাড়িতেছে। বাংলায় আসিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এক প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার সহিত নিবেদিতার কর্মপ্রবাহ আসিয়া সংযুক্ত হইল। ইহাকে ইতিহাসের নেপথ্য-বিধান ভিন্ন আর কি বলিব? সতীশচন্দ্রের 'ডন্', বিপিনচন্দ্রের 'নিউ-ইণ্ডিয়া', উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এবং বিপ্লবীদলের 'যুগান্তর' যে-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল,

১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সেই ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর ও ব্যাপকতর করিয়া দিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে প্রাণময় ও জীবন্ত বস্তু এই সব সংবাদপত্রগুলি। নিবেদিতা ইহার প্রত্যেকটির সহিত প্রথম হইতেই সংশ্লিষ্ট। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সহিতও তিনি জড়িত হইলেন। 'বন্দেমাতরম্' ইংরেজ-বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিল। চরমপন্থী দলের আদর্শ ইহাই। নিবেদিতার আদর্শও তাহাই। স্বদেশী আন্দোলনের এই পর্বে অরবিন্দের পার্শ্বেই নিবেদিতার স্থান, কি নিবেদিতার পার্শ্বে অরবিন্দের স্থান—তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও, সমসাময়িক ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-টিলক-প্রভাবিত বিপ্লবী অরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিলেন নিবেদিতা। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজের উক্তি এই: "বাংলায় আমার রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশী সহায়তা করিয়াছেন এবং নানাভাবে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্যা শিষ্যা—মহীয়সী নিবেদিতা।"

নিবেদিতা যখন বাংলায় অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট, ঠিক সেই সময় মাদ্রাজ হইতে তিরুমালাচার্য নিবেদিতাকে তাঁহার 'বালভারতী' পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সাদরে ও সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার উপায় ছিল না। কারণ তখন তিনি সন্ত্রাসবাদী যুবকদিগকে সিন্‌ফিন্‌দের গুপ্তসমিতির নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। হেমচন্দ্রকে প্যারিসে পাঠাইতে হইবে বোমা তৈয়ারী করা শিখিয়া আসিবার জন্য। আবার

স্বদেশীর জন্য চাঁদার খাতা হাতে লইয়া ধনীদের দরজায় দরজায় যাওয়া, বিপ্লবীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা—এই রকম শত কাজের মধ্যে নিবেদিতা জড়াইয়া আছেন। কাজেই 'বালভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে এখন অসম্ভব—এই কথা তিনি তাঁহার বন্ধু এবং বিখ্যাত তামিল-কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে লিখিয়া জানাইলেন, তবে প্রয়োজন হইলে এবং আদর্শগত মিল থাকিলে প্রবন্ধাদি দিয়া সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সুব্রহ্মণ্য ভারতীই নিবেদিতার রাজনৈতিক প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে সেদিন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে 'আচার্য' বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিগত দুই শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে আর কোনো নারীর ভাগ্যে এই সম্মান-লাভ ঘটে নাই।

ঘটনাচক্র দ্রুত আবর্তিত হইতে লাগিল।

"বন্দেমাতরম্' ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিল, জাতির ধমনীতে যেন নবরক্তপ্রবাহ বহাইয়া দিল—এমনই তেজঃপূর্ণ ছিল ইহার প্রত্যেকটি রচনা। 'বন্দেমাতরম্'-এর পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ ঐশীমন্ত্রের মত কার্য করিল—জাতি যেন নব-জন্ম গ্রহণ করিল। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে নবযুগ-জীবনের মহামন্ত্র নিবেদিতার কণ্ঠ ও লেখনী হইতেও সমান মূর্চ্ছনায় নির্গত হইয়াছিল। পরাধীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন অরবিন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। অরবিন্দের মুখে দৃষ্টি রাখিয়া ভগিনী নিবেদিতাও তারে তারে বিপুল ঝঙ্কার দিলেন।

একদিন। সন্ধ্যাবেলা। 'যুগান্তর' পত্রিকার কার্যালয়ে নিবেদিতা বসিয়া আছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন জনকতক জাতীয়তাবাদী তরুণ বিপ্লবী। তাঁহাদের মধ্যে অরবিন্দও আছেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা হইতেছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডে সশস্ত্র সংগ্রামের যেসব বিপ্লবী কর্মী লণ্ডনে থাকিয়া কাজ করিতেন, নিবেদিতা তাঁহাদের সঙ্গে একসময়ে একযোগে কাজ করিয়াছেন। বিপ্লবের পরিণাম তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। চারি বৎসর পূর্বে রাজদ্রোহের অপরাধে পুণার সুবিখ্যাত চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের যখন ফাঁসী হয়, নিবেদিতা গিয়াছিলেন তাঁহাদের মা-কে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে। সেখানে গিয়া নিবেদিতা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা ছিল না। দুই ছেলের ফাঁসী হইয়াছে, তাহাতে কি হইয়াছে?—দেশমাতৃকার চরণে সন্তানদের তিনি বলি দিতে পারিয়াছেন—ইহাতেই বৃদ্ধা যেন কৃতার্থ। নত হইয়া সেই বৃদ্ধার চরণ স্পর্শ করিয়াছিলেন নিবেদিতা। আদর্শের স্বপ্ন আর বাস্তবের রূঢ়তা ইহার মধ্য দিয়া চলিতে হইবে—নিবেদিতা বলিলেন।

একজন প্রশ্ন করিল—"রবীন্দ্রনাথ যে বলেন, ভারতবর্ষ ভুল পথে চলিতেছে।" অমনি নিবেদিতা বলিলেন—"দেশের ক্লীবত্ব ঘুচাইবার জন্য হিংসা আর বিপ্লবকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করাই এখন কর্তব্য। আমি শুধু এই বুঝি।" আর একজন প্রশ্ন করিল—"পরিণামে কি ঘটিতে পারে?" নিবেদিতা বলিলেন, "তা আমি জানি না। এই আত্মত্যাগের জন্য পুরস্কার আশা করাও যেমন উচিত নয়, তেমনি বিপদের সম্ভাবনা কতখানি আগে-ভাগে তাহাও খতাইয়া দেখিবার অধিকার আমাদের নাই। নির্ভীক হইতে হইবে, ইহাই আসল কথা। বুকের রক্তে যেন কাপুরুষতার সকল অপবাদ ধুইয়া মুছিয়া যায়।" একজন জাতীয়তাবাদী নেতা প্রশ্ন করিলেন—"বোমা ফাটাইবার সাত্যকারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না?" নিবেদিতা বলিলেন—"নিশ্চয়ই আছে। বোমা না ফাটাইলে ইংরেজ এক কণিকাও দিবেনা।

আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।" মহাভারতে অর্জুনের লক্ষ্যবেধের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া নিবেদিতা কতবার বলিতেন—"স্বয়ংবরে কৃষ্ণাকে পাওয়ার জন্য অর্জুনকে লক্ষ্যবেধ করিতে হইয়াছিল শুধু জলে ছায়া দেখিয়া—তাঁহার হাত কাঁপে নাই, দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয় নাই। ভারতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত—ইহা শুধু মুখে বলিলে চলিবে না; অস্ত্র ধরিতে হইবে, গুলি ছুঁড়িতে হইবে, শত্রুকে আঘাত হানিতে হইবে, রক্ত ঢালিতে হইবে, ইংরেজকে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তবেই না ইংরেজ আমাদের সম্মান করিবে।" যদি কেহ বলিত—"অহিংসাও তো ধর্ম," অমনি তাহার উত্তরে নিবেদিতা বলিতেন—"কিন্তু দুর্বলের অহিংসা পাপ।" গীতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া বলিতেন, "মনে নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তক্তে্াত্তিষ্ঠ পরন্তপ!' মনে নাই, আমাদের রণগুরু অরবিন্দ কি বলিয়াছেন?—অগ্নি ও রক্ত স্নানে পবিত্র হইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। তিনিই না তোমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন গীতা? মনে নাই, স্বামী বিবেকানন্দ কি বলিতেন?—দেশমাতা এক সহস্র যুবক 'বলি' চাহেন।"

নিবেদিতার এই রণরাঙ্গনী মূর্তি দেখিয়া সেদিন মৃতকল্প এই জাতির প্রাণে যে বিদ্যুৎসঞ্চার হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস তো কোনো দিন মুছিয়া যাইবার নহে। এমনি করিয়াই সেদিন তিনি ভারতবর্ষকে তরুণদের চিনাইয়া দিয়াছিলেন স্বাধীনতাকামী আর পাঁচটি দেশের সংগ্রাম-কাহিনীর মাধ্যমে। যেসব জাতীয় বিপ্লবে আধুনিক য়ুরোপের অভ্যুত্থান, তাহাদের তীব্র সংবেগ যেন নিবেদিতার প্রাণস্পন্দে মূর্ত হইয়া উঠিত। ম্যাটসিনি, কাভুর, পার্নেল প্রভৃতি

বিপ্লবী বীরবৃন্দ তরুণদের চক্ষের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিত নিবেদিতার আলোচনার মধ্য দিয়া। এই নিবেদিতা—যাঁহার চক্ষে ছিল বিদ্রোহী ও কবির কল্পনা—এমন করিয়াই সেদিন অরবিন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বরিশাল হইতে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ আসিল। নিবেদিতা স্থির থাকিতে পারিলেন না। অশ্বিনীকুমার তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সাহায্য সমিতি গঠন করিয়া অশ্বিনীবাবু একবার কলিকাতায় আসিলেন। ফিরিবার সময় নিবেদিতাকে তিনি বরিশালে লইয়া গেলেন। গৈরিকবসনা নিবেদিতার প্রাণ দুঃস্থ ও দুর্গতদের সেবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তিনি বাখরগঞ্জের বহু স্থানে বক্তৃতা দিয়া প্রচুর টাকা তুলিয়াছিলেন। সেই টাকায় পাঁচ হাজার লোককে তিন দিন অন্তর পেট পুরিয়া খাইতে দেওয়া হইত। বন্যার স্রোতের সঙ্গে লড়াই করিয়া অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে একখানি বজরায় চাপিয়া নিবেদিতা চার দিন ধরিয়া বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন। বন্যাপ্লাবিত বরিশালে এক হাঁটু জল ও কাদার মধ্য দিয়া কোনক্রমে পথ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র মুসলমান পল্লীর বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইলেন। "এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে নিবেদিতা এমন অনেক সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্বে এমন করিয়া আমরা শুনি নাই।" নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "হাজার বৎসরের সভ্যতা এক দুর্ভিক্ষেই ধ্বংস হইতে পারে। দুর্ভিক্ষ সমাজের পক্ষাঘাত-স্বরূপ। দুর্ভিক্ষ সমাজে সকল রকম বিশৃঙ্খলা আনে। ইহা শুধু ক্ষুধা নয়, দেহের নগ্নতা, রাত্রির ভীষণ অন্ধকার, অজ্ঞান মুমূর্ষুদের আর্তনাদ।" কলিকাতায় ফিরিয়া বরিশালের

ব্যাপার লইয়া কাগজে কাগজে লিখিলেন, টাউন হলে বক্তৃতা করিলেন—এইভাবে কলিকাতার লোককে এই বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য নিবেদিতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। বাঙালি সেইদিন নিবেদিতাকে লোকমাতার আসনে বসাইল। পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়াই নিবেদিতা প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ভাল করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিতে না উঠিতেই উড়িষ্যা হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ আসিল। অসুস্থ দেহেই নিবেদিতা ছুটিলেন উড়িষ্যায়। সেখানেও ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সেখানেও তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজন। দেহের দিকে একবার তাকাইলেন না, স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিলেন না। দুর্গতদের সেবার জন্য লোকমাতা ছুটিয়া চলিলেন উড়িষ্যায়।

উড়িষ্যা হইতে ভীষণ অসুস্থ হইয়া নিবেদিতা কলিকাতা ফিরিলেন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। মস্তিষ্কের প্রদাহসহ জ্বরে তিনি দীর্ঘকাল ভুগিলেন। এইবারকার অসুখে কেবল তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িল না, মনও ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহার মনে হতাশা ও অবসাদ আসিল। এইবার কলিকাতায় কংগ্রেস। সভাপতি—দাদাভাই নৌরজী। দমদমে আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী নিবেদিতা এইবার কংগ্রেসে কোনো সক্রিয় অংশই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়াই সব খবর লইতে লাগিলেন। সেদিন অসুস্থ নিবেদিতার চিকিৎসার জন্য কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়াছিলেন গোখ্‌লে এবং একমাত্র তিনিই রাত্রির পর রাত্রি নিবেদিতার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

॥ উনিশ ॥

স্থান—দমদমে আনন্দমোহনের 'আরাম কুঠি।' সময়—সন্ধ্যার একটু পরে। নিবেদিতা রোগশয্যায় শুইয়া আছেন। অরবিন্দ আসিলেন নিবেদিতাকে দেখিতে। প্রথমেই নিবেদিতা তাঁহাকে কংগ্রেসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিবেদিতা। কী সংবাদ, বলুন ?

অরবিন্দ। 'বয়কট' তো কেউ সমর্থন করল না।

নিবেদিতা। টিলক ?

অরবিন্দ। একা টিলকের সমর্থনে কি হবে, মালব্য পর্যন্ত প্রতিবাদ করলেন। আর গোখ্‌লে তো মঞ্চের সামনে লাফিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—"বিপিন পালের ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে 'বয়কট' প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্রব নেই।"

নিবেদিতা। লজপৎ রায় ?

অরবিন্দ। তিনিও এবার কিছুটা পিছু হটেছেন। এবারকার কংগ্রেসে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

নিবেদিতা। কি ?

অরবিন্দ। বাংলার নেতৃত্ব কেউ মানতে চায় না।

নিবেদিতা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—"কংগ্রেসের মধ্যে কিছুমাত্র অনৈক্য না থাকে; এই আমার ইচ্ছা, হয়তো এ একটা আদর্শ। গুরুর আদর্শ ছিল অখণ্ড ভারত। অখণ্ড কংগ্রেস না হলে অখণ্ড ভারত কি সম্ভব ? ভারতের প্রত্যেক

প্রদেশ ঘুরে বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি ঐক্যের সন্ধান পেয়েছি—হয়ত এও একটা আদর্শ। বাংলার কাছ থেকেই সমস্ত ভারত আজ অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। আদর্শের জন্য মরেও সুখ আছে।”

অরবিন্দ। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এ আদর্শ বাস্তবরূপ গ্রহণ করবে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। কংগ্রেসের বিরোধ বেড়েই চলেছে। কলকাতা কংগ্রেসে এবার তা প্রত্যক্ষ করলাম।

নিবেদিতা। বৈচিত্র্য বিরোধের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিরুৎসাহ হলে চলবে না, কাজ আমাদের করে যেতেই হবে।

রোগশয্যার সেই নির্জনতার মধ্যে নিবেদিতার মনে পড়িল ১৯০১ সালের কংগ্রেসের কথা। সেবার ডিসেম্বরের শেষে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন বসিয়াছিল কলিকাতায়। তিনি তখন লণ্ডনে। কিন্তু পরে দেশে ফিরিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন এই অধিবেশনে। বেলুড়মঠে তখন স্বামী বিবেকানন্দ অসুস্থ। কলিকাতায় সমাগত প্রতিনিধিদের আকর্ষণের বিষয় ছিল দুইটি—কংগ্রেস ও বিবেকানন্দ। যাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে সমগ্র য়ুরোপে ভারতের জয়ধ্বজা উড়িয়াছে—সেই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে সকলেই উৎসুক ছিলেন। নিবেদিতার মনে পড়িল, অবকাশ সময়ে প্রত্যহ দলে দলে বিভিন্ন প্রদেশের নেতা ও প্রতিনিধিগণ বেলুড়মঠে আসিতেন। স্বামীজি তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেন সরল বিশুদ্ধ হিন্দীতে। আলোচনা প্রসঙ্গে কাহারো বুঝিতে বাকী থাকে না যে, স্বামী বিবেকানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও, দেশ ও জাতির কল্যাণকামী হিসাবে তিনি তাঁহাদের অনেকের চেয়েই বড়ো। নেতৃবৃন্দ সাগ্রহে স্বামীজির বক্তব্য

শুনিতেন—তিনি যখন বলিতেন যে ভারতের অধ্যাত্ম-সম্পদের মধ্যেই আছে ভারতের জাতীয় কল্যাণ, তখন তাঁহাদের অন্তর শ্রদ্ধায় স্বামীজির চরণে আনত হইত। অতীত দিনের সেই চিত্র নিবেদিতার স্মৃতিপটে যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। বার বার মনে হইতে লাগিল—গুরুর অসমাপ্ত কাজ তিনি কতটুকু করিতে পারিলেন।

১৯০৭। এপ্রিল মাস। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন দমন করিবার জন্য রাজশক্তি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বরিশালের প্রত্যক্ষ দমননীতির পরিবর্তে এইবার হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে লেলাইয়া দেওয়া হইল। মার্চ মাসে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্ররোচনায় কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ধরিয়া এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে জামালপুরে বাসন্তী-পূজার সময়ে মুসলমানেরা বাসন্তী-প্রতিমা ভাঙিয়া ফেলিল। হিন্দু পুরস্ত্রী মুসলমানের হস্তে ধর্ষিতা হইল। মুসলমানদিগকে হাত করিয়া সরকার যখন স্বদেশী আন্দোলনকে আঘাত করিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময়ে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় বাঙালির পৌরুষকে ধিক্কার দিয়া যাহা লিখিলেন তাহা আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণ। জামালপুরের সংবাদে বিচলিত হইয়া টিলকও তাঁহার কাগজে একই অগ্নিবর্ষী সুরে ঝঙ্কার তুলিলেন। নিবেদিতা ঠিক এই সময়েই বাংলার বিপ্লবী যুবকদের আইরিস সিন্-ফিনদের টেক্‌নিক শিক্ষা দিতেছেন। 'যুগান্তর'-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথকে তিনি জামালপুরে পাঠাইলেন তদন্ত করিবার জন্য। ইতিহাসের দুর্দমনীয় বেগ বাঙালি জাতিকে সেদিন ওই ভাবেই বিপ্লবের পথে লইয়া গিয়াছিল। তাহারই পুরোভাগে দাঁড়াইয়া নিবেদিতা যেন অঙ্গুলি সংকেত করিয়াছিলেন।

১৯০৭। মে মাস। পাঞ্জাবে কৃষিকর বৃদ্ধি হইয়াছে। বারি দোয়াব খালে চেনাব বস্তীর প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। লজপৎ রায় ও অজিত সিংহের নেতৃত্বে তাহারা বর্ধিত কর হ্রাস না পাওয়া পর্যন্ত চাষবাসে বিরত হইল। রাওলপিণ্ডিতে ক্ষিপ্ত কৃষকজনতা সাহেবদের বাংলো ও বাগান আক্রমণ করিয়া তছ্‌নছ করিয়া দিল। খাল ও রেলপথ ধ্বংস করা হইল। ইহার ফলে ভারত সরকার লজপৎ রায় ও অজিত সিংহকে গ্রেপ্তার করিয়া ব্রহ্মদেশে মান্দালয় দুর্গে পাঠাইলেন। উৎসাহ ও আতঙ্কের মধ্যে কলিকাতায় ইহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অরবিন্দ রাত্রিতে ঘুমাইতেছিলেন। লজপৎ রায়ের নির্বাসনের সংবাদ পাইবামাত্রই 'বন্দেমাতরমের' জন্য অরবিন্দের অগ্নিবর্ষী লেখনীমুখে বাহির হইল এই কয়টি ছত্র :

"...ভারত হইতে লজপৎ রায়কে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। ইহার আর কোনো সমালোচনার প্রয়োজন নাই। তাঁহার গ্রেপ্তার উপলক্ষে প্রতিবাদ সভা নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিবাদ সভা? বক্তৃতা দিবার কিম্বা প্রবন্ধ লিখিবার দিন আজ নয়। ইংরেজ আমাদের শক্তি পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ করিয়াছে। আমরা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলাম। পঞ্চনদের মানুষ—সিংহের জাতি তোমরা—যাহারা তোমাদের অস্তিত্বকে ধূলায় মিশাইতে স্পর্ধা করে, তাহাদের তোমরা দেখাইয়া দাও যে, একজন লজপৎ রায়কে লইয়া গেলে তাহার স্থলে শত শত লজপৎ রায় উঠিয়া দাঁড়াইবে।"

১০ই মে-র 'বন্দেমাতরম'-এ এই কয়েক ছত্র সমগ্র ভারতে উত্তেজনার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছড়াইয়া দিল। 'বন্দেমাতরম'-এ অরবিন্দ যাহা লিখিলেন, ঠিক সেই সময়ে টাউন হলের এক সভায় নিবেদিতা একটি বক্তৃতায় তাহাই বলিলেন। বক্তৃতার বিষয়—'ডাইনামিক্ রিলিজিয়ন্'। সভাপতি—বিপিনচন্দ্র পাল। নিবেদিতাও বলিলেন—"আর কথা নয়। এস, এইবার আমরা কাজ আরম্ভ করি।" অরবিন্দের

লেখার সহিত একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। দেখা যাইতেছে, অরবিন্দ ও নিবেদিতা ঠিক একই সময়ে একই ইঙ্গিত করিতেছেন। এই দুই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন বিপ্লবীর চিন্তাস্রোত একই খাতে প্রবাহিত হইতেছে। নিবেদিতার এই বক্তৃতা শুনিয়াই সেদিন বিপিনচন্দ্র তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন— "ইহা ডাইনামিক রিলিজিয়ন নহে। ইহা সাক্ষাৎ ডিনামাইট, অর্থাৎ বিস্ফোরণ।" বিপিনচন্দ্র জানিতেন না, নিবেদিতা ঠিক সেই সময়ে সকলের অজ্ঞাতসারে বিপ্লবীদের লইয়া হাতে-কলমে ডিনামাইটই তৈয়ারীর দুঃসাহসিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আইরিস বিপ্লবের উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে একদা যাঁহার জন্ম, তাঁহার রক্তে বোমা-ডিনামাইটের উপাদান তো থাকিবেই। অরবিন্দ যখন 'বন্দেমাতরম্'-এ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও সক্রিয় প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, তখন নিবেদিতা, সকলের অজ্ঞাতসারে, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের ল্যাবোরেটরীতে বিপ্লবী যুবকদের লইয়া বোমা প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি শিখাইতে ব্যস্ত।

১৯০৭। জুলাই মাস। বেলুড় মঠে উৎসব হইবে। ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন তরুণ বিপ্লবীকে সঙ্গে লইয়া নিবেদিতা সেই উৎসবে যোগদান করিলেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন:

"নিবেদিতা, যে-ঘরে স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যে-ঘরে তিনি পাঁচ বৎসর পূর্বে পুষ্প-আচ্ছাদিত স্বামীজির মৃতদেহকে পাখা দিয়া বাতাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মস্তক আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেই ঘরে তীর্থযাত্রীর মত করজোড়ে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর বারান্দা দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিলেন। মঠের নীচে বিশাল জনতা নিবেদিতাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'আমাদিগকে কিছু

বলুন!' নিবেদিতা সেই জনতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—'আমি কি সত্যই কিছু বলিব?' তাহারা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, 'না, কিছু বলিতে হইবে না, শুধু আশীর্বাদ জানান।' নিবেদিতা হাত তুলিয়া শুধু বলিলেন, 'ওয়া গুরু কি ফতে!' জনতার প্রতি তিনি কিছু ফুল ছড়াইয়া দিলেন। জনতাও প্রতিধ্বনি করিল—'ওয়া গুরু কি ফতে!' এবং তাঁহার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিল। তারপর নিবেদিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীজির কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল।"

বেলুড় মঠে নিবেদিতা কোনো বক্তৃতা করিলেন না, কারণ গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি সর্বদা তাঁহাকে ছায়ার মত অনুসরণ করিত। বক্তৃতা করিলে পাছে মঠের সন্ন্যাসীরা বিব্রত হন, এই আশঙ্কায় বুদ্ধিমতী নিবেদিতা সেদিন বক্তৃতা করিতে চাহিলেন না।

৩রা জুলাই। পুলিশ অতর্কিতে 'যুগান্তর' পত্রিকার কার্যালয়ে আসিয়া হানা দিল। খানাতল্লাস করিল। সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তখন নিবেদিতার নির্দেশে জামালপুরে। জামালপুরের হাঙ্গামার তদন্ত করিয়া দুই দিন পরে ভূপেন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় ফিরিয়া 'যুগান্তর' কার্যালয়ে আসিলেন, পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। 'বন্দেমাতরম্'-এ অরবিন্দ লিখিলেন—'আরো অত্যাচার চাই।' ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইবার পর নিবেদিতা পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

"'যুগান্তরের' দুইটি বিশেষ প্রবন্ধের জন্য আমাকে আসামী করা হইল। আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইল। মকদ্দমার সময়ে কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো যখন বিশ হাজার টাকা জামিন তলব করেন, তখন ভগিনী নিবেদিতা এই জামানৎ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং আদালতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।"

এই জামিনের ব্যাপারে 'ইংলিশম্যান' কাগজ নিবেদিতাকে দেশদ্রোহী বলিয়া গালি দিল। ভূপেন্দ্রনাথের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

হইল। বাংলায় ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভূপেন্দ্রনাথই প্রথম শহীদের গৌরব লাভ করিলেন। তিনি আদালতে হাসিমুখে এই দণ্ডের আদেশ গ্রহণ করিলেন। জেলে যাইবার সময়ে ভূপেন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে অনুরোধ করিলেন—"আমার মা-কে দেখিবেন।" নিবেদিতা বলিলেন—"ভূপেন, তুমি এ-বিষয় নিশ্চিন্ত থাক।"

ভূপেন্দ্রনাথ হাসিমুখে জেলে চলিয়া গেলেন।

নিবেদিতা দুই চক্ষু মেলিয়া তাহা দেখিলেন। চকিতে মনে পড়িল তাঁহার বিশ্ববিজয়ী গুরু বিবেকানন্দের কথা। বিবেকানন্দের ভাই-ই বটে! সেই তেজস্বিতা, সেই নির্ভীকতা। যেদিন মকদ্দমার রায় বাহির হইল, সেইদিন আদালত হইতে নিবেদিতা সোজা চলিয়া গেলেন, তিন নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে। ভূপেন্দ্রনাথের মায়ের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন—"মা, আজ আপনার আর একটা আনন্দের দিন। একদিন আপনার এক ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, আজ আর এক ছেলে দেশের কাজে প্রথম শহীদ হয়ে হাসি মুখে জেলে গেল। আপনি সত্যিই রত্নগর্ভা। আমি ভূপেনের ললাটে রক্ত-তিলক এঁকে দিয়েছি, মা।" ভুবনেশ্বরী স্তব্ধ হৃদয়ে নিবেদিতার কথাগুলি শুনিয়া গেলেন।

পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এইবার গিয়া পড়িল নিবেদিতার উপর। গ্রেপ্তার অথবা নির্বাসন—যে কোনো মুহূর্তে সম্ভব। গভর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদিতার কার্যকলাপ কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁহারা নিবেদিতা সম্পর্কে অতিশয় সজাগ ছিলেন—বিশেষ করিয়া কার্লাইল সাহেব, যিনি সার্কুলার জারি করিয়া 'বন্দেমাতরম্' নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। অরবিন্দ প্রমুখ জাতীয় দলের নেতারা নিবেদিতাকে তাই কিছুদিনের জন্য ভারত ছাড়িয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন :

"তাঁহাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইবে প্রায় স্থির হইল। তিনি হাসিলেন। নির্বাসন বা কারাগার তিনি কিছুরই ভয় করিতেন না। কিন্তু বন্ধুরা তাঁহাকে বুঝাইল যে ভারতের বাহিরে গিয়াও, তিনি ভারতের জন্য বহু কাজ করিতে পারিবেন—যাহা নির্বাসন বা কারাগারে থাকিয়া তিনি পারিবেন না। অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন। আগষ্ট মাসে দুই বৎসরের জন্য তিনি ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।"

যাইবার পূর্বে অরবিন্দের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেন—"মনে রাখিবেন, বিধাতা আপনার দক্ষিণ হস্তে কঠোর আদরে দুঃখের যে দারুণ দীপ দিয়াছেন—দেশের অন্ধকার বিদ্ধ করিয়া ধ্রুবতারার মত সেই আলো আজ জ্বলিয়াছে। আপনি বিপ্লবের রুদ্র-দূত। দেখিবেন—সে-আলো যেন নিভিয়া না যায়। সাগরপার হইতে আমি যেন আপনার জয়শঙ্খ শুনিতে পাই। ওয়া গুরু কি ফতে।"
কিন্তু বিদ্যালয়ের কি হইবে? বত্রিশ নাড়ির টান যে জড়াইয়া আছে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে—তাঁহার গুরুর আশীর্বাদ-পূত এই নিবেদিতা বিদ্যালয়। ইহাই তো তাঁহার কর্মের কেন্দ্র, সাধনার পীঠস্থান। ভগিনী ক্রিষ্টিন ও ভগিনী সুধীরাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমাদের ওপর স্কুলের ভার রইল। স্কুলের মেয়েদের শিক্ষার যেন কোনো ত্রুটি না হয়। যদি কখনো টাকার দরকার হয়—সোজা চলে যাবে জগদীশ বোসের কাছে।" দুয়ারে মঙ্গল-ঘট পাতিয়া মেয়েরা তাহাদের প্রিয় শিক্ষয়িত্রীকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইল। নিবেদিতার নয়নের অশ্রু আর বাধা মানিল না।

তারপর তরুণ বিপ্লবীদের কয়েকজনকে নিবেদিতা তাঁহার বাগবাজারের বাড়িতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার মধ্যে ছিলেন উল্লাসকর, বারীন্দ্র ও হেমচন্দ্র। নিবেদিতা তাঁহাদের বলিলেন—"তোমাদের একজন সহকর্মী জেলে গিয়েছে। তার শূন্য স্থান পূর্ণ করতে হবে।

তোমরা জেনো, কালের ভেরী বেজেছে, রুদ্রের আহ্বান এসেছে। আমি দেখেছি, দেশজননী তোমাদের ললাটে রক্ত-তিলক পরিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের সাম্‌নে অগ্নিপরীক্ষা। এই রুদ্রযজ্ঞে হয়ত তোমাদের কয়েকজনকে জীবনাহুতি দিতে হবে। তোমাদের এক হাতে অরবিন্দ তুলে দিয়েছেন গীতা আর অন্য হাতে আমি দিয়েছি বোমা। আমি যেন ফিরে এসে দেখি, তপ্ত রৌদ্র-দাহ উপেক্ষা করে বিপ্লবের পথে তোমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছ। ওয়া গুরু কি ফতে।" বিদায়ের কালে নাগমাতা নিবেদিতা বাংলার নাগশিশুদের শুনাইয়া গেলেন এই আশ্বাস বাণী। ইহাদের কাহারও পিছনের টান নাই, অতীতের সংস্কার নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতায় ইহাদের প্রত্যেকের হৃদয় উদ্ভাসিত। কিন্তু নিবেদিতাকে বিদায় দিতে গিয়া প্রত্যেকেরই চক্ষু সেদিন সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

নিবেদিতা ভারত ছাড়িয়া লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারাগার বা নির্বাসনের ভয়ে তিনি পলায়ন করেন নাই। চির নিঃশঙ্কচিত্ত তিনি। ইতিহাস-বিখ্যাত বিপ্লবীদের রীতি ইহাই। ভারতের বাহিরে আসিয়া ভারতের জন্য আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে পারিবেন আশা করিয়াই নিবেদিতা ভারত ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

নিবেদিতার এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"নিবেদিতা জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ গিয়া সমুদ্রে পড়িল। উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া নিবেদিতাকে লইয়া জাহাজ ভাসিয়া চলিল। নিবেদিতা জাহাজে একাকী কি ভাবিতেছিলেন? ১৮৯৯ সালের সেই জুন মাসে 'গোলকুণ্ডা' জাহাজে উঠিয়া নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত লণ্ডন যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ একত্রে জাহাজে বাস করিয়াছিলেন।

ডেকের উপর স্বামীজির সহিত একত্রে বেড়াইবার সময় কত জ্ঞান, ধর্ম ও পুণ্য কাহিনীর কথাই তিনি স্বামীজির মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। সে আজ আট বৎসর আগের কথা। আজ নিবেদিতা একা চলিয়াছেন। তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যের মধ্য হইতেই হঠাৎ চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বাগবাজারের ছোট বাড়িটির কথা মনে হইল। সেখানে যুবকের দল তাঁহাকে দিবারাত্র ঘিরিয়া থাকিত। তিনি একটি রিভলভার হাতে লইয়া তাহাদের সম্মুখে খেলা করিতেন, যেন হত্যা করা বা হত হওয়া কিছুই নয়। সেই যুবকদের শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

নিবেদিতা লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল ভারতবর্ষে—বাংলাদেশে—বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সেই ছোট্ট স্কুল বাড়িটিতে, যেখানে বসিয়া তিনি সহস্র রকম কর্মের আবর্ত রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব-পরিচিতেরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। লণ্ডন হইতে কিছু দূরে তিনি একটি সুন্দর বাগান বাড়ি ভাড়া করিলেন। মিঃ র‍্যাটক্লিফ তখন লণ্ডনে এবং নিবেদিতার বাড়ির অতি নিকটেই তিনি থাকিতেন। নিবেদিতা তাঁহার কাছে যাইতেন। নিবেদিতার কাজের জন্য র‍্যাটক্লিফকে তাঁহার প্রয়োজন ছিল। কাজেই লণ্ডনে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন না। অল্প কিছুদিন পরেই জগদীশচন্দ্র সস্ত্রীক লণ্ডনে আসিয়া নিবেদিতার সহিত মিলিত হইলেন। নিবেদিতা লণ্ডনে আসিয়া প্রিন্স ক্রোপোটকিনের নিকটও যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ভারতবর্ষ—তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন, এবং বুদ্ধি পরামর্শ লইতেন। এইরূপে লণ্ডন-সমাজ তাঁহার মনকে সতেজ করিয়া তুলিল। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সহিত তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহার কথাবার্তায় আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহার

কর্মপন্থাকে সমর্থন করিল। শুধু রাজনীতির কথাই নয়, ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়াও মাথা ঘামাইতেন। আর সময় পাইলেই পার্লামেণ্টে হাউস অব কমনস্-এ যাইতেন। সেখানে তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। নিবেদিতা উহা শুনিতেন।

বহুকাল পরে নিবেদিতা লণ্ডনের সংবাদপত্র জগতে আবার সাংবাদিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। লণ্ডনের কয়েকটি সংবাদপত্রে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কথা আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের একটি বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরিলেন। "নীলাস্'—এই ছদ্মনামে তিনি ভারতের রাজনীতির কথা লিখিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি ভারতের অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমতকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আবার বাংলা দেশের কাগজে, লণ্ডনে ভারতীয় রাজনীতির যে প্রতিক্রিয়া চলিতেছিল, তাহার সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। ১৯০৭ সালের গোড়ার দিকেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজি মাসিক পত্র 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রকাশিত হইয়াছিল। নিবেদিতা প্রথম হইতেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাই লণ্ডনে আসিয়াও তিনি 'মডার্ণ রিভিয়ুর' জন্য নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি পাঠাইতে লাগিলেন। এইভাবে এখানেও তিনি নানা কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। সে-কাজ—ভারতের কাজ। সে-কাজ—তাঁহারই গুরুর কাজ।

দিন যায়।

ভারতবর্ষ হইতে নিবেদিতা একটি একটি করিয়া ভীষণ সংবাদ পাইতে লাগিলেন।

সংবাদপত্র-দলনের সূচনা তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

এখন লণ্ডনে বসিয়া সংবাদ পাইলেন, 'বন্দেমাতরম'-এর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হইয়াছিল। বিচারে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু এই মকদ্দমায় ইংরেজের আদালতে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হইয়া বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। কিংসফোর্ডের আদালতের সম্মুখে চৌদ্দ বৎসরের বালক সুশীলকে প্রচণ্ড বেত্রাঘাতের দণ্ড দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদ আসিল, উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন রাজদ্রোহের অভিযোগে। ইংরেজের আদালতে কৈফিয়ৎ দিতে তিনিও অস্বীকৃত হইয়াছেন। 'সন্ধ্যা'র মামলার সংবাদের জন্য লণ্ডনে উৎকণ্ঠায় নিবেদিতা যখন দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট একদিন দুঃসংবাদ গিয়া পৌঁছিল— উপাধ্যায় আর নাই। বিচারাধীন অবস্থায় হাসপাতালে তিনি মারা গিয়াছেন। এই মর্মান্তিক সংবাদ নিবেদিতার মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। উপাধ্যায় নাই, নিবেদিতার মনে হইল, সন্ধ্যা'র প্রদীপও তাহা হইলে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। বিবেকানন্দের মৃত্যু হইলে নিবেদিতা অশ্রুপাত করেন নাই। কিন্তু উপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে বিচলিত করিল—অশ্রু সম্বরণ করা নিবেদিতার পক্ষে কঠিন হইল। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার মন অতীতের দিকে ছুটিয়া গেল—সেই বেলুড়ে গঙ্গার তীরে স্বামীজির প্রজ্জ্বলিত চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান সমুন্নত দেহ, বীর্যবান গৈরিকবসন-পরিহিত উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কথা নিবেদিতার আজ আর একবার মনে পড়িল। সেই পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা, সেই দুর্জয় সাহসের জীবন্ত বিগ্রহ! তাঁহারই আজ জীবনাবসান হইল হাসপাতালে এমন মর্মন্তুদ অবস্থার মধ্যে! জ্যোতিষ্কের ন্যায় তাঁহার আবির্ভাব, তাঁহার মৃত্যুও জ্যোতিষ্কের মতই—নিবেদিতা ভাবিলেন। ইংরেজের সেই প্রবলতম

শত্রু আর নাই ; স্বাধীনতার পতাকাবাহী সেই নির্ভীক সৈনিক আর নাই, ইহা ভাবিতেই নিবেদিতা যেন শোকে ভাঙিয়া পড়িলেন। সেই স্বদেশপ্রেমিক সহকর্মীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিতা নীরবে তাঁহার লণ্ডনের আবাসে বসিয়া তপ্ত অশ্রু বিসর্জন করিলেন আর অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিলেন—ওয়া গুরু কি ফতে।

দিন যায়।

সংবাদ আসিল—মুরারীপুকুর বাগানে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছে। সংবাদ আসিল—সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়া বড়লাট আইন পাশ করিয়াছেন। সংবাদপত্র গিয়াছে, এইবার প্রকাশ্য সভাসমিতি বন্ধ হইবে। সংবাদ আসিল—ছোটলাট ফ্রেজারের ট্রেন উল্টাইবার জন্য লাইনের উপর বোমা ফাটান হইয়াছে। ইহার নেপথ্য নায়ক ছিলেন অরবিন্দ। সংবাদ আসিল—গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালেনকে গুলি করা হইয়াছে। তারপরই সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞের সংবাদ পাইলেন নিবেদিতা। চন্দননগরে মেয়রের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিপ্লবী যুবকদের এই সব অসমসাহসিক বৈপ্লবিক কার্যের সংবাদে নিবেদিতা বুঝিলেন, বাংলাদেশে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

১৯০৭ শেষ হইয়া ১৯০৮ আরম্ভ হইল।

সংবাদপত্র আইনের বলে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে। এইবার নিবেদিতা বুঝিতে পারিলেন, লণ্ডনে তাঁহার কি কাজ। য়ুরোপে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে-সব ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা পলাতক জীবন যাপন

করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে তাঁহাকে। আর নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলি আবার গোপনে ছাপাইয়া বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাঁহাকে। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তিনি এই কার্যে ব্রতী হইলেন। বাংলার স্বদেশীর এই প্রজ্জ্বলিত অবস্থার উত্তাপ লণ্ডনে নিবেদিতার দেহমনকে ছাইয়া ফেলিল। তাঁহার অন্তরে বিপ্লবের যে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল তাহা আরো লেলিহান হইয়া উঠিল।

১৯০৮। মে মাস। ভারতবর্ষ হইতে নিদারুণ সংবাদ আসিল। মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর বোমা ছুঁড়িতে গিয়া কিশোর বিপ্লবী-যুগল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী দুইজন ইংরেজ মহিলাকে ভ্রমক্রমে নিহত করিয়াছে। অরবিন্দ প্রমুখ ৪৭ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদ আসিল—মজঃফরপুরের বোমার ব্যাপারে প্রবন্ধ লিখিবার ফলে টিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে এবং মহারাষ্ট্রের সিংহকে মান্দালয় দুর্গে আবদ্ধ করা হইয়াছে। সংবাদ আসিল—ক্ষুদিরামের ফাঁসী হইয়াছে। সংবাদ আসিল—আলিপুর জেলে সত্যেন ও কানাই রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজের জেলের মধ্যে বিপ্লবীরা যে এমন অভাবনীয় কাণ্ড করিতে পারিয়াছে—ইহাতে নিবেদিতার অন্তরের বিপ্লবী নারী উল্লসিত না হইয়া পারিল না। সংবাদ আসিল—ওভারটুন হলে ছোটলাট ফ্রেজারকে গুলী করা হইয়াছে। প্রকাশ্য রাজপথে পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জিকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। অবশেষে সংবাদ আসিল যে, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রমুখ নয়জন জাতীয়তাবাদী নেতাকে বিনা বিচারে বাংলা হইতে দূর দেশান্তরে নির্বাসিত করা হইয়াছে। এইসব সংবাদ শুনিয়া নিবেদিতার মনে হইল, ভূপেন্দ্র-

নাথের কারাদণ্ডের সময়ে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম'-এ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'আরো অত্যাচার' চাহিয়াছিলেন। অত্যাচারের চরম হইল। বাঙালির এই অকুতোভয়তার শিক্ষাগুরু সেদিন ছিলেন এই নিবেদিতা।

আয়ার্ল্যাণ্ডে একমাস থাকিয়া নিবেদিতা ১৯০৮-এর অক্টোবরে আমেরিকা আসিয়া পৌঁছিলেন। নিবেদিতা আমেরিকা পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের পলাতক বিপ্লবী যুবকগণ বিবেকানন্দের অন্যতমা মার্কিন শিষ্যা মিসেস ওলি বুলের আশ্রয়ে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথ এগার মাস জেল খাটিয়া এই একই সময়ে আমেরিকা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আমেরিকায় আসিয়া শুধু সাংবাদিকের দায় নয়, এইসব পলাতক বিপ্লবীদের মায়ের স্থানও লইতে হইল নিবেদিতাকে। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন নিবেদিতা এবং তাহারা যাহাতে নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে এবং লেখাপড়া শিখিতে পারে তাহার জন্য যথোচিত ব্যবস্থাও করিলেন নিবেদিতা। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন তিন মাসের মধ্যেই। এক নিবেদিতা ভিন্ন আর কে এই কাজ করিতে পারিতেন? এমন কি, কে কি পড়িবে, তাহাও ঠিক করিয়া দিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তাঁহার পাঠ্যতালিকা নিবেদিতাই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ না করিবার জন্য অনুরোধ তিনিই করিয়াছিলেন।

আমেরিকা হইতে তিন মাস পরে সংবাদ পাইয়া মুমূর্ষু মা-কে দেখিবার জন্য নিবেদিতা ইংলণ্ডে আসিলেন। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন :

"হোয়ার্ফ ভেলে বার্লিতে বোনের বাড়ি। সময় থাকিতেই পৌছিলেন নিবেদিতা। ইসাবেল তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি জানিতেন মেয়ে আসিবেই। যাঁহার পায়ে সন্তানকে উৎসর্গ করিয়াছেন, শেষ মুহূর্তে নিবেদিতাকে তিনি দূরে সরাইয়া রাখিবেন না। কামনা-বাসনা সমস্ত বিসর্জন দিয়া যেন রুদ্ধশ্বাস নিস্পন্দ দেহে অপেক্ষায় ছিলেন ইসাবেল—তাঁহার মার্গারেট আসিবার পূর্বেই পাছে জীবনের দীপ নিভিয়া যায়। নিবেদিতা আসিয়া ধীরে ধীরে অমৃতলোকের দূতের মত মায়ের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু। বলিলেন—"মা, মৃত্যু তো একটা নবজন্ম শুধু। আমার প্রার্থনা আর ভালবাসা তোমার সঙ্গী হোক্।"

১৯০৯। জুনের শেষ। আর প্রবাসে থাকিতে নিবেদিতার মন চাহিল না। ভারতবর্ষে যাইবার জন্য তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। বসু-দম্পতীর সহিত তিনি বার্লিন হইয়া ১লা জুলাই জেনেভায় আসিলেন। জেনেভায় আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে, লণ্ডনে মদনলাল-ধিঙড়া নামক একজন পাঞ্জাবী যুবক কার্জন উইলিকে হত্যা করিয়াছে। নিবেদিতা বুঝিলেন, বিপ্লবের অগ্নিশিখা ভারতের বাহিরেও পরিব্যাপ্ত হইতে চলিয়াছে। চারিদিকের আকাশ থম্ থম্ করিতেছে। এই সঙ্কটের মধ্যে নিবেদিতা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। জাহাজে উঠিবার সময়েই তিনি বেশ পরিবর্তন করিলেন ও মিস মার্গট এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন। সেই নামেই এবং সেই পোষাকেই জুলাই মাসের মাঝামাঝি একদিন তিনি একাকী বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। কেহ কিছুই সন্দেহ করিল না।

এই ছদ্মবেশের প্রয়োজন ছিল। কারণ, তিনি ভারতে ফিরিবেন শুনিয়া বন্ধুরা নিবেদিতাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি এখানকার মাটিতে পা দিলেই পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবে।

১৯০৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি এক অপরাহ্ণে বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামিলেন এক সুবেশা য়ুরোপীয় মহিলা। পাসপোর্টে নাম লেখা রহিয়াছে—মিস মার্গট। জাহাজ তখনো বন্দরে পৌঁছায় নাই। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই মহিলা এক প্রিয়দর্শন ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আরেকজন ভারতীয় মহিলা—সেই ভারতীয়েরই স্ত্রী তিনি। বন্দরে জাহাজ ভিড়িবার পূর্বেই য়ুরোপীয় মহিলাটি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। অবশেষে জাহাজ বন্দরে ভিড়িল। মহিলাটি ধীর পদবিক্ষেপে অন্যান্য যাত্রীদের সহিত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। পরিধানে নূতন ফ্যাসনের পরিচ্ছদ, মাথায় পালক-লাগানো বড় একটি শাদা টুপি আর নিখুঁত কাট-ছাঁটের গাউন পরনে।

এই মহিলা নিবেদিতা।

সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই তিনি ভারতে ফিরিলেন। কেহ কিছুই সন্দেহ করিল না। বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্যন্ত নিবেদিতা রিজার্ভ কামরায় আসিলেন। সতর্ক এবং অভিজ্ঞ বিপ্লবী তিনি। তাই সোজা পথে না আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে কলিকাতায় আসিলেন। ছদ্মবেশেই বাগবাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিন সপ্তাহ তিনি ঘরের বাহির হইলেন না। তখনো সেই বাড়ির ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের গতিবিধির উপর পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে। নিবেদিতার ফ্যাসান-দুরস্ত সাজ-পোষাকে কাহারও মনে কোনো সন্দেহ জাগিল না। আরো কিছুকাল তিনি এইভাবে নির্বিবাদে শহরে ঘোরাফেরা করিয়া পুরাতন কর্মকেন্দ্রগুলির সহিত পুনরায় যোগস্থাপন করিলেন।

॥ কুড়ি ॥

নিবেদিতা কলিকাতায় পৌঁছিবার তিন মাস পূর্বেই অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হইয়া, এক বৎসর কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। নিবেদিতা আসিয়া দেখিলেন বিপ্লবের আন্দোলন স্তিমিত—দমন-নীতির প্রকোপে সারা বাংলা যেন ত্রস্ত; 'বন্দেমাতরম্'-এর তূর্য-নিনাদ নিস্তব্ধ। যখন তখন যেখানে-সেখানে সন্দেহবশে খানাতল্লাসী লাগিয়াই আছে। ইহার প্রত্যুত্তরে যেখানে-সেখানে বোমা ফাটিতেছে। বাংলার আবহাওয়া আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আলিপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্র-প্রমুখ পনর-জনের কঠিন শাস্তি হইয়াছে। টিলক প্রভৃতি অন্যান্য নেতাদের কেহ দ্বীপান্তরে, কেহ কারাগারে, কেহ বা কোনো দুর্গে বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন। বিপ্লবীদের কেহ আত্মগোপন করিয়াছেন ঘন অরণ্যে, কেহবা গৈরিকবাসের অন্তরালে। বেলুর মঠ পর্যন্ত পুলিশের দৃষ্টি হইতে রেহাই পায় নাই। এই পরিস্থিতির মধ্যে নিবেদিতা সেদিন ছদ্মবেশে কলিকাতায় ফিরিলেন। অরবিন্দ অধীর আগ্রহে নিবেদিতার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নিবেদিতার সহিত সন্ত্রাসবাদীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—ইহা মঠের কর্তৃপক্ষ জানিতেন। তাই নিবেদিতা ফিরিয়াছেন শুনিবামাত্র মঠের অধ্যক্ষ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংবাদপত্রে দ্বিতীয়বার ঘোষণা করিলেন যে, নিবেদিতার কার্যাবলী ও দলের সহিত রামকৃষ্ণ মিশন বা বেলুড় মঠের কোনই সংস্রব নাই।

আর তাঁহার বিদ্যালয়? নিবেদিতা আসিয়া দেখিলেন বিদ্যালয়টি আর চলে না। চারি মাস বন্ধ ছিল। ভগিনী ক্রিষ্টিন আমেরিকায় গিয়াছেন। অর্থেরও অত্যন্ত অভাব। বিবেকানন্দ এই একটি দায়িত্ব তাঁহাকে দিয়া গিয়াছিলেন—ইহার সহিত তাঁহার স্মৃতিও বিজড়িত। অতএব যেমন করিয়াই হউক বিদ্যালয়টিকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। নিবেদিতা ইহার পরিচালনার ভার তখন রামকৃষ্ণ-মিশনের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

৬নং কলেজ স্কোয়ার।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়।

একদিন নিবেদিতা আসিলেন এইখানে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। দুই বৎসর পরে অরবিন্দ ও নিবেদিতা পুনরায় মিলিত হইলেন। নিবেদিতা আসিয়া দেখিলেন, অরবিন্দ বদলাইয়া গিয়াছেন। শীর্ণ মুখের মধ্যে অন্তর্ভেদী চক্ষু দুইটি কেবলমাত্র জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। এ যেন নূতন অরবিন্দ, নিবেদিতার মনে হইল। দুইজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। অরবিন্দের টেবিলের উপর একখানি পত্রিকা পড়িয়াছিল। নিবেদিতা উহা উঠাইয়া লইয়া দেখিলেন ইংরেজিতে লেখা রহিয়াছে: 'কর্মযোগিন্'। প্রচ্ছদপটে কুরুক্ষেত্রের রথী ও সারথির চিত্র—তাহার নিম্নে গীতার সেই অমরবাণী উদ্ধৃত: "তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। সম্পাদক—অরবিন্দ ঘোষ।

নিবেদিতা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক বছর তো জেলে ছিলেন, কি করে কাটালেন?"

অরবিন্দ। যোগের অনুশীলন করেছিলাম এই সময়ে। জেলে গীতা আর উপনিষদ কাছে ছিল। গীতার সাহায্যে যোগ আর উপনিষদের সাহায্যে ধ্যান করতাম।

নিবেদিতা। জেলে আর কি নতুন অনুভূতি হলো আপনার ?

অরবিন্দ। বিচিত্র সেই অনুভূতি—অবিশ্রাম বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর শুনেছি; তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করেছি। পনর দিন ধরে তিনি আমার সঙ্গে কথা কয়েছেন।

নিবেদিতার সমস্ত দেহ-মন শিহরিয়া উঠিল।

তারপর অরবিন্দ বলিলেন, "জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম অনুবর্তীরা সবাই নিরুদ্যম, দলে ভাঙন ধরেছে। এবার আমার সাধনা হলো কর্মযোগীর আর মুখপত্র এই নতুন কাগজ 'কর্মযোগিন্'। এতদিন বলে এসেছি জাতীয়তাবাদ ধর্ম, এখন থেকে প্রচার করব সনাতন ধর্মই জাতীয়তাবাদ। বলব, সনাতন ধর্ম বিশ্বাসের ধর্ম নয়, জীবনে ফুটিয়ে তোলার ধর্ম। আরো বলব যে, কেবল রাজনীতি করলেই চলবে না, দেশের জীবন নতুন করে গড়তে হবে।"

নির্বাক্ বিস্ময়ে নিবেদিতা শুনিতেছিলেন অরবিন্দের কথাগুলি। তাঁহার মনে হইল সদ্য কারামুক্ত রাজবিদ্রোহীর কণ্ঠে নূতন সুর আর 'বন্দেমাতরম্' অপেক্ষা গভীরতর সুর 'কর্মযোগিন্'-এর। বুঝিলেন, বহু শতাব্দীর ইতিহাস অতিক্রম করিয়া কুরুক্ষেত্রের রণভূমি হইতে আসিয়াছে সেই মহামানবের বাণী: "হে অর্জুন! তুমি যোগী হও, যোগই কর্মের কৌশল।" সেই বাণীই আজ অরবিন্দের কর্মযোগিন্-এর রচনায় প্রতিধ্বনিত। কিন্তু সেই সঙ্গে নিবেদিতার ইহাও মনে হইল যে, অরবিন্দের মতের এই বিপরীতমুখী পবিবর্তন লোকে সহজে গ্রহণ করিবে না, হয়ত কেহ উপহাসও করিবে। কিন্তু নিবেদিতা ইহাও জানেন যে, মানুষের মুখ চাহিয়া কথা বলিবার মানুষ অরবিন্দ নহেন। তাঁহার সাধনা পুঁথির নির্দেশ মানিয়া চলে নাই কোনো দিন; তাহার ভিত্তি ছিল অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত অনুভূতি। তাঁহার চিত্তের প্রতিষ্ঠাভূমি ভারতীয় আদর্শের মধ্যেই।

"আসল কথা কি জানেন," অরবিন্দ বলিলেন, "জেলে থাকিতেই বুঝেছিলাম—কর্মপন্থার পরিবর্তন দরকার। জাগ্রত দেশাত্মবোধকে আমি তাই উত্তেজনার পথ থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে চাই। দেশের স্বাধীনতা এখনো আমার ধ্যান-জ্ঞান, জানবেন। আসুন, আবার আমরা দেশকে ডাক দিই—ঝিমিয়ে-পড়া সমাজের বুকে আবার দেশ-হিতৈষণার আগুন জ্বালিয়ে তুলি। নিষ্ক্রিয় নয়, শক্তির সক্রিয় রূপ দেখ্‌তে চাই। 'কর্মযোগিন'-এ লিখবেন ত? আমি আপনার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।"

নিবেদিতা। নিশ্চয়ই লিখব। আপনার এই অনুভূতির মধ্যেই দুই যুগের সন্ধি হবে, দেখতে পাচ্ছি।

সেদিনের মত নিবেদিতা অরবিন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন। আসিবার পথে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে 'মডার্ন রিভিয়ু' অফিসে রামানন্দ বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসিলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর নিবেদিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধিঙ্‌ড়ার কাজকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ও কাপুরুষোচিত বলে নিন্দে করলেন কেন?"

রামানন্দ। আমার মতে রাজনৈতিক গুপ্ত-হত্যার দ্বারা কোনো দেশ বড় হয় না।

নিবেদিতা। বড় হয় না, কিন্তু স্বাধীন হয়। থাক সে কথা—কাগজ কেমন চলেছে, আপনার?

রামানন্দ। ভালই। ঠিকই বলেছিলেন আপনি, ইংরেজি কাগজের অনেক সুবিধে। আপনার লেখা চাই।

নিবেদিতা। নিশ্চয়ই লিখিব।

রামানন্দ বাবুর নিকট হইতে নিবেদিতা চলিলেন জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে দেখিতে। সেখান হইতে ফিরিবার

পথে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে ভুবনেশ্বরীকে একবার দেখিয়া আসিলেন। অনেক দিন তিনি পুত্রের সংবাদ পান নাই। নিবেদিতা তাঁহাকে ভূপেন্দ্রনাথের সমস্ত সংবাদ দিয়া নিরুদ্বিগ্ন করিলেন। ভুবনেশ্বরীকে দেখিয়া নিবেদিতা আসিলেন উদ্বোধন-বাটিতে সঙ্ঘজননী সারদা দেবীকে দেখিতে। ভক্তেরা মায়ের জন্য কলিকাতায় এই নূতন ভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সম্মুখে উন্মুক্ত মাঠ, অদূরে ভাগীরথী ; ছাদে উঠিলেই গঙ্গাদর্শন হয়। উত্তরে সুদূরে দৃষ্টিপাত করিলে দক্ষিণেশ্বরের দেবদারু বৃক্ষগুলির শীর্ষ নয়নপথে পতিত হয়। নিবেদিতা শুনিলেন, এই মনোরম পরিবেশে নূতন বাড়িতে আসিয়া সারদা দেবীর খুব আনন্দ হইয়াছে। বাড়ির দ্বিতলে ঠাকুরঘরে বেদীর উপর অধিষ্ঠিত রামকৃষ্ণের বিগ্রহ। নিবেদিতা আসিয়া সারদা দেবীকে প্রণাম করিলেন। সারদা দেবী তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "ঐ দ্যাখো, খুকী, সেই যে রেশমী চাঁদোয়াটা তুমি করে দিয়েছিলে, সেইটা ঠাকুরের বেদীর ওপরে টাঙিয়ে দিয়েছি। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, না ? ছেলেরা এই বাড়ি করে দিয়েছে।" সারদা দেবী নিবেদিতাকে আদর করিয়া 'খুকী' বলিয়া ডাকিতেন। তারপর দুই-একটি কথা বলিয়া পবিত্রতা ও সরলতার প্রতিমা সারদা দেবীকে প্রণাম করিয়া নিবেদিতা বাড়ি ফিরিলেন।

গভীর রাত্রি। আজ অরবিন্দকে দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া নিবেদিতার মনে হইল তিনি যেন নবজীবনের মূর্ত প্রতীক, ভারতের পুরাতন মাটিতে উদ্ভিন্ন নবযুগের অঙ্কুর। মনে হইল, তাঁহার গুরু দেশকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন অরবিন্দ যেন তাহারই যুক্তিসিদ্ধ ফলশ্রুতি। স্বামীজির সাধন-সংবেগ আজ যেন অরবিন্দের জীবনে খরস্রোত হইয়াছে। মনে পড়িল বিবেকানন্দের সেই বজ্রনির্ঘোষ—

"হে ভারত, ওঠ, জাগ।" রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে নিবেদিতা যেন সেই কণ্ঠস্বর নূতন করিয়া শুনিতে পাইলেন অরবিন্দের কথাগুলির মধ্যে। তাঁহার অন্তর বলিয়া উঠিল—ভারতের প্রাচীন আচার্যদের উত্তরপুরুষ এই অরবিন্দ। যোগ-চেতনার গঙ্গোত্রী হইতে চিৎশক্তির মুক্তধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিবেন তিনি সকলের জন্য। ক্ষত্রবীর আজ যোগী।

সেদিন নিবেদিতার মতন আর একজন অরবিন্দকে ঠিক এই ভাবে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। দেশের পক্ষ হইতে, জাতির পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই রাজবিদ্রোহীকে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করিয়া লিখিয়াছিলেন: "হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তুমি।"

অরবিন্দ ও নিবেদিতা যে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়াছেন, ইতিমধ্যে তাহা ভারতের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কারামুক্তির পর অরবিন্দের পরিবর্তিত কর্মপন্থা দেখিয়া এবং তাঁহার 'কর্মযোগিন্' এবং 'ধর্ম' কাগজ দুইখানিতে নূতন সুর শুনিয়া যে যাহাই বলুক, ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিবে যে, এই দুই মহাবিপ্লবীই বিংশ শতকের প্রথম দশকে ভারতে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

এই বৎসরের নভেম্বর মাসে রমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হইল।

ঊনবিংশ শতকের বাংলার প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল দীপ নিভিয়া গেল! নিবেদিতা গভীর শোক প্রকাশ করিলেন। রমেশচন্দ্র নিবেদিতাকে কন্যার মত দেখিতেন এবং স্নেহ করিতেন। বিদুষী নিবেদিতাও রমেশচন্দ্রের অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের সহযোগিতা ও প্রেরণাতেই তিনি তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ "দি ওয়েব্ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে অরবিন্দও নিবেদিতার অনুরোধে একটি মর্মস্পর্শী সম্পাদকীয় লিখিলেন।

১৯০৯। ডিসেম্বর।

ইংলণ্ড হইতে হ্যাভেলের বন্ধু ডক্টর হেরিংহামের পত্নী বিখ্যাত মহিলা চিত্রশিল্পী লেডি হেরিংহাম ভারতবর্ষে আসিলেন। উদ্দেশ্য—অজন্তা গুহা চিত্রাবলীর নকল লইবেন। তাঁহার সহিত ইংলণ্ড হইতে আরো দুইজন মহিলা শিল্পী আসিলেন। মিসেস হেরিংহামের সহিত নিবেদিতার পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। এই সংবাদ পাইয়া নিবেদিতা তখনি অবনীন্দ্রনাথকে বলিলেন—"নন্দলাল ও অসিতকে এঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, তার কাজে সাহায্য করবে। দু'পক্ষেরই উপকার হবে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।" নন্দলাল বসু ও অসিতকুমারের অজন্তা যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা নিবেদিতাই উদ্যোগী হইয়া করিয়াছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে বলিতেন: "নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হতো না অজন্তায়।"

এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার হালদার লিখিয়াছেন:

"লেডি হেরিংহাম যখন অজন্তায় এলেন, সঙ্গে তাঁর এলেন মিস লিউক, মিস লারচার—দু'জন বিলাতী মহিলা শিল্পী। হায়দ্রাবাদ থেকে ফজলুদ্দিন কাজী এবং সৈয়াদ আহমাদ এলেন। আমি ও নন্দলাল গেলাম প্রথমে ১৯০৯ সালের শীতের প্রারম্ভে অজন্তায়। প্রথমে আমরা দু'জন যাবার পর অবনমামা সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ভেঙ্কটাপ্পাকে পাঠালেন আমাদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে অজন্তায়। ১৯১০-এর গোড়ার দিকে আমাদের কাজে উৎসাহ দেবার জন্য নিবেদিতা সুদূর অজন্তায় লেডি অবলা বোস ও ডক্টর বোসকে নিয়ে আমাদের কাছে গিয়েছিলেন। অজন্তায় থাকাকালে একদিন একটি হনুমানজির মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা বলেছিলেন, 'আমার খুব ইচ্ছা, এই গ্রাম্য দেবতার মন্দিরটিকে অবলম্বন করে একটি বই লিখব। আর তুমি, নন্দলাল তার জন্য ছবি আঁকবে!' আমাকে বললেন লিরিক্যাল বিষয়

আঁকতে এবং নন্দকে ক্লাসিকাল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভগ্নী নিবেদিতার বইখানি লেখা শেষ হবার পুর্বেই অকালে দেহান্ত হয়।…আমরা তখনকার কয়েকজন জাতীয় শিল্পকলার পুনরুদ্ধারের জন্য যে কাজ করেছি তাতে ভগ্নি নিবেদিতার উৎসাহ যে বল দিয়েছে তা লিখে বোঝান অসাধ্য।"

বিপ্লবী নায়িকার এই শিল্প-ভারতী রূপ ভারতের শিল্প-জাগরণের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোনোদিনই মুছিয়া যাইবার নহে।

ভারতীয় শিল্পীদের পক্ষে অজন্তা শৈলীর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় পাওয়ার সুযোগ হওয়ায় তাহাদের দেশী আর্টকে বুঝিবার জন্য তৃতীয় নয়ন খুলিয়া গিয়াছিল এবং ইহার মূলে যে নিবেদিতা, সে-কথা অবনীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহার এক চরিতকার লিখিয়াছেন :

"এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা দেশেই নূতন ধরণের প্রাচ্য রীতিতে ভারতীয় চিত্রকলার উদ্ভব হয়। প্রসবাগারে ভগিনী নিবেদিতাই ইহার প্রথম ও প্রধান ধাত্রী। ইহা মনে করিয়া তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পারি না।"

এই প্রসঙ্গে আরো একটু ইতিহাস আছে। সম্ভবতঃ অনেকেরই তাহা জানা নাই। বাঙালি শিল্পীরা যখন অজন্তায় কাজ করিতেছেন তখন "হঠাৎ একদিন শোনা গেল বোম্বাইয়ের লাট আসিতেছেন অজন্তা দেখিতে। ভারত সরকার নির্দেশ পাঠাইলেন বাংলা দেশাগত শিল্পীদের লাটসাহেব আসার কালে, ফরদাপুর ক্যাম্প হইতে দূরে কোথাও সরাইয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিতে। এই রকম সরকারী হুকুমের কথা শুনিয়া লেডি হেরিংহাম তো রাগিয়া আগুন। তিনি তখনি কলিকাতায় নিবেদিতাকে এক চিঠিতে ইহা জানাইয়া দিলেন। উত্তরে নিবেদিতা হেরিংহামকে জানাইলেন—'এ অত্যন্ত অন্যায়, তুমি এর প্রশ্রয় দিও না।' তারপর লেডি হেরিংহাম বাঙালি শিল্পীদের সঙ্গে লইয়া নিজেই চলিয়া গেলেন। লাট আসিলেন না, আসিলেন কমিশনার। কমিশনার আসিলেন লেডি হেরিংহামের তাঁবুতে। লেডি সাহেবা ক্রোধে উন্মত্ত—তাঁহার সহিত করমর্দন পর্যন্ত করিলেন না।"

অজন্তা সম্পর্কে নিবেদিতার বর্ণনা অতি মনোরম। মুগ্ধ হৃদয়ে তিনি লিখিয়াছেন :

"যেমন কালিদাসের মহাকাব্য, তেমনি অজন্তার চিত্রকলা। ইহার নিকটে দাঁড়াইয়া অন্যদিকে আর দৃষ্টি ফিরাইতে কখনই ইচ্ছা হয় না। নয় শত বৎসরের ধারাবাহিক শিল্পকলার ক্রমসূচী এই অজন্তার উনত্রিশটি গুহায় আজো প্রাণবন্ত। অজন্তা শৈলীর ঐশ্বর্য সত্যই পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসের বিস্ময়। অজন্তার চিত্রাবলী চক্ষে যেন মায়া-অঞ্জন বুলাইয়া দেয়—দৃষ্টি এখানে ধন্য হয় রূপের সাগরে অবগাহন করিয়া। এই স্বপ্নলোকে যাহা কিছু দেখিলাম সবই অপূর্ব সুন্দর—এ সৌন্দর্যের তুলনা নাই।

অরবিন্দের সহিত নিবেদিতা আবার কর্মক্ষেত্রে নামিলেন। অরবিন্দ বাংলার নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, জাতীয় দলকে কর্তব্য সাধনে আহ্বান করিলেন। এই ভাবে লেখনী ও বক্তৃতার দ্বারা তিনি পুনরায় বাঙলাকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর দেশের যেন আগেকার মত সাড়া দিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজনীতিক আন্দোলন একেবারে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। একা তিনি কি করিবেন? একদিকে মধ্যপন্থীদের বিপক্ষতা, অন্যদিকে জাতীয় দলে নেতার অভাব। ১৯১০ সালের লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি মালব্য প্রকাশ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের নিন্দা করিলেন; কোনো সংবাদপত্রই তাহার প্রতিবাদ করিল না। এই কংগ্রেসে তিলক নাই, বিপিনচন্দ্র নাই, অরবিন্দ নাই, এমন কি নিবেদিতাও নাই, যে নিবেদিতার প্রভাব কাশী কংগ্রেসে সকল দলের নেতাই অনুভব করিয়াছিলেন। 'দেশবাসীর সেই তেজ ও সাহস যেন কোথায় আজ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

দেশের ভাগ্যচক্র তখন অন্যদিকে ঘুরিতেছে।

১৯১০-এর প্রারম্ভেই ইংলণ্ড হইতে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ভারতে আসিয়া পৌঁছিল। ঠিক এই সময়েই বাংলার নির্বাসিত নেতৃবৃন্দ মুক্তি পাইলেন। নিবেদিতা এই নির্বাসিতদের মুক্তি উপলক্ষে তাঁহার বিদ্যালয়ের তোরণদ্বারে মঙ্গল-ঘট পাতিয়া উহা কদলী বৃক্ষ ও আম্রপল্লবে সজ্জিত করিলেন।

এই সময়ে একদিন নিবেদিতা অরবিন্দকে বলিলেন—"শুনিলাম সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন বসু ইঁহারা এই শাসন-সংস্কার মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন ?"

অরবিন্দ। মডারেটদের পক্ষে এ-ই স্বাভাবিক। আপনার গোখলেও তো এই ভুয়া সংস্কার দুই হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

নিবেদিতা। আর একবার ইহার বিরুদ্ধে কলম ধরুন। দেশের লোককে বুঝাইয়া দিন, এই শাসন-সংস্কার ভারতবাসী যেন প্রত্যাখ্যান করে।

অরবিন্দ। কলম ধরিতে পারি ; কিন্তু দেখিতেছি, দেশের ভাগ্যচক্র এখন অন্যদিকে ঘুরিতেছে। লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতার প্রতিবাদ তো করিলাম—কত করিয়া বলিলাম, ভারতের সন্ত্রাসবাদীরা অরাজকতা চাহে না, কোনো সায় দিলেন ?

নিবেদিতা। কিন্তু আপনি তো লোকের মুখ চাহিয়া কাজ করেন না।

তারপরই 'ধর্ম' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় অরবিন্দ লিখিলেন :

"শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদ-নীতি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে লর্ড মর্লি তাহা রোপণ করিয়াছেন ; দেশহিতৈষী গোখলে মহাশয় জল সিঞ্চন করিয়া তাহা সযত্নে পালন করিতেছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে ছলনা করা—ভেদনীতির ইহাই দ্বিতীয় অঙ্গ এবং শাসন-সংস্কারের বিষময় ফল। এই সংস্কারে বাঙালীর লেশমাত্র আস্থা নাই।"

কিন্তু অরবিন্দ ও নিবেদিতার সকল চেষ্টা বিফল হইল।

লোকমুখে লেডি মিন্টো শুনিলেন যে, উত্তর কলিকাতার এক অপরিসর অঞ্চলের একটি সামান্য বাড়িতে এক অসামান্য য়ুরোপীয় মহিলা বাস করেন। নাম তাঁহার মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল—শিক্ষায় দীক্ষায়, প্রতিভা এবং চরিত্রে তিনি নাকি অসাধারণ। এখন তিনি পুরোপুরি ভারতীয়—ভারতীয় নাম লইয়া এবং জাতি-গোত্র বদলাইয়া একেবারে ভারতীয় জীবন যাপন করেন। ভারতবাসী তাঁহাকে এখন 'সিস্টার নিবেদিতা' বলিয়া জানে। ভারতের প্রসিদ্ধ জননায়কদের তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী, এমন কি, শহরের বিশিষ্ট য়ুরোপীয় যাঁহারা, তাঁহারা পর্যন্ত ইঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ছাত্রসমাজে ইঁহার নাকি অসাধারণ প্রভাব। এইসব কথা শুনিয়া বড়লাট-পত্নী লেডি মিন্টোর বিশেষ কৌতূহল হইল। তাঁহাকে একবার তিনি দেখিতে চান। আরো শুনিলেন যে, ইংরেজ শাসকবর্গ এই মহিলাটিকে তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য প্রীতির চক্ষে দেখেন না। ইনি ভারতে ইংরেজ-শাসনের একজন কঠিন ও বিরুদ্ধবাদী সমালোচক বলিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহার উপর আদৌ প্রসন্ন নহেন। লেডি মিন্টোর কৌতূহল আরো বাড়িল। আত্মগোপন করিয়া তিনি একদিন লর্ড মিন্টোর মিলিটারী সেক্রেটারী, ভিক্টর ব্রুককে সঙ্গে লইয়া নিবেদিতাকে দেখিবার জন্য সতেরো নম্বর বোসপাড়া লেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিবেদিতার সহিত তাঁহার এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ লেডি মিন্টো তাঁহার জার্নালে এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"মার্চ ১, ১৯১০—সম্প্রতি জনৈকা মিস্ নোবলকে দেখিবার জন্য আমি কলিকাতার এক দরিদ্রতম পল্লীতে গিয়াছিলাম। মিস্ নোবল ভারতীয় ধরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। দেখিলাম তিনি একজন আদর্শবাদী এবং হিন্দুধর্মের ভিতর তিনি সুগভীর মহিমা দেখিতে পাইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার যুক্তি আমি ঠিকমত বুঝিতে পারি নাই। আমি আত্মগোপন করিয়া

গিয়াছিলাম; সঙ্গে ছিলেন একজন মার্কিন ভদ্রলোক, মিঃ ফিপসন আর ভিক্টর ব্রুক (ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারী)। আমি সিস্টার নিবেদিতার স্কুলটি দেখিতে গিয়াছিলাম। অনেকগুলি ছাত্রী সেখানে পড়ে। তাঁহার শিক্ষাদানের পদ্ধতি দেখিয়া ও স্কুল-পরিচালনায় তাঁহার একক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া আমি যারপর নাই বিস্ময় বোধ করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, যাঁহাদের মধ্যে তিনি বাস করেন, তাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দু, কিন্তু তাঁহারা দরিদ্র অথচ গর্বিত। নিবেদিতা তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের ও গুণাবলীর খুব প্রশংসা করিলেন। পৃথিবীর সকল জাতির ধর্ম ও দর্শনের সহস্র বৎসরের ইতিহাস তিনি গভীরভাবে পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহার ধারণা যে দর্শন ও জ্ঞানের ধাত্রী হইল ভারতবর্ষ।

"সিস্টার নিবেদিতা বাগবাজারের একটি সংকীর্ণ গলিতে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র বাড়ীতে বাস করেন। অনিন্দ্যসুন্দর তাঁহার মুখ; সে-মুখ প্রতিভা-দীপ্ত। সহজেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তিনি আমাকে গঙ্গার তীরে যেখানে তাঁহার আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বাস করিতেন, সেই স্থানটি দেখিয়া আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। কয়েকদিন পরে ভিক্টর ব্রুককে সঙ্গে লইয়া সিস্টার নিবেদিতার বাড়িতে আসিলাম ও তাঁহাকে লইয়া একখানি ভাড়া করা মোটর গাড়িতে করিয়া আমি বেলুড় মঠ দেখিতে গেলাম। তাঁহার সহকারিণী, সিস্টার ক্রিস্টিনও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। নিবেদিতা আমাদিগকে বিবেকানন্দের শয়ন-ঘরটি দেখাইলেন! এই ঘরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম—কেমন যেন একটি পবিত্রভাবে তাঁহার মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা নৌকা করিয়া ফিরিলাম। সেদিনের অপরাহ্ণটি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। সিস্টার নিবেদিতা তাঁহার চারিপাশের সব কিছুর মধ্যেই সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট—শ্রদ্ধা ও ভক্তিমিশ্রিত সেই কণ্ঠস্বর আমার খুব ভালো লাগিয়াছিল।"

দিন যায়। বোসপাড়ার ভাঙা বাড়িটির উপর দৃষ্টি পড়িল পুলিশের। বাহির হইতে দেখিতে বাড়িটি নিরীহ, কিন্তু ভিতরে উহা যেন একটি

আগ্নেয়গিরি। এখানে অরবিন্দ ঘোষের আনাগোনা। একদিন গভীর রাত্রে সদর দরজায় করাঘাত পড়িল। ভিতরে তখন অরবিন্দ ও নিবেদিতায় 'কর্মযোগিন্'-এর ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা চলিতেছে। এত রাত্রে দরজায় করাঘাত! বুদ্ধিমতী নিবেদিতা বুঝিলেন, পুলিশ আসিয়াছে। কিন্তু অরবিন্দের মুখে উদ্বেগের লেশমাত্র নাই। তাড়াতাড়ি পোশাকের আলমারির মধ্যে তিনি অরবিন্দকে রাখিয়া দিলেন। দরজা খুলিয়া পুলিশের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন অকম্পিত স্বরে—"কি চাই?"

"অরবিন্দ ঘোষকে।" উত্তর হইল।

"তিনি এখানে নাই।"

"আমাদের সংবাদ কিন্তু অন্যরূপ।"

পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। কিন্তু সেই বিপজ্জনক লোকটিকে কোথাও পাওয়া গেল না। পুলিশ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

ক্রমে কলিকাতায় অরবিন্দের টিকিয়া থাকা দায় হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তিন বার তাঁহার নির্বাসনের গুজব উঠিয়াছে। কি করিবেন এখন তিনি? অরবিন্দ 'কর্মযোগিন্'-এর ম্যানেজার রামচন্দ্র মজুমদারকে একদিন পাঠাইলেন নিবেদিতার নিকটে পরামর্শের জন্য। নিবেদিতা তাঁহাকে বলিলেন: "তোমাদের কর্তাকে বলো কিছুদিন কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতে; সেই ভাবেই তিনি অন্যের মারফৎ অনেক কাজ করতে পারবেন।" তারপর কয়েকদিন পরে নিবেদিতা নিজেই একদিন আসিয়া অরবিন্দকে বলিলেন—"ঈসপের সেই গল্পটি মনে আছে তো? পালে একদিন সত্য সত্যই বাঘ পড়িতে পারে। ফাঁসীর দড়ি আপনার গলার কাছ দিয়া একবার ফস্কাইয়া গিয়াছে। মনে রাখিবেন, ইহাতে ইংরেজের কম আক্রোশ হয় নাই।"

পরদিন 'ধর্ম' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখিলেন: "যাকেই নির্বাসন কর এবং যত লোককেই নির্বাসন কর, কালচক্রের গতি থামিবার নয়।"

অরবিন্দ একদিন নিবেদিতাকে বলিলেন—"গ্রেপ্তার আপনাকেও তো করিতে পারে?"

নিবেদিতা হাসিয়া বলিলেন—"গায়ের চামড়ার রঙটাই যে ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইরিশ বিপ্লবের কোলে মানুষ হইয়াছি—কারাগার বা নির্বাসনে আমার ভয় আছে মনে করেন? এই যে কলেজ ষ্ট্রীটে আপনার এই বাসায় কত লোক আসিতে ভয় পায় আর আমি কেমন স্বচ্ছন্দে দুই বেলা আসিতেছি যাইতেছি—পুলিশ কি দেখিতে পায় না মনে করেন?"

অরবিন্দ। নিশ্চয়ই দেখিতে পায় আর সেই সঙ্গে তাহারা ইহাও দেখিতে পায় যে, আপনি একজন মেমসাহেব, এ্যানার্কিস্ট নহেন।

কিন্তু গুজব একদিন সত্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। কোনো এক সূত্রে নিবেদিতা খবর পাইলেন, সরকার অরবিন্দ ঘোষকে নির্বাসনে পাঠাইবার মতলব করিয়াছেন। তিনি তখনই অরবিন্দকে সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। যেমন করিয়াই হউক অরবিন্দকে নির্বাসন হইতে রক্ষা করিতে হইবে—নিবেদিতার অন্তর বলিল। আর একদিন। নিবেদিতা বাগবাজার হইতে কলেজ ষ্ট্রীটে আসিলেন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে। অরবিন্দ সেখানে নাই। সেখান হইতে নিবেদিতা ছুটিলেন ১৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে, 'কর্মযোগিন্' কার্যালয়ে।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রাস্তার দুই একটি গ্যাসের আলো সবেমাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জনবিরল সেই রাস্তার অদূরে ছদ্মবেশে গোয়েন্দা-পুলিশ চৌদ্দ নম্বর বাড়িখানির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া নিঃশব্দে

ঘোরাফেরা করিতেছে। নিবেদিতা দরজার কড়া নাড়িতেই একজন যুবক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। নিবেদিতা ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। দেখিলেন নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে, প্রশান্ত মনে অরবিন্দ একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়া একমনে লিখিতেছেন।

"কী আশ্চর্য, আপনি এখনও নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছেন?"

"দুশ্চিন্তার তো কোনো কারণ দেখিতেছি না।"

"আপনার নামে যে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। আজই, এই মুহূর্তে আপনাকে পলাইতে হইবে। কোথায় যাইবেন, বলুন?"

"ভগবান যেখানে লইয়া যাইবেন।" এই বলিয়া অরবিন্দ চুপ করিলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হইল। তারপর অরবিন্দ আবিষ্টের মত বলিলেন—"চন্দননগর।"

সেদিনও নিবেদিতা অরবিন্দের সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই। এই টাকা তিনি জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলেন। সেদিন কেহই ইহা জানিতে পারে নাই। মন্ত্রগুপ্তিতে এমনি সিদ্ধ ছিলেন তিনি। এমন করিয়াই নিবেদিতা বাংলার সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন। যাইবার পূর্বে অরবিন্দ নিবেদিতার হস্তে 'কর্মযোগিন্'-এর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া গেলেন।

অরবিন্দ নাই। নিবেদিতা এখন একা। তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই স্বদেশী আন্দোলন দিন দিন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এখন স্থির চিত্তে তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। আট বৎসর পূর্বে একজনের অসমাপ্ত কার্যের গুরুভার দায়িত্ব লইয়াছিলেন তিনি। আজ আবার আরেকজনের আরব্ধ কার্য তাঁহাকে শেষ করিতে হইবে। একই ধরণের কাজ—ঠিক তেমন

করিয়াই শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। গুরুর স্বপ্ন ছিল ভারতের মুক্তি। অরবিন্দের স্বপ্নও তাই। এইবার মহাভারতের শেষ পর্বে পৌঁছাইলেন নিবেদিতা। রাত্রিতে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। গঙ্গা-বক্ষে হাজার তারার ঝিকিমিকি—যেন অগণিত আশার আলো। নিবেদিতার অন্তর হইতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল—"ওয়া গুরু কী ফতে।"

রাত্রির সেই নিস্তব্ধ প্রহরে গঙ্গার বীচিভঙ্গ দেখিতে দেখিতে নিবেদিতা একবার ক্ষণেকের জন্য পশ্চাতের দিকে চাহিলেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস মনের মধ্যে একবার আলোচনা করিলেন। ইতিহাসের মহাক্ষণ তিনি একদা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন আইরিশ বিপ্লবের মধ্যাহ্নে, সেই মহাক্ষণ এই বাংলা দেশেও তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রত্যক্ষ করিলেন একটি বিরাট ও বিপুল সমুদ্র-বন্যার মতন স্বদেশী আন্দোলন দেশে আসিল। তাহা কূল ভাসাইল, বাঁধ ভাঙিল, সকল সীমা অতিক্রম করিল। বাঙালি ইহার জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিল, কষ্ট সহ্য করিল, তাহাতে লাভ কম হইল না। এই বন্যার পলি পড়িয়া সারা দেশে এবং সমগ্র লোকচিত্তে আজ যে উর্বরতা ও ফলোন্মুখতা আনিয়াছে, আগামী দিনের সাধনাকে তাহাই সম্ভব করিবে এবং তাহা হইতেই পরবর্তী কালের সাধকগণ প্রচুর ফসল উঠাইবেন। ইহা তো একটি আন্দোলন মাত্র নয়, ইহা যেন নব-জীবনের প্রতি স্তরে নব-জীবনের দুর্বার তরঙ্গাঘাত। আজিকার এই চিন্তা ও ভাবধারা, স্বপ্ন ও ধ্যান দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। গুরু বলিতেন, ভারতের স্বাধীনতা নিয়তি নির্দিষ্ট, আজ হউক, কাল হউক এ-দেশ স্বাধীন হইবেই। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন কি তাহারই সূচনা নয়? ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে এই আন্দোলন আন্দোলন মাত্র নয়—

ইহা অভ্যুত্থান। ইহা অভ্যুদয়। অনেকের সহিত মিলিয়া তিনিও যে এই আন্দোলনের আভ্যুদয়িক রচনা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তো তাঁহার জীবনের গৌরব। নিবেদিতা ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই "স্বদেশী আন্দোলন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। মনের এই ভাবনা প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহারে নিবেদিতা লিখিলেন :

"এই স্বদেশী আন্দোলন কেবল রাজনীতিক জাগরণ নহে। পরন্তু আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজ-চিত্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি বাঙালির জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন সহস্রদল কমলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা আমাদের জীবনের সর্বপ্রান্তরে নব স্রোতধারা সৃষ্টি করিয়াছে; এই আন্দোলন ভারতবর্ষকে তাহার আত্মোপলব্ধির আদর্শ দিয়াছে। বাংলাদেশের অগ্নিসাধকেরা ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যে-আদর্শ নিজেদের মধ্যে পাইয়াছেন, যে ভাবে তাঁহারা দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন আর আপনাদের অস্থিপঞ্জর জ্বালাইয়া তাঁহারা অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে মশাল রচনা করিয়াছেন—তাহা একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার একক সাধনা।"

নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন :

"কর্মযোগিন্"-এর শেষ সংখ্যাগুলি বাহির হইল সম্পূর্ণ নিবেদিতার নিজের দায়িত্বে। স্বামিজীর ভাষণ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইত। তাহার মধ্যে নিবেদিতা নিজের লেখা প্রবন্ধ অরবিন্দ ঘোষের নাম দিয়া প্রকাশ করিতেন। ১৯১০ সালের ১২ই মার্চ কর্মযোগিন-এর ছত্রিশ সংখ্যায় নিবেদিতা তাঁহার মর্মবাণী প্রকাশ করিলেন। প্রার্থনাকারে লিখিত এই নিবন্ধটি প্রকৃত পক্ষে নিবেদিতার চরম পত্র—রাজনৈতিক জীবন পরিহারের সংকল্প।"

নিবেদিতা লিখিলেন :

"আমি বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড এবং অবিনশ্বর। এক আবাস এক আকুতি আর এক সম্প্রীতি হইতেই জাতীয় ঐক্যের উদ্ভব হয়। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রবাণীতে যে শক্তির লীলা, বিশ্বের ধর্মে ও রাষ্ট্রে যাঁহার খেলা, বিদ্বানের বিদ্যায় এবং ঋষির ধ্যানে যাঁহার প্রকাশ, আমি বিশ্বাস করি, সেই শক্তিই আজ আমাদের বক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছেন। তাহার নাম আজ 'জাতীয়তা।' আমি বিশ্বাস করি, বর্ত্তমান ভারতের মূল রহিয়াছে প্রাচীন ভারতের গভীরে, সম্মুখে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ভাবীকাল। হে জাতীয়তা! সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান, যে-মূর্তিতে ইচ্ছা দেখা দাও! আমাকে তোমার করিয়া লও!—নিবেদিতা!"

এই অপূর্ব কয়েকটি ছত্রের প্রত্যেকটি কথার ভিতর দিয়া যেন যুগপৎ বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের চিন্তাধারা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। বীণার ঝঙ্কারে যেন গাণ্ডীবের ভয়াল টঙ্কার। মনে হইল, নিবেদিতা যেন ভারত-আত্মার বাণীমূর্তি—বিবেকানন্দ এবং অরবিন্দের উজ্জ্বলতম প্রতিচ্ছবি। এই দুইজন চিন্তা-নায়কের ভাবধারা আসিয়া তাই নিবেদিতার ভাবধারায় মিলিত হইয়া নবীন ভারতের ভাবলোকে এক নূতন ত্রিবেণী-সঙ্গম সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন সেদিন একমাত্র নিবেদিতাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এইভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল—নিবেদিতা-চরিত্রের ইহাই নিগূঢ় মর্মকথা।

৪ঠা এপ্রিল 'কর্মযোগিন'-এর শেষ সংখ্যা বাহির হইল। ইতিমধ্যে নিবেদিতা সংবাদ পাইয়াছেন, অরবিন্দ নির্বিঘ্নে পণ্ডিচেরী পৌঁছিয়াছেন। তারপর সকলের সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটাইয়া নিবেদিতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে পলাতক দেশনেতার প্রকৃত ঠিকানা ইংরেজি কাগজওয়ালাদের জানাইয়া দিলেন।

নিবেদিতার কার্য শেষ।

অধ্যাত্মশক্তির সহায়ে এক নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিবার বিরাট ব্রত

লইয়া অরবিন্দ চলিয়া দিয়াছেন। নিবেদিতা পড়িয়া রহিলেন একা।
দিন যায়।

ক্লান্তিতে, অবসাদে ভাঙিয়া পড়িলেন নিবেদিতা।

রণরঙ্গিণী এইবার তাঁহার হস্তের প্রহরণ নামাইয়া রাখিলেন ভূমিতলে। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আর কর্মক্ষমতা সবই যেন নিঃশেষিত-প্রায়। নির্জনতার মধ্যে বসিয়া থাকেন এখন নিবেদিতা। বসিয়া থাকেন আর চিন্তা করেন—"ভারতবর্ষের সেবা করিয়া আমি গুরুসেবার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছি। ইহা অপেক্ষা বড় আর কিছু নাই। স্বামিজীর আদর্শকে রূপ দিয়াছি। এইবার বলি দিব নিজেকে।"

গুরু বলিয়াছিলেন—"নিবেদিতা, সব সময় মনে রাখিবে 'চরৈবেতি'। একদিন পরা শান্তি আর মুক্তির অধিকারী হইবে তুমি—আর ভারতের সাধনা হইবে জয়যুক্ত।"

সেই শান্তির ডাক শুনিতে পাইলেন নিবেদিতা। আত্মবিলয়ের ধ্যানগম্ভীর তপস্যায় এইবার মগ্ন হইতে চাহিলেন তিনি। জীবন যেন নির্মল হইতে নির্মলতর হইয়া চুঁইয়া পড়িতেছে তিলে তিলে। এইবার মহাজীবনের ছন্দে জীবন-দেবতার শেষ বন্দনা গাহিবেন তিনি।

তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন। পার্বত্য-তীর্থের যাত্রী হইতে চাহেন নিবেদিতা। হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করিলেন তিনি। কিন্তু এই তীর্থযাত্রার সঙ্গী কই? কত যত্নেই না গুরু তাঁহাকে একদিন সঙ্গে করিয়া তীর্থময় ভারত পরিক্রমা করিয়াছিলেন, নিবেদিতার আজ মনে পড়িল।

নিবেদিতা তখন বসু-দম্পতীকে তাঁহার ইচ্ছা জানাইলেন। জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু উভয়েই উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গ্রীষ্মের ছুটিতে

নিবেদিতাকে লইয়া কেদার-বদরী যাত্রা করিলেন। পথে ট্রেন হইতে বারাণসীর নয়নাভিরাম দৃশ্য নিবেদিতার চক্ষে পড়িল। গঙ্গা অর্ধ-চন্দ্রাকারে কাশীকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিতা। চকিতে নিবেদিতার মনে পড়িল, গুরুর সঙ্গে এই তীর্থ-দর্শনে তিনি একবার আসিয়াছিলেন। স্বামীজি বলিতেন, পুণ্যক্ষেত্র কাশীর অসংখ্য ঘাট, মঠ, মন্দির, অন্নসত্র ও সহস্র সহস্র ধর্মনিরত নরনারী হিন্দুধর্মের অক্ষয় বিজয়-স্তম্ভ। হরিদ্বারে আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের পিছনে বসিয়া নিবেদিতা নিবিষ্টচিত্তে শিবের ও গঙ্গার আরতি দেখিলেন আর শিবময় চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন।

হরিদ্বারের পর কেদার-বদরী।

পথে বসু-জায়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দূর দুর্গম পথের তীর্থ-দর্শনে আপনার এত আগ্রহ কেন?"

নিবেদিতা হাসিলেন। সেই স্নিগ্ধ সুন্দর হাসি। বলিলেন, "গুরুর মুখে শুনিয়াছি, হিমালয়ের অন্তর্দেশে হিন্দুদের যে কয়টি তীর্থক্ষেত্র আছে, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ তাহাদের মধ্যে মুখ্য ও প্রাচীন। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই তীর্থ দুইটি আপন মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া সগৌরবে আজো বিরাজিত। মহাভারতেও পড়িয়াছি, পাণ্ডবেরা এই পথেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। গুরু বলিতেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে এ-পথের প্রতিটি ধূলিকণা চিরপবিত্র। এমন তীর্থ না দেখিয়া কি থাকিতে পারি?"

জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু শুধু নিস্তব্ধ বিস্ময়ে নিবেদিতার কথাগুলি শুনিয়া গেলেন! তাঁহারা বুঝিলেন, ভৌগোলিক সত্তা অতিক্রম করিয়া নিবেদিতার চেতনায় এই ভারতবর্ষ কতখানি সত্য, প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ঋষিকেশ-দেবপ্রয়াগ হইয়া তাঁহারা চলিয়াছেন কেদার-বদরীর পথে। সুন্দর এই পথ গঙ্গার অববাহিকা ধরিয়া চলিয়াছে। পথের বহু নীচে প্রবল স্রোতস্বিনী গঙ্গা। দেবপ্রয়াগ দেখিয়া নিবেদিতার কী আনন্দ! বলিলেন, "এই স্থানটি গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমভূমি।"

—"দুইটি নদী কোথা হইতে আসিল?"—জিজ্ঞাসা করিলেন অবলা বসু।

—"গঙ্গোত্তরী হইতে গঙ্গা আর বদরিকাশ্রমের উপর হইতে অলকানন্দা। এই সঙ্গমঘাটই এখানকার প্রধান আকর্ষণ।"

ভারতের তীর্থ সম্পর্কে নিবেদিতার জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া জগদীশচন্দ্র আর একবার মুগ্ধ হইলেন। সৌখিন পর্যটক নহেন, নিবেদিতা সত্যই তীর্থযাত্রী, তাঁহার মনে হইল। তারপর একে একে রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, গৌরীকুণ্ড অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন কেদারনাথ। গৌরীকুণ্ডের হিমশীতল জলে নিবেদিতা স্নান করিলেন।

কেদারনাথ। নিবেদিতার বহু-আকাঙ্খিত কেদারনাথ।

সম্মুখে চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা আর রজতগিরির কেন্দ্রস্থলে কেদারনাথ মন্দির। শুভ্র শৈলশ্রেণী অশ্বক্ষুরাকারে মন্দির বেষ্টন করিয়া আছে। চারিদিকের সৌন্দর্য অদৃষ্টপূর্ব। মন্দির গায়ে দুই ধারে সারি সারি দোকান। সেখানে পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন নিবেদিতা। উচ্চ মন্দির-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া নিবেদিতা আসিলেন মূল মন্দিরে। মন্দিরের দরজার সম্মুখে কেদারনাথের দিকে মুখ করিয়া গণেশমূর্তি, একপার্শ্বে পার্বতী দেবী। নিবেদিতা দেখিলেন কেদারনাথ শিবলিঙ্গ নন, বা বিশেষ কোন মূর্তিও নন। বৃহদাকার আসনতল প্রস্তরশিলায় গঠিত—অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া বিরাজমান।

তীর্থযাত্রীর কণ্ঠের 'শিবোঽহম্' ধ্বনি মন্দিরের অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির সহিত মিলিয়া এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। এমনই 'শিবোঽহম্' ধ্বনি তিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন লণ্ডনে—গুরুর সেই উদাত্ত কণ্ঠে। আজো তাহা নিবেদিতার কর্ণে বাজিতেছে। নিবেদিতা কেদারনাথের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করিলেন ভক্তি-বিনম্র অন্তরে। রুদ্রাক্ষের মালা হাতে সারা রাত্রি তিনি মন্দিরে যাপন করিলেন। এই পবিত্র তীর্থ দর্শনের অভিজ্ঞতা নিবেদিতা তাঁহার এক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অতি মনোরম সেই বর্ণনা। নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঃ

"সাগরবক্ষ হইতে প্রায় চারি হাজার ফিট উপরে কেদারনাথ। তুষারমৌলী কেদারশৃঙ্গের পাদদেশে অপরূপ মন্দির। মন্দিরের পিছনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর—চারিদিকে গলিত তুষারের জলধারা নামিয়াছে—অদূরবর্তিনী মন্দাকিনীর সহিত কলোচ্ছ্বাসে মিলিতে ছুটিয়াছে। চারিদিকে বরফের রাজত্ব। সম্মুখে নগাধিরাজের তুষারশুভ্র বিরাট রূপ। আমরা স্তব্ধ হইয়া দেখিলাম।"

"কেদারনাথে আসিয়া ভগিনী নিবেদিতা শিবভাবে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, একদিন তিনি তাঁহার কপালে ভস্মলেপন করিলেন।" সঙ্গীরা ইহা দেখিয়া অবাক। কেদারনাথ হইতে নিবেদিতা আসিলেন বদ্রীনাথে। চিরতুষার ও চিরনিস্তব্ধতার রাজ্য। তীর্থদেবতার দর্শন করিয়া নিবেদিতার অন্তরে সে কী আনন্দ, সে কী তৃপ্তি। সাংসারিক কোলাহলের বহু উর্ধ্বে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া নিবেদিতার স্বভাবতঃই মনে আসিল ভারতের যোগী-ঋষিদের কথা; ভস্মাচ্ছাদিত শুভ্রতনু—সমাধিতে নিমগ্ন—নির্বাক্, নিস্পন্দ। তাঁহারা দেখিতে শিবের ন্যায়। মনে মনে বদরী-বিশালের জয়ধ্বনি করিলেন তিনি।

তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া নিবেদিতা জুলাই মাসে কলিকাতায় ফিরিলেন। মনে এখন কোন ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই, অভাব নাই। তাঁহার অন্তর নিবিড় শান্তিতে পূর্ণ।

তীর্থ হইতে ফিরিয়া প্রথমে তিনি সারদা দেবীর চরণ-দর্শন করিতে গেলেন একদিন। হাতে অনেকগুলি কাজ ছিল, একে একে সেগুলি শেষ করিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের একখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখিবেন ইচ্ছা ছিল এবং এইজন্য বহু যত্নে কিছু উপাদানও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন তাঁহার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে! তাই সংগৃহীত উপাদানগুলি তিনি মঠের সন্ন্যাসীদের হাতে তুলিয়া দিলেন। রামানন্দ বাবুকে কথা দিয়াছিলেন, তাঁহার 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিবেন। কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ইংরেজি তর্জমাটা দেখিয়া দিবার জন্য নিবেদিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তিনি বাগবাজারে প্রায়ই যাওয়া-আসা করিতেন। নিবেদিতা তাহা সুন্দর করিয়া দেখিয়া দিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে মর্যাদার স্থান পাইবে—দীনেশ সেনের বইখানিতে তাহারই ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন নিবেদিতা। সেইজন্যই ইহার ইংরেজি তর্জমায় তাঁহার এত উৎসাহ ছিল। শুনিলেন, দীনেশ বাবুর বইখানি ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। জুলাই মাসে যখন এই বই বাহির হইল তখন দীনেশবাবু একদিন নিজে বাগবাজারে আসিয়া দুইখানি বই নিবেদিতাকে দিয়া গেলেন। বই পাইয়া নিবেদিতার সে কী আনন্দ! দীনেশবাবুর ইচ্ছা ছিল ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতার নামের উল্লেখ করিবেন,—নিবেদিতা ইহাতে কিছুতেই সম্মত হন নাই।

১৯১১। জানুয়ারী।

আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিল, 'ধীরামাতা' (মিসেস ওলিবুল) মৃত্যুশয্যায়। তিনি ভগিনী নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। মিসেস বুলকে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার 'দ্বিতীয়া মাতা' বলিতেন এবং মিসেস বুল জগদীশচন্দ্রকেও অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই ধনাঢ্য নরওয়েজিয়ান মহিলা নিবেদিতাকে প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া তিনি যখন আমেরিকায় পলাতক বিপ্লবীদের বসবাসের ও তাহাদের শিক্ষার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন যে, "মিসেস ওলিবুল নিবেদিতাকে তাঁহার স্কুলের জন্য দুই হাজার পাউণ্ড এবং জগদীশচন্দ্র বসুকে তাঁহার বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য তিন হাজার পাউণ্ড দিয়াছিলেন।"

ভগিনী নিবেদিতা যখন মিসেস ওলিবুলের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত। আমেরিকায় থাকিতেই নিবেদিতা লণ্ডনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হইলেন। ভারত-বিখ্যাত মনীষী ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই কংগ্রেসের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক বিদগ্ধ সমাজে বিদুষী মহিলা নিবেদিতার খ্যাতি তখন য়ুরোপ ও আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ডক্টর শীল তাঁহার অতিশয় গুণমুগ্ধ ছিলেন। 'ডন্ সোসাইটি'র সূত্রপাত হইতেই ভগিনী নিবেদিতা ডক্টর শীলের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন—ইহাও তাঁহার প্রতি নিবেদিতার আকৃষ্ট হইবার একটি কারণ ছিল। আমন্ত্রিত হইয়াও নিবেদিতা লণ্ডন যাইতে পারিলেন না। "ভারতে নারী জাতির অবস্থা"—এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রবন্ধটি কংগ্রেসের স্মারকগ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল। এই প্রবন্ধে

তিনি ভারতের নারী জাতির সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশের নারী জাতির তুলনা করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"পাশ্চাত্ত্যদেশের নারীজাতির পারিবারিক আদর্শ ভারতের নারীজাতির পারিবারিক আদর্শের মত আধ্যাত্মিক ও পবিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর ভারতের নারীজাতির নাগরিক আদর্শ পাশ্চাত্ত্য দেশের নারী জাতিদের মত হওয়া উচিত।"

আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন নিবেদিতা। একদিন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া বলিলেন—"অনেকদিন 'ডন্'-এর দিকে তাকান নাই। এইবার একটা লেখা দিতে হইবে।"

নিবেদিতা বলিলেন—"সংসার হইতে নিজেকে এখন গুটাইয়া লইতেছি। লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছি।"

সতীশচন্দ্র। আপনি তো শুধু বিদুষী নহেন, আপনি যে সাক্ষাৎ বীণাপাণি। ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু লেখা আপনার পক্ষে এমন কিছু নয়।

নিবেদিতা পরের দিনই 'ডন্'-কাগজে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রবন্ধের বিষয় : 'ভারতীয় সমাজ-জীবনে ঐক্য'। 'ডন্'-পত্রিকায় ইহাই তাঁহার শেষ রচনা এবং তাঁহার জীবিতকালে ইহাই তাঁহার উল্লেখযোগ্য শেষ রচনা।

॥ একুশ ॥

১৯১১। ২৫শে জুলাই।

স্বামী বিবেকানন্দের মায়ের মৃত্যু হইল।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব হইতেই ভুবনেশ্বরীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নিবেদিতা তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে আসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। ভূপেন্দ্রনাথকে তিনি কথা দিয়াছিলেন, মা-কে দেখিবেন। নিবেদিতা সে প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হন নাই। মৃত্যুর সময়ে তিনি ভুবনেশ্বরীর শিয়রে বসিয়াছিলেন। সেদিনও নিবেদিতা চক্ষের অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবন-দেবতা, স্বামী বিবেকানন্দের গর্ভধারিণী মা ভুবনেশ্বরী—ইহা চিন্তা করিতেই এক বিচিত্র অনুভূতিতে নিবেদিতার সমস্ত অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। উদ্বেলিতচিত্তেই তিনি শ্মশান পর্যন্ত শবদেহের অনুগমন করিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

"মায়ের যখন মৃত্যু হয় আমি তখন য়ুরোপে নির্বাসিত বিপ্লবীর জীবন যাপন করিতেছি। ভগিনী নিবেদিতার পত্রে মায়ের মৃত্যু-সংবাদ জানিতে পারিলাম।* সেই শ্মশানঘাট হইতে আমার মায়ের প্রজ্বলিত চিতাগ্নির পার্শ্বে বসিয়াই ভগিনী নিবেদিতা আমাকে যে মর্মস্পর্শী চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, সান্ত্বনা ও সমবেদনায় তাহা অপূর্ব—প্রত্যেকটি ছত্রে আমি তাঁহার অন্তরের গভীর সহানুভূতি ও স্নেহের স্পর্শ পাইয়া মুগ্ধ ও ধন্য হইয়াছিলাম।"

ভুবনেশ্বরীর মৃত্যুতে পাঁচ বৎসর পূর্বে আর একজনের মৃত্যুর কথা নিবেদিতার মনে পড়িল। তিনি অঘোরমণি দেবী, রামকৃষ্ণের 'গোপালের মা'। নিবেদিতার জীবনে এই ভক্তিময়ী নারীর স্মৃতি

অক্ষয় হইয়া আছে। গুরুর মুখে শুনিয়াছিলেন যে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন এই গোপালের মায়ের অঞ্চলের নিধি, অন্ধের নড়ি আর কাঙালের কড়ি, যদিও অঘোরমণি ছিলেন রামকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠা। নিবেদিতা লিখিয়াছেন :

"আমি যখন ভারতবর্ষে আসি, তখন গোপালের মায়ের বয়স বাহাত্তর বৎসর। তাহার পরও তিনি প্রায় আট বৎসর বাঁচিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্তিম জীবনে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম। আচার্যদেবের মুখে ইহার পরমাশ্চর্য জীবন-কথা যাহা শুনিয়াছিলাম, স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গোপালের মায়ের দিব্যভাব-মণ্ডিত মধুর প্রকৃতি আমাকে সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই বর্ষিয়সী বৃদ্ধা যেন সারল্যের স্নিগ্ধ প্রতিমা। আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত তাঁহার মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি বিস্ময় বোধ করিতাম। আচার্যদেব পর্যন্ত গোপালের মা-কে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি একদিন আমাকে গোপালের মায়ের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'এইসব শুদ্ধ ভক্তিময়ী নারীর মধ্যেই ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস চিরদিনের মত উজ্জ্বল হইয়া আছে, জানিবে।' স্বামীজির কথা যে সত্য ইহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম।"

সেই গোপালের মায়ের যখন অসুখ করিল তখন তাঁহাকে কামারহাটি হইতে কলিকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে ঠিকমত সেবা-শুশ্রূষা হইবে না বুঝিতে পারিয়া নিবেদিতা গোপালের মা-কে তাঁহার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আনিয়া দিনের পর দিন বৃদ্ধার রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছিলেন। নিবেদিতার সেই সেবা সারদা দেবীকে পর্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। ১৯০৬ সালের ৮ই জুলাই গঙ্গার তীরে গঙ্গার জল স্পর্শ করিতে করিতে গোপালের মা



গোপালের মায়ের রোগশয্যা-পার্শ্বে নিবেদিতা।

সজ্ঞানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই আশ্চর্য মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়া নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন :

"সেই গঙ্গার তীরে, অনন্ত আকাশের নিম্নে অমৃতপথযাত্রী এই পুণ্যবতী নারীর শান্তি ও মাধুর্যমণ্ডিত মুখ আমি কোনো দিনই বিস্মৃত হইব না। সে প্রশান্তমুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই, তিনি যেন তাঁহার চির আরাধ্য, চির স্নেহের গোপালকে বার্ধক্যশিথিল দুই হস্তে বক্ষে ধরিয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতেছেন।"

গোপালের মায়ের মৃত্যুর কথা ভাবিতে গিয়া নিবেদিতার আর একজনের মৃত্যুর কথা মনে পড়িল। তিনি আনন্দমোহন বসু। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে আগষ্ট বাংলার এই বর্ষীয়ান জননায়কের যখন মৃত্যু হয়, তখন নিবেদিতা 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় তাঁহার সম্পর্কে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ বাংলা এবং ভারতের বহু নেতৃস্থানীয়েরই মর্মস্পর্শ করিয়াছিল, নিবেদিতার তাহা মনে আছে। ঐ প্রবন্ধে তিনি আনন্দমোহনকে বাংলার প্রথম নাগরিক বলিয়া উল্লেখ করেন। নিবেদিতা ঐ প্রবন্ধে বিশেষভাবে আনন্দ-মোহনের চারিত্রিক মহিমার কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"আনন্দমোহনের স্বদেশ-প্রীতি এবং অপূর্ব চরিত্র তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। চরিত্রবান মানুষই প্রকৃতপক্ষে একটি জাতির প্রধান সম্পদ। আনন্দমোহন বসু ছিলেন বাঙালির এই দুর্লভ সম্পদ। শিক্ষা ও সাধুতায় তিনি যেমন একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি বিগত যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে প্রধান ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে তাঁহার সহিত একত্রে কাজ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। দেশের কল্যাণচিন্তা দিবারাত্র তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। অসুস্থ অবস্থাতেও অমৃতবাজার পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখিতে বিরত হন নাই। মিলন-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের পর যে এক বৎসরকাল তিনি জীবিত ছিলেন,

সেই সময়ে ঐ স্থানটির পাশ দিয়া যাইবার সময়ে আনন্দমোহন ঐখানে নামিয়া টুপি খুলিয়া নিঃশব্দে অভিবাদন করিতেন। মিলন-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে মৃত্যুশয্যা হইতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটি কথা অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই শেষ বক্তৃতা দেশাত্মবোধের যে-বেদী রচনা করিয়া গিয়াছে, বাঙালি চিরদিন সেই বেদীমূলে ভক্তির অঞ্জলি অবনত-শিরে প্রদান করিবে। এমন অকপট স্বদেশ-প্রেমিককে হারাইয়া বাংলা আজ সত্যই অসহায়। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অনুবর্তী হইয়াও আমরা আনন্দমোহনকে সম্মান প্রদর্শন না করিয়া পারি না। কারণ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হইয়াও, আনন্দমোহনই সর্বপ্রথম, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যদেশ জয় করিয়া ফিরিলে, তাঁহার সহিত করমর্দন করিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য উদারতা একমাত্র আনন্দমোহনের পক্ষেই সম্ভব। শতবৎসর পূর্বে জন্মিলে তিনি একজন ঋষি হইতে পারিতেন।”

আর মনে পড়িল স্বামী সদানন্দের কথা। ভারতবর্ষে আসিবার পর হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে স্বামী সদানন্দ নিবেদিতার তত্ত্বাবধান করিতেন। সদানন্দের অন্তিম রুগ্নাবস্থায় বাগবাজারে বোসপাড়ার মঠের অন্যান্যের সহিত তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ নিবেদিতার হইয়াছিল। সেই সদানন্দ-প্রকৃতি তরুণ সন্ন্যাসীর স্মৃতি নিবেদিতা জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

“আর নয়, এইবার ছুটি চাই”।

একদিন নিবেদিতা বলিলেন ভগিনী সুধীরাকে। তাঁহার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি। “এই বিদ্যালয় রইল—স্বামীজির আশীর্বাদ-পূত এই সম্পদ তোমাদের দুইজনের হাতে তুলে দিলাম আমি।”

নিবেদিতা আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অসুস্থ হইলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না, উপযুক্ত চিকিৎসাও করাইলেন না। তিনি শেষ মুহূর্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য শান্তভাবে

প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমনই তীক্ষ্ণ ছিল নিবেদিতার প্রতিরোধ। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বোসপাড়া লেনের 'ভগিনী নিবাসের' সেই স্বল্প-পরিসর ঘরখানিতে বসিয়া আছেন নিবেদিতা। বসিয়া বসিয়া বুদ্ধের একটি মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন অনেকক্ষণ। এই মূর্ত্তিটি নিবেদিতার বড় প্রিয়। ইহা তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন। প্রতিদিন অতি যত্নে ফুল ও ধূপ-দীপ দিয়া মূর্ত্তিটির সেবা করিতেন তিনি। সেদিন তিনি রোগ-শয্যায় একাকী বসিয়া একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ করুণাঘন তথাগতের ঐ মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র আসিলেন সেখানে। বলিলেন—"শরীর তো সারিতেছে না, আমাদের সঙ্গে দার্জিলিঙ-এ চলুন। অনেক কাজ করেছেন, এইবার একটু বিশ্রাম নিন।"

"বিশ্রাম? তার প্রয়োজন নেই। কাজ করার কথা বলছেন? কি এমন কাজ করেছি?—The little done, the undone vast," এই বলিয়া নিবেদিতা হাসিলেন। সেই স্নিগ্ধ, বিনম্র হাসি। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, "আপনারা আগে যান, আমি পরে আসছি।" বসু-জায়া নিবেদিতার হাত দুইখানি ধরিয়া বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "কাজ কাজ করে শরীরটার দিকে একবারও তাকালেন না?"

"—সে অবসর গুরুজী দিলেন কই? যে-বিরাট কাজের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।" হাসিয়া বলিলেন নিবেদিতা।

শেষ পর্যন্ত আরো কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর অনুরোধে নিবেদিতা দার্জিলিঙ যাওয়া স্থির করিলেন। যাইবার পূর্বে সেই অবস্থায় একদিন অসুস্থ গিরিশচন্দ্রকে দেখিতে গেলেন নিবেদিতা। নটগুরু তাঁহারই প্রতিবেশী। নিবেদিতা থাকিতেন সতেরো নম্বরে আর

গিরিশচন্দ্র তেরো নম্বর বোসপাড়া লেনে। পীড়িত গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "কাল দার্জিলিঙ্ যাচ্ছি। ফিরে এসে যেন দেখি আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।" গিরিশচন্দ্রের রোগশয্যার উপরে তাঁহার নূতন নাটক 'তপোবল'-এর পাণ্ডুলিপি পড়িয়াছিল। নিবেদিতা গিরিশচন্দ্রের নাটকের অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁহার নূতন নাটকের অভিনয় হইলেই তিনি দেখিতে যাইতেন। সেই পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই নিবেদিতা বলিলেন, "ফিরে এসে আপনার নতুন নাটকের অভিনয় দেখব।" নিবেদিতা চলিয়া যাইবার পর গিরিশচন্দ্র তাঁহার সহকারী, অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলিলেন, "নরেন যেন সত্যি একটা আগুনের শিখা রেখে গেছে। শরীরে কী তেজ আর অন্তরে কী স্নেহ-মমতা, দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। বোসপাড়ার এই এঁদো গলিতেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। একেই বলে তপস্যার শক্তি। আমার 'তপোবল' সিস্টার নিবেদিতাকেই উৎসর্গ করব।"

ট্রেনে হঠাৎ আর্য-সমাজী সাধু সুন্দরানন্দের সহিত নিবেদিতার সাক্ষাৎ। সেই লাহোরে ইঁহার সহিত প্রথম আলাপ। সুন্দরানন্দ নিবেদিতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিলেন। দেখা হইতেই তিনি হাত তুলিয়া বলিলেন, "নমস্কার, মাদাম সাহেবা!" নিবেদিতা উত্তর করিলেন, "বলুন সিস্টার, বহিন।" তারপর তিনি সুন্দরানন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া সমাজের কাজ কেমন চলিতেছে, তাহা জানিতে চাহিলেন।

সুন্দরানন্দ। বহিন, আপনাকে বড় দুর্বল মনে হইতেছে, অসুখ করিয়াছে?

নিবেদিতা। (একটু হাসিয়া) আর ভাল লাগে না। এবার ছুটি চাই।

সুন্দরানন্দ। আচ্ছা বহিন, আপনার কি মনে হয়, এই রামকৃষ্ণ মিশন বেশী দিন টিকিবে?

নিবেদিতা। টিকিবে? জানেন মারা যাবার আগে স্বামীজি বলে গেছেন, 'এই বেলুড়ে যে ঘনীভূত আধ্যাত্মিকতার চাপ এলো তা থাকবে পনর শ বছর।'

এই কথা বলিতে বলিতে নিবেদিতা যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, সমস্ত মুখখানি কি একটা উজ্জ্বলতায় ভরিয়া গেল। নিবেদিতার এই ভাব দেখিয়া সেই আর্য-সমাজী সাধু বিস্মিত। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজিকে তো আপনিই সকলের চেয়ে বেশী বুঝিয়াছেন। বলিতে পারেন, তাঁহার চিন্তাধারা স্থায়ী হইবে কি না? নিবেদিতা তখনি উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই। বিশ্বের ভাবরাজ্যে স্বামীজির দান অফুরন্ত, তা ছাড়া তিনি নিজেই তো বলিয়া গিয়াছেন—'যা দিয়ে গেলাম, দেড় হাজার বছরের খোরাক'?"

ইহার পর সাধু সুন্দরানন্দ আর কিছু বলিলেন না।

॥ বাইশ ॥

১৯১১। অক্টোবর। স্থান—রায়-ভিলা, দার্জিলিঙ।

অক্টোবরের গোড়াতে দার্জিলিঙ-এ আসিয়াই নিবেদিতা জ্বরে পড়িলেন। ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকারকে জগদীশচন্দ্র প্রথমে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ডাঃ নীলরতন সরকারকে আসিবার জন্য কলিকাতায় 'তার' করিয়া দিলেন। টেলিগ্রাম পাইবামাত্র নীলরতন সরকার দার্জিলিঙ চলিয়া আসিলেন। তাঁহারা দুইজনেই নিবেদিতাকে খুব যত্নের সহিত পরীক্ষা করিলেন। নীলরতনের গম্ভীর মুখ দেখিয়া জগদীশচন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি বলিলেন—"জীবনের আশা নাই। রক্ত আমাশয়।"

শুনিয়া বসু-দম্পতী উদ্বিগ্ন হইলেন। রক্ত আমাশা। পাহাড়ের দেশে এই ব্যাধি যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। অথচ রোগীকে এখন কলিকাতায় লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। নিবেদিতা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি বাঁচিবেন না। এদেশে যাঁহাদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাদের বোধ হয় শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। হয় তো এই দুর্ভাগা দেশের প্রতি তাঁহার মমতার কোন কথা বলিয়া যাইবার ইচ্ছা কিংবা কাহারো উপর কোন কাজের ভার দিবার ইচ্ছা ছিল। বিশেষ করিয়া আচার্য সতীশচন্দ্রকে তিনি একবার দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

নিবেদিতার এই অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু, জগদীশচন্দ্রের সহকারী বসীশ্বর সেন এবং ডাক্তার নীলরতন ভিন্ন আর কেহ ছিলেন না।

একদিন। সকালবেলায় ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইবার পর অবলা বসু নিবেদিতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবেদিতা বলিলেন—"এবার যাবই। স্বামীজি বলে গেছেন, আমি চুয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই মরব। মনে মনে হিসেব করছিলাম আর কদিন বাদেই তো চুয়াল্লিশে পড়ব।" অবলা বসু বলিলেন, "কী এমন বয়স আপনার? এখনো কত কাজ করবেন।" নিবেদিতা বলিলেন, "জানেন, স্বামীজি মারা গেছেন উনচল্লিশে। একটা গল্প বলি শুনুন। ঘটনাটা স্বামীজি মারা যাবার কিছুদিন আগের। একদিন বেলুড়মঠে একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করবার জন্যে আমার ডাক পড়ল। মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড সেদিন সেখানে ছিলেন। তিনি স্বামীজির শোবার ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই এটা আমার শোনা। সেই সময় স্বামীজি জোসেফাইনকে বললেন, 'আমি কখ্খনো চল্লিশে পৌঁছব না।' জোসেফাইন বললেন—'কিন্তু স্বামীজি, বুদ্ধদেব চল্লিশ থেকে আশী বছরের আগে তো তাঁর জীবনের বড় কাজ করেন নি।' স্বামীজি বললেন, 'আমার যা বাণী তা আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমাকে যেতেই হবে।' জোসেফাইন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন যাবেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বড় হতে দেবে না। ছোটদের জন্যে স্থান করবার জন্য আমাকে যেতেই হবে।' স্বামীজির এই কথাই আজ আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে।"

নিবেদিতা চুপ করিলেন।

নিবেদিতার এক চরিতকার লিখিয়াছেন:

"অবলা বসু সারাদিন সর্বক্ষণ ভগিনী নিবেদিতার রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষায় রত ছিলেন। তিনি শেষ কয়েকদিন কাহারো সহিত বিশেষ কোনো কথা বলেন নাই। চক্ষু বুজিয়া থাকিতেন। হাতে জপের মালা ছিল বটে; কিন্তু

আঙুলদ্বারা ঐ মালা সরাইতেছিলেন না। বাহিরের জগৎ তাঁহার নিকট অস্পষ্ট ও ছায়ার মত অনুভূত হইতেছিল। চিত্তের একাগ্রতা তাঁহাকে সমাধিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। সমস্ত জীবন একটা স্রোতের মত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রবাহিত হইতেছিল।"

কে জানে, জীবনের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইয়া নিবেদিতার হয়ত সেই কথা মনে পড়িত যে-কথা বিবেকানন্দ তাঁহার মহাপ্রস্থানের পূর্বে কন্যাকে বলিয়াছিলেন, "যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হইবে, তখন সব দৌর্বল্য চলিয়া যাইবে—বাহিরের কোন চিন্তা, ভয় বা উদ্বেগই থাকিবে না।" তাই বোধ হয় ভগিনী নিবেদিতা শেষ কয়দিন কাহারও সহিত কথা বলেন নাই—মনের গভীরে নিস্তব্ধভাবে ডুবিয়াছিলেন। 'রায়-ভিলার' পাইন বৃক্ষের পত্রচ্ছায়ায় রহস্যময় অজস্র ইঙ্গিত যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রোগ-শয্যায় শুইয়া শুইয়া কত কথা তাঁহার মনে হইত। মনে পড়িত, সঙ্ঘ-জননী সারদা দেবীর কথা—তাঁহার কত স্নেহই না তিনি পাইয়াছেন। মনে পড়িত একে একে তাঁহাদের কথা যাঁহারা তাঁহার অতি পরিচিত, অতি আপনার ছিলেন। স্বামী সদানন্দ, গোপালের মা, ধীরামাতা, নিজের গর্ভধারিণী মা, ভুবনেশ্বরী দেবী—ইহারা সকলেই আজ জীবনের পরপারে। জীবনের এ-পারে দাঁড়াইয়া নিবেদিতা যেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্পর্শ অনুভব করিলেন।

আর মনে পড়িত—সেই প্রথম বেলুড়ে আসার কথা। গঙ্গার ধারে নীলাম্বর মুখার্জির বাগান বাড়িতে সেই অনাড়ম্বর জীবন। সেখানে তখন অস্থায়ী মঠ। বাগান বাড়িটি ছিল ভারী সুন্দর—ছোটখাট। সম্মুখে একটি পুকুর, পুকুরের ধারে অজস্র ফুল। ধীরামাতা, (ওলিবুল), জোসেফাইন আর তিনি—এই তিনজন বিদেশিনী। স্বামীজির সঙ্গে

সেই দুই মাস তাঁহাদের সবচেয়ে উপভোগ্য হইয়াছিল। প্রতিদিন সকালবেলায় স্বামীজি চা খাইতে আসিতেন—বড় আমগাছের তলায় বসিয়া তিনি চা খাইতেন। সেই গাছটি এখনও আছে। গাছটি তাঁহারা কাটিতে দেন নাই। অপরাহ্ণে তাঁহার ঘরের সম্মুখে আবার চায়ের মজলিশ বসিত। এখানে তিনি স্বামীজির নিকট হইতে কত বিষয়েই না জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সতেজ ও কর্ম-চঞ্চল আচার্যের সেই বিস্ময়কর একাগ্রতা নিবেদিতার জীবনে আজো অম্লান হইয়া আছে। গুরু তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন—'জীবন্ত বেদান্তী'। আর একদিন বলিলেন—'কোন কিছু সত্য বলে যদি বিশ্বাস কর, তবে তা কর; সে সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখো না। ঐটিই তোমার শক্তি।' আর একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়িল। এক বর্ষণমুখর রাত্রিতে স্বামীজি সিংহলের বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী অনাগারিক ধর্মপালকে তাঁহাদের নিকটে লইয়া আসিলেন। কত কথা, কত আলোচনা হইল তাঁহাদের মধ্যে।

মনে পড়িত সেই কাশ্মীর ভ্রমণের কথা। তিন মাস তাঁহারা হাউজ-বোটে ছিলেন। স্বামীজি সকাল পাঁচটায় উঠিয়া পড়িতেন। তিনি ধূমপান করিতেছেন আর মাঝিদের সহিত কথা বলিতেছেন। তারপর তাঁহারা তিনজনে (নিবেদিতা, জোসেফাইন আর ধীরামাতা) স্বামীজির সহিত লম্বা দুই ঘণ্টা বেড়াইতে বাহির হইতেন। সূর্যের আলো গরম হওয়া পর্যন্ত চলিত এই ভ্রমণপর্ব। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজি ভারতবর্ষের কত কথা বলিতেন—মানবজীবন নিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষের আদর্শ কি, ইসলাম কি করিয়াছে—এইসব আলোচনা চলিত। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে কথা বলিতেন—ঐসব আলোচনায় যেন ডুবিয়া যাইতেন। তাঁহারা তিনজনে শুনিতেন আর সেই ফরগেট-মি-নট ফুলভরা মাঠের মাঝ দিয়া যাইতেন।

তাঁহাদের মাথার উপর পাহাড়ী পথে ফুলগুলির সৌন্দর্য হলুদ ও নীল রঙে যেন ফাটিয়া বাহির হইয়াছে।

রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া নিবেদিতা এইসব ভাবিতেন। মনে হইত—এসবই যেন সেদিনের ঘটনামাত্র।

বাতাসে মহাজীবনের শাশ্বত সঙ্গীত যেন তরঙ্গায়িত। শেষের কয়েক দিন এক বিচিত্র অনুভূতিতে নিবেদিতার সমগ্র সত্তা আবৃত হইয়া থাকিত, পূর্ণ হইয়া থাকিত। শিয়রে বসিয়া বসু-জায়া। তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া অঙ্কিত। মাটির পৃথিবীর অপরিসর গণ্ডী ভাঙিয়া দিয়া মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হন নিবেদিতা—দূর অলক্ষ্যলোক হইতে বোধ করি তাঁহার জীবনদেবতার আহ্বান আসিল। নিবেদিতা তাই প্রস্তুত হন। মহাপ্রস্থানের পথে চলিবার জন্য মনে মনে মহাযাত্রার আয়োজন করেন তিনি। সকল বিষয় হইতে ধীরে ধীরে সংবৃত করিয়া আনেন তাঁহার মন।

৭ই অক্টোবর। নিবেদিতা বুঝিলেন অসুখ সারিবে না। একটিমাত্র কাজ এখনো বাকী আছে। উইল করা। স্কুলটির জন্য একটি উইল করা দরকার। ক্ষুদ্র হইলেও এই বিদ্যালয়টিই তাঁহার মহৎ সৃষ্টি। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার নিবেদিতা-জীবন।

তাই তাঁহার যাহা কিছু চিন্তা-ভাবনা স্কুলটিকে কেন্দ্র করিয়াই। নিবেদিতার চিন্তা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহারই নির্দেশে উইল সম্পাদিত হইল। উইলের একস্থানে লেখা হইল :

"ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে আমার নামে যে সাড়ে চারি হাজার টাকা গচ্ছিত আছে, পরলোকগতা মিসেস ওলিবুলের এস্টেট হইতে যে সাত শত পাউণ্ড আমি পাইব এবং আমার যাবতীয় পুস্তক হইতে যাহা আয় হইবে, এ সবই আমি বেলুড়মঠের ট্রাষ্টিদিগের উপর অর্পণ করিলাম। তাঁহারা এই টাকার দ্বারা একটি ফাণ্ড খুলিবেন। ভারতীয় নারীদের শিক্ষাকল্পে যে-বিদ্যালয়টি স্থাপিত

হইয়াছে, উহার পরিচালনার জন্য ঐ ফাণ্ডের টাকা ব্যয় করা হইবে এবং এই বিষয়ে ট্রাষ্টিদিগকে পরামর্শ দিবেন সিস্টার ক্রিস্টিন।"

ঘরের জানালা দরজা সব খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আকাশ প্রান্তিকে উদয়াচলের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া দেখা যাইতেছে' ধবল শিখরের উদার ঋজু দেহ, সেই অসীম স্তব্ধতার আবরণ ভেদ করিয়া বাতায়ন-পথে ধ্যাননতলোচনা তাপসীর কেশ ও কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে শঙ্করের প্রথম আলোক-আশীর্বাদ আর ক্ষীণ শুভ্র দেহের উপর দিয়া বহিতেছে নবপ্রভাতের বিশ্বব্যাপী মধুর স্পর্শ। আজ তাঁহার জীবন আর তাঁহার ভুবন এক হইয়া গিয়াছে। চারিদিকের আকাশে নিঃশব্দ করতালি। শরতের সোনালি রৌদ্র। নিবেদিতার মন সেই আলোর আনন্দধারায় যেন স্নান করিল। একটি অবিচলিত প্রশান্তি তাঁহার দুই চক্ষে। 'রোগশয্যায় শুইয়া আছেন, তবু তাঁহাকে ব্যাধিগ্রস্তা দেখাইতেছে না। চক্ষের উজ্জ্বলতা করুণায় পূর্ণ। যেন তপঃক্লিষ্টা তাপসী, আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্য দিয়া চলিয়াছেন মহাপ্রস্থানের পথে। সমস্ত মুখখানিতে উদ্ভাসিত প্রীতি ও শান্তির ধারা। দূরত্বের অনুভব অন্তরে যেন ক্রমশঃ নিবিড় হইয়া আসিতেছে। জীবনের নির্জন সমুদ্রতীরে নিবেদিতা যেন তাঁহার জীবনদেবতার পদক্ষেপ শুনিতে পাইলেন। মৃত্যুর চারদিন পূর্বে ডায়েরীতে লিখিলেন, "মৃত্যু" ও "প্রিয়তম"—তাঁহার জীবন-যজ্ঞের আহুতির শিক্ষা, মানুষকে শেষ উপহার। এই দুইটি ক্ষুদ্র রচনা তাঁহার রোগশয্যার মানসিক দর্পণ। নিবেদিতা তাঁহার জয়যাত্রার আয়োজন যেন ভরিয়া লইয়াছেন গভীর অনুভূতির চরম দেখায়। তাঁহার অন্তরের জ্যোতি সমস্ত রোগক্লিষ্টতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার চেতনা ও জ্ঞান কী আধ্যাত্মিক রূপদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার পরিচয় আছে এই শেষ রচনা দুইটির মধ্যে।

"মৃত্যু" সম্বন্ধে লিখিলেন :

"গত রাত্রিতে আমার মনে হইল, এই বস্তুর জগতের সহিত সংমিশ্রিত অথবা ইহার অতীত আর একটি জগৎ আছে—তাহাকে ধ্যান বল, কিম্বা মন বল, অথবা যাহা ইচ্ছা তাহা বল—সম্ভবত মৃত্যুর অর্থ উহাই। এ-লোকে স্থান পরিবর্তন নাই। কেননা, এই জগৎ বস্তুর জগৎ নহে, ইহার কোন স্থান থাকিতে পারে না। পঞ্চভূতে গঠিত এই শরীরের কল্পনা হইতে বিমুক্ত হইয়া আপন সত্তার গভীরে ডুবিয়া যাওয়া—ইহাই তো মৃত্যু। মৃত্যু উদার, মৃত্যু মঙ্গলময়। মৃত্যুর স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে সসীমের মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বিলয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা আমি চিন্তা করিলাম। সীমা এবং অসীমের সীমান্ত প্রদেশে দাঁড়াইয়া সীমাতীতকে পাওয়াই তো মানুষের নিয়তি-নির্দিষ্ট কাজ। যতই চিন্তা করিতেছি ততই আমার মনে হইতেছে মৃত্যুর অর্থ ধ্যানের মধ্যে বিলয় পাওয়া—ঠিক যেন আপন সত্তার কূপের মধ্যে প্রস্তরখণ্ডের নিমজ্জন। জীবনের শান্ত নির্জন প্রহরগুলির মধ্যেই আছে প্রাগ-মৃত্যুর অবস্থা—মন তখন শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনের চিন্তা করে—সেই চিন্তাই জীবনের সকল চিন্তার, সকল কর্মের এবং সকল অভিজ্ঞতার উপসংহার। জীবন হইতে মৃত্যুলোক উত্তরণ করিবার সময়েই আত্মা নবজন্ম লাভ করে এবং নূতন জীবনের সূচনা হয়। আমি অবাক হইয়া ভাবি যে, প্রেম ও কল্যাণের দ্বারা আমাদের সমগ্র জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা সম্ভব কিনা—সে-জীবনে বিপরীত চিন্তার একটিমাত্র তরঙ্গ উঠিবে না; তবেই না আমরা অন্তিমমুহূর্তে সেই পরম লগ্নের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব এবং আত্মচিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তের রাজ্যে স্থান পাইব। তখনই আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই পৃথিবীর সকল প্রয়োজন, সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি একমাত্র অনন্ত শান্তি ও কল্যাণের মধ্যে।"

দ্বিতীয় রচনাটির নাম : "প্রিয়তম"

"আমি যেন সর্বদাই মনে রাখি যে, ঈশ্বরের জন্য আর্তিই হইল সমগ্র জীবনের অর্থ। আমার প্রিয়তমই প্রিয়তম—যিনি আমার জীবনের বাতায়ন দিয়া উঁকি মারেন এবং যিনি আমার জীবনের দরজায় করাঘাত করেন। আমার প্রিয়তমের কোন অভাব নাই, তথাপি তিনি মানুষের বেশে আমার দরজায়

আসেন, তাঁহার প্রয়োজন জানান, যাহাতে আমি তাঁহার সেবা করিতে পারি। তাঁহার কোনো ক্ষুধা নাই, তথাপি তিনি প্রার্থনা করেন, আমি যেন তাঁহাকে দিতে পারি। তিনি আমার কাছে আসেন, আমি যাহাতে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারি। তাঁহার ক্লান্তিবোধ আছে, আমি যাহাতে তাঁহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে পারি। তিনি ভিক্ষুকের বেশে আসেন, যাঁহাতে আমি দান করিতে পারি। প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম, আমার যাহা কিছু আছে, সবই তোমার। হ্যাঁ, আমিই তোমার। আমার 'আমিত্ব' বিনাশ করিয়া তাহার স্থলে তুমি আসিয়া দাঁড়াও।"

দিনের আলো ফুটিয়া উঠিল। অনন্তের সঙ্গে ঐক্য-অনুভূতি ক্রমে নিবিড় হইয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে উপনিষদের বাণী উচ্চারণ করিয়া নিবেদিতা জীবনের শেষ প্রার্থনা করিলেন। সর্বশেষে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিলেন—"তরণী ডুবিতেছে; আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখিব।" ইহজীবনে নিবেদিতার কণ্ঠে উচ্চারিত ইহাই শেষ কথা। প্রত্যুষেই নিবেদিতার জীবন-দীপ নিভিয়া গেল। শুক্রবার, তেরই অক্টোবর, সকাল সাতটায় নিবেদিতার মৃত্যু হইল। এমন শান্ত ভাব তাঁহার মুখে যে, মৃত্যু ও জীবনের প্রভেদ সে মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। সেই দুকূলপ্লাবী প্রাণশক্তির প্রতিমা হিমালয়ের নির্জন কোলে চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। 'রায়-ভিলার' পাইন-শীর্ষে তখন প্রভাত-সূর্যের রক্ত আভা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রত্যুষের প্রসন্নতার মধ্যে ঝল্‌মল্ করিতেছে দেবতাত্মা হিমালয়ের মৌন মহিমা। সেই নবারুণ রশ্মিতে উদ্ভাসিত পথ দিয়াই নিবেদিতা জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন। অবলা বসুর স্নেহময় কোলে মাথা রাখিয়াই রিক্তা, আভরণহীনা, চিরতপস্বিনী তাঁহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নিবেদিতার মৃত্যু-প্রসঙ্গে শোকবিহ্বল চিত্তে শ্রীযুক্তা অবলা বসু লিখিয়াছেন :

"কিছুকাল আগে নিবেদিতা বিদেশে আমার রোগশয্যাপার্শ্বে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আজ আমার পালা। আমাদের সকলেরই আশা ছিল তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অন্তিম-মুহূর্ত আসিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিবেদিতা আমাদিগকে সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিতেন, কথা যাহা বলিতেন তাহার মধ্যেই তাঁহার চিত্তের নির্ভীকতার পরিচয় পাইতাম। সব সময়েই ভারতের মেয়েদের শিক্ষার কথা ভাবিতেন, আলোচনা করিতেন। তাঁহার জীবনের সমস্ত সঞ্চয়, পুস্তকের যাবতীয় আয়—এ সবই তিনি ভারতের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দার্জিলিঙ-এ আসিবার কয়েকদিন পূর্বে নিবেদিতা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম হইতে একটি প্রার্থনা বাণী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা মুদ্রিত করাইয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার বিদায়-বাণী। ভগিনী নিবেদিতার সমগ্র জীবনই ছিল প্রার্থনা……উমা-হৈমবতীর যে উপাখ্যান তিনি আমাদের নিকট জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন, নিবেদিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া সেই উপাখ্যানটি আমার বার বার মনে পড়িতেছিল। এই শরৎ ঋতুতেই তো উমা পিত্রালয়ে আসিয়া থাকেন। আমার সম্মুখেই তো আর একটি উমাকে দেখিতেছি, যিনি বহু জন্মের পরে তাঁহার নিজ আবাস ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন।……তারপর অন্তিম-মুহূর্তে নিবেদিতার কণ্ঠ হইতে যখন অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইল :

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহিনিত্যম্ ॥

তখন দেখিলাম তাঁহার সমস্ত মুখখানি একটি দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিমীলিত নয়নে নিবেদিতা ভারতের ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন।"



দার্জিলিঙ-এর নির্জন শৈলপ্রান্তে নিবেদিতার চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিসৌধ। প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে: HERE REPOSE THE ASHES OF SISTER NIVEDITA (MARGARET E. NOBLE) OF THE RAMKRISHNA-VIVEKANANDA WHO GAVE HER ALL TO INDIA, 13 OCTOBER, 1911. প্রস্তরফলকটির উপরে নিবেদিতার প্রিয় বজ্রচিহ্নটিও উৎকীর্ণ আছে। নিবেদিতার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠের উদ্যোগে এবং স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টাতেই এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়।

নিবেদিতার মৃত্যু হইল। দেবতার আরতি শেষে যেন দেউলের দীপ নিভিয়া গেল। হিমালয়ের পাষাণে যেন অবরুদ্ধ হইয়া গেল ভাবের কাবেরী-প্রপাত। তাঁহার নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ যেন পূজার স্বর্ণপদ্মদল হইয়া ভারতমাতার চরণে চিরদিনের মত নিবেদিত হইল আজ। তপঃকৃচ্ছ্র এক সার্থক জীবনের প্রশান্ত পরিসমাপ্তি। যজ্ঞাগ্নির হোমশিখা চিরদিনের মত নির্বাপিত হইল। পিছনে পড়িয়া রহিল মাত্র কয়েক মুষ্টি ভস্ম। সেই পবিত্র চিতাভস্মের মধ্যেই মিলাইয়া রহিল এমন একটি বহু-ভঙ্গিম জীবনের ইতিহাস যাহার গভীর আধ্যাত্মিকতা, চারিত্রিক শক্তি, ভারত-প্রীতি, ভারতের জনসাধারণের সেবায় ঐকান্তিকতা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, শিল্পজ্ঞান, নানা বিষয়ে লিখিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সকলের নিকটই শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। হিমালয়ের সানুপ্রদেশে নিবেদিতা দেহ রাখিলেন—হিমগিরির সেই গহন রহস্যভূমিতে জীবনের কী সম্পদ তিনি এই জাতির জন্য রাখিয়া গেলেন, তাহা শুধু হৃদয় দিয়া বুঝিবার মতন, বুদ্ধি দিয়া নহে। কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে তিনি কোনো দিন আসন পাতেন নাই, তাই বুঝি জীবন-প্রান্তে উপনীত হইয়া হিমালয়ের নিভৃত ক্রোড়েই নিবেদিতা তাঁহার অন্তিম শয্যা বিছাইয়া তাহার উপর ক্লান্ত দেহভার রক্ষা করিলেন।

জীবন ভরিয়া তিনি শুধু একটি মন্ত্রই জপ করিয়া গিয়াছেন—'ভারত'। সে-মন্ত্র জপে নিবেদিতার ক্লান্তি ছিল না কোনো দিন। যে-মন্ত্রের মধ্যে তাঁহার নবজন্ম লাভ হইয়াছিল, সেই মন্ত্রের মধ্যেই নিবেদিতা যেন নির্বাণ লাভ করিলেন। সেই ভারতের ধ্যানেই তিনি যেন আজ ডুবিয়া গেলেন। ভারতমাতা তাঁহার এই সেবিকাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

॥ তেইশ ॥

দীপ্ত শিখা নিভিয়া গেল।

মুহূর্তমধ্যে নিবেদিতার মৃত্যু-সংবাদ দার্জিলিঙ-এ ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার অনুরাগী যাঁহারা সেই সময়ে দার্জিলিঙ-এ উপস্থিত ছিলেন, সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহারা একে একে মৃতের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া সমবেত হইলেন। একটি মহৎ-জীবনের অকাল-মৃত্যুতে সকলেই স্তব্ধ হৃদয়ে বেদনাহতচিত্তে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুষ্প-স্তবকে মৃত্যুশয্যা ঢাকিয়া গেল। নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী—তাঁহার শেষকৃত্য তাই হিন্দু শাস্ত্রীয় প্রথামতেই করা সাব্যস্ত হইল।

এই প্রসঙ্গে ১৯১১ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখের "বেঙ্গলী" পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার মর্মস্পর্শী বিবরণটি উল্লেখযোগ্য :—

"নিবেদিতার মৃতদেহ লইয়া শোকযাত্রা বেলা দুইটার সময়ে 'রায় ভিলা' পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানাভিমুখে চলিল। দার্জিলিঙে এত বড় শোকযাত্রা ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। যাঁহারা এই শোকযাত্রার অনুগমন করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন: জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যক্ষ শশীভূষণ দত্ত, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ বিপিনবিহারী সরকার, শ্রীযুক্তা সরকার, বসীশ্বর সেন, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ব্যারিষ্টার ইন্দুভূষণ সেন, মিঃ পি. এডগার, মিস পিগট, শ্রীযুক্তা এস. এন ব্যানার্জি, শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীমতী সরকার, শ্রীমতী সেন, শ্রীমতী হালদার, শ্রীমতী মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বসু, পুর্ণিয়ার সরকারী উকিল, রায়বাহাদুর নিশিকান্ত সেন ও 'দার্জিলিঙ এ্যাডভার্টাইজার' পত্রিকার সম্পাদক, রূপেন্দ্রনাথ এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক। শোকযাত্রা

যখন কার্টরোডে আসিয়া পৌছিল, তখন শহরের সমগ্র অধিবাসী যেন ভাঙিয়া পড়িল। ' রাস্তার দুইধারে সকলেই সারিবদ্ধভাবে নীরবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। সে-দৃশ্য ভুলিবার নহে। জগদীশচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই মাঝে মাঝে শবদেহ বহন করিতেছিলেন। বেলা চারিটার সময় শবযাত্রীদল শ্মশানে আসিয়া পৌছিলেন। শৈল-মূলে সন্ন্যাসিনীর চিতাশয্যা রচিত হইল। ৪-১৫ মিনিটের সময় উত্তরাস্য করিয়া মৃতদেহ চিতার উপরে স্থাপিত হইল। অশ্রুসিক্ত চক্ষে অবলা বসু নিবেদিতার মস্তক ও হাত গঙ্গাজলে ধুইয়া দিলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিলেন। নূতন গৈরিকবাসে তাঁহার দেহ আবৃত, মুখখানি খোলা। মনে হইল, ঘুমাইতেছেন। দক্ষিণ করখানি বক্ষের উপরে ন্যস্ত, কিন্তু করধৃত রুদ্রাক্ষের মালা আজ স্থির, নিশ্চল। মুখাগ্নির পূর্বে সমবেত কণ্ঠে শোক-গম্ভীর স্বরে প্রার্থনা করা হইল। পর্বতমালায় সেই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি উঠিল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক তরুণ ব্রহ্মচারী মুখাগ্নি করিলেন। মুহূর্তমধ্যে চিতা জলিয়া উঠিল। উপস্থিত সকলের বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে নিবেদিতার নশ্বর দেহ বহ্নিস্পর্শে ধীরে ধীরে ছায়া হইয়া, বিম্ব হইয়া মিশিয়া গেল মহানিঃশব্দের অন্তহীন তমিস্রায়। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে যখন চিতা নিভিয়া গেল। নিবেদিতার চিতাভস্ম লইয়া সকলে নিঃশব্দে ফিরিলেন।"

২৩শে অক্টোবর, সোমবার। তিথি—ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

স্থান :—বাগবাজারে নন্দলাল বসুর বাড়ি। সময় :—বিকাল পাঁচটা। নিবেদিতার শোকসভা। সভাপতি :—মতিলাল ঘোষ। নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে যাঁহারা এই সভায় আজ সমবেত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—কিশোরীলাল সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ বসু, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, মিঃ পি. মুখার্জি, নরেন্দ্র কুমার বসু, মহিমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, বিহারীলাল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তি, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ এফ. জে. আলেকজান্দার, দেবেন্দ্রনাথ বসু, মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি।

মঙ্গলাচরণের পর সভাপতি তাঁহার বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মতিলাল ঘোষ বলিলেন ঃ

"শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি মহৎ কর্তব্যবোধেই এই সভায় যোগদান করিয়াছি। ভগিনী নিবেদিতাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তাঁহার মহৎ চরিত্রের গুণেই তিনি ইহা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সকলেরই ভগিনীসমা ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ কেবলমাত্র বাগবাজারের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কিম্বা কলিকাতা বা ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—উহা সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তবে বাগবাজারের অধিবাসীদিগের নিকট তাঁহার স্মৃতি বিশেষ ভাবে পবিত্র এই কারণে যে, এই অঞ্চলেই ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এইখানকার অধিবাসীদের সুখদুঃখের সমভাগিনী ছিলেন এবং তাঁহার নিরলস সেবার দ্বারা তিনি সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কেবলমাত্র স্নেহময়ী জননী অথবা ভগিনীরূপে রুগ্ন ও পীড়িতের সেবা করিতেন না—সে কলেরা কিম্বা প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন—কিম্বা আত্মীয়স্বজন বা বান্ধবহীন অনাথ বা বিধবার যে তিনি দুঃখমোচন করিতেন তাহা নহে—সকলের জন্যই তাঁহার হৃদয় উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার মুখের হাসি হইতে কেহই বঞ্চিত হইত না এবং করুণা তো সকলেই পাইত। নিবেদিতা যেন নারীকুলে সম্রাজ্ঞী বিশেষ ছিলেন। মানবী আকারে তিনি ছিলেন দেবী—যিনি দুঃখযন্ত্রণাক্ষুব্ধ এই মানব-সমাজে সুখ ও শান্তি আনিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের সব কিছুই তিনি ভালবাসিতেন, তবে অন্ধ অনুরাগবশতঃ নহে, স্বাধীন বিচারশক্তির ভিতর দিয়াই তিনি এই সমাজের সহিত একাত্ম হইয়া

গিয়াছিলেন। তিনি শুধু বিদুষী ছিলেন না, অসামান্যা বুদ্ধিশালিনীও ছিলেন। হিন্দুর সামাজিক বিধি-বিধানের মধ্যে তিনি যে সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা উচ্ছ্বাস বা অন্ধ অনুরাগবশতঃ নহে, তন্ন তন্ন করিয়া অনুশীলন করিবার ফলেই। পাশ্চাত্ত্য জগতের নিকট নিবেদিতা যেভাবে ভারতবর্ষকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, একমাত্র সেই কারণেই তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। আজ আমরা তাঁহার মৃত্যুতে শোক করিতে সমবেত হইয়াছি। কিন্তু মহৎ জীবনের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি এখন মহত্তর সুন্দরতর লোকে বাস করিতেছেন—এই কথা ভাবিয়া আমরা আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারি।"

সভাপতির বক্তৃতার পর কিরণচন্দ্র দত্ত বাংলায় ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে স্বরচিত একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পাঠ করিলেন। তাহার পর একে একে বক্তৃতা করিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং মিঃ এফ. জে. আলেকজান্দার। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আবেগময়ী ভাষায় নিবেদিতার জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন:

"ভারতবাসীর জন্য নিবেদিতা যে কি করিয়া গিয়াছেন, ভাবীকাল তাহার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিবে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ্যানি বেসান্ত অপেক্ষা ভগিনী নিবেদিতার দান বেশী—তাহার একমাত্র কারণ এই যে, সুখে-দুঃখে অপমানে বেদনায় এবং পরাধীনতায় জর্জর এই ভারতবর্ষই ছিল তাঁহার ধ্যানের বিষয়। নিবেদিতার বদান্যতা ও বীরত্বের তুলনা নাই। সেবায় তিনি অতুলনীয়া। তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিয়া নহে, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিলেই নিবেদিতার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখান হইবে।"

সেই সভায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল:

"ভগিনী নিবেদিতার অকাল-মৃত্যুতে দেশের যে সমূহ ক্ষতি হইল তাহা স্মরণ করিয়া কলিকাতার এই জনসভা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার

অঞ্জলি নিবেদন করিতেছে। তাঁহার আত্মোৎসর্গ, অকৃত্রিম ভারতপ্রীতি, ভারতের জনসাধারণের জন্য নিরলস সেবা এবং হিন্দু আদর্শের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি নিবেদিতাকে ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।"

২৩ শে মার্চ, ১৯১২ সাল।

স্থান :—কলিকাতার টাউন হল। সময় :—অপরাহ্ণ।

নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শোকসভা। কলিকাতার নেতৃবর্গের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া নিবেদিতা স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক কুমুদবন্ধু সেন গেলেন শেরিফের নিকটে এবং টাউন হলে স্মৃতিসভা আহ্বান করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। শহরের সমস্ত সংবাদপত্রে বিনাপয়সায় শেরিফের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছিল। বিরাট সভা হইয়াছিল টাউন হলে। সভাপতি ছিলেন স্যর রাসবিহারী ঘোষ।

স্যর গুরুদাস হইতে আরম্ভ করিয়া নিবেদিতার গুণমুগ্ধ প্রায় সকলেই এই শোকসভায় আজ উপস্থিত। এক করুণ গম্ভীর পরিবেশ। বিপুল জন-সমাগমে হলটি পরিপূর্ণ। সভা আরম্ভ হইল। প্রথম বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নিবেদিতার স্মৃতিস্বরূপ তাঁহার বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় জনসাধারণের নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদনে সেই সভাতেই দুই হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। সর্বশেষে বক্তৃতা দিলেন সভাপতি। স্যর রাসবিহারী ঘোষ শোকার্দ্র কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন :

"নিবেদিতা ছিলেন বিদুষী এবং উন্নত চরিত্রের মহিলা। বিদেশ হইতে এই দেশে আসিয়া এই দেশকেই তিনি তাঁহার জন্মভূমি জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে এই দেশের মৃত্তিকাতেই তাঁহার অন্তিম শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং আচারে-ব্যবহারে কথাবার্তায় তাঁহার মধ্যে নিষ্ঠাবতী হিন্দু-রমণীর ভাব এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা দেখিয়া মনে হইত সত্যই তিনি যেন পূর্বজন্মে ভারতের কন্যা ছিলেন। নিজেকে তিনি সর্বতোভাবে ভারতের কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া তাঁহার গুরুর দেওয়া সুন্দর নামটিকে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি আজ যে আমরা এত অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছি, ইহার কারণ ভগিনী নিবেদিতা ইহার শুষ্ক অস্থিপঞ্জরে প্রাণ সঞ্চার করিয়া আমাদের সম্মুখে ইহা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি যদি আর কিছু না করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও আমরা ইহার জন্যই নিবেদিতার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিতাম। তিনি হিন্দুধর্মকে অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রত যাপনের মত তিনি জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই জীবনের মূল্য বুঝি নাই, মূল্য দিই নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের রাখী ছিলেন নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্পর্কে তাঁহার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাহা যোগ্যতার সহিত, আন্তরিকতার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। এমন গভীর ভারত-প্রীতি আমরা কোনো বিদেশীর মধ্যে দেখি নাই। কিন্তু নিবেদিতাকে বিদেশিনী বলিতে আমার বাধে। আমার তো মনে হয় তিনি ভারতীয়দের অপেক্ষা বেশী ভারতীয় ছিলেন। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সেবায়, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে—সকল ক্ষেত্রেই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছিলাম। নিবেদিতা আজ নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম ও কীর্তির মধ্যে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন তাঁহার অজস্র রচনার মধ্যে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা সুন্দর রচনা আমি খুব কমই পাঠ করিয়াছি। যদি কোনো ফুলের সৌন্দর্যের সহিত নিবেদিতার অন্তরের সৌন্দর্যের তুলনা দিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে যে-ফুলটির নাম আমার মনে আসে তাহা হইল শ্বেতপদ্ম। শ্বেতপদ্মের মতই শুভ্র ও পবিত্র ছিল তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি। তিনি পবিত্রতার মতই পবিত্র—যেন মূর্তিমতী পবিত্রতা। আমাদের সৌভাগ্য যে, নিবেদিতাকে আমরা পরমাত্মীয়া রূপে

আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ভারতের জাতীয় পুনরুত্থানের ইতিহাসে 'নিবেদিতা' এই নামটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

বক্তৃতার পর নিবেদিতার ভারতপ্রীতি এবং ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহার ত্যাগ ও সেবার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাসূচক একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভায় সংগৃহীত অর্থ নিবেদিতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেওয়া হইয়াছিল। বাংলা তথা ভারতে নিবেদিতার এই একমাত্র স্মৃতির নিদর্শন। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের জুবিলী উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে পাঁচ হাজার টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে 'নিবেদিতা'-বক্তৃতা প্রবর্তনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। ইহার চার বৎসর পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ ছাড়া, দার্জিলিঙের শ্মশানে স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টায় একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়। দুঃখের বিষয়, যিনি প্রাণপাত করিয়া ভারতের—বিশেষ করিয়া বাংলার উন্নতির জন্য আজীবন সেবা করিয়া গিয়াছেন, সেই মহীয়সী নারীর যোগ্য স্মৃতিরক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনসাধারণ আর কিছু করিল না।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতা বাংলার যে কয়জন মনীষীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিল. তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বাহিরে বাংলার তিনজন মনীষীর সঙ্গে নিবেদিতা খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই মিশিয়াছিলেন। ইঁহারা হইলেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র আর অরবিন্দ। ইঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সুনিপুণ লেখনীমুখে নিবেদিতার অন্তর্জীবনের পরিচয় তাহার সকল সুষমা লইয়া যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সহজেই আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে।

নিবেদিতার আত্মবিলোপের কাহিনী এমন করিয়া বর্ণনা আর কেহ করিতে পারিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ

"ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনারি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক; কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

"সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও?' আমি বলিলাম, 'ইংরেজি, এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।' তিনি বলিলেন, 'বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কি? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিষটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।'

"মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও মৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় ত জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা ত সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই।

"যদিও আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ, আপনার নিজের প্রণালী

মতই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাস করিতে চাই না।' বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, 'না, আমার এ কাজ নয়।' বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন—সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনারির মত মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিতেন।

"তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক্ দিয়া তাঁহার পরিচয় লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার একটি জিনিষ ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধ্য তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

"আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারম্বার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

"নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন

কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা, এবং যাঁহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব—কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

"পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দর-দস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিষটা যে কত বড় তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহা-জীবন; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই; প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

"এই যে এতবড় 'আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি, ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে, নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অবচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড় একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কি বুদ্ধি, কি হৃদয়, কি ত্যাগ; প্রতিভার কি জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

"যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের একটা গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনো আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সেদিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড় কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড় করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

"বস্তুত তিনি কি পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষের অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কার-মুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমান কালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড় করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

"যেমনি হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

"তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন; কর্মের মধ্যে একটা

অসম্পূর্ণতা আছেই—কেন না তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিষটা সম্পূর্ণ অক্ষত। এইজন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড় জিনিষ দাবী করে না বলিয়া কর্মের কোন অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

"কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড় হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মত কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

"ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনটারই আয়তন বড় ছিল না, তাহার সকল গুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেইখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড় করিয়া দেখাইতে হইলে যে সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয়, তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

"এইজন্যই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মত একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নীচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার

এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারো নিকট হইতে কোনো দিন ইহার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।)

"তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

"একথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকট-সংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

"তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

"কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বল ভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন তাহাও নহে। তাঁহার এই পাশ্চাত্ত্য স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা

কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতর হইতে সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

"অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল; তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারী করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড় সত্য জিনিষ তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এ-সম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্য-বুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতই ভালবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপল্'কে (People), এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

"বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি ত আমরা দেখি নাই। এ-সম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ

করি নাই। তিনি যখন বলিতেন 'our people', তখন, তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার স্বরটি লাগিত আমাদের কাহারো কণ্ঠে তেমনটি তো লাগেনা। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে, সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়ত সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই, কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

"ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্যা মুসলমান রমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

"লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্প-সাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয়, আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে বুঝিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতঃই তিনি এই ভালটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের আচারব্যবহারকে, তাহাদের নানা প্রকার সংস্কার ও প্রভাবকে নিরর্থক কিম্বা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা বলিয়া মনে করিতেন না। এইজন্য সেই সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাঁহার সমস্ত

বাহ্য রূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানব-প্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

"ভগিনী নিবেদিতার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মত প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না—অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছ হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্য লোকের অসঙ্গত আব্দার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন ; কেবল তাঁহার এইমাত্র ভয় এই ছিল, পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপ্‌ল্‌দের" প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভাল তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন, তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধা-দৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন।

"ভারতবর্ষের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্য পদার্থ, তাহা মোহ নহে—তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এইজন্য অত্যন্ত হীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালিপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র, বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র

পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইখানে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতি মুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

"শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেক দিন অর্ধাশন, অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়িতে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই। এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা যে ভঙ্গ হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাশের শিবকেই যিনি আপন স্বামিরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মত এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

"এইজন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায়, তিনি তাহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

"আমরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর হইয়া যায়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণ কুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত—এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া

এই পরমৈশ্বর্যময় পরম সুন্দরকে ভাবের দিব্য-দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন, তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতে প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন। ("তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ বদয়মাত্মাঃ।)" তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন; আপনকে তুচ্ছ করেন, সংস্কার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।"

ইহাই নিবেদিতা।

এই নিবেদিতাই ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসকে সকল দিক দিয়া আলোকিত করিয়া গিয়াছেন। অথচ এই নিবেদিতাই আজ উপেক্ষিতা। বাংলার জাতীয় ইতিহাসে বিখ্যাতগণের নামের আড়ালে আজ তাঁহার নামটি পর্যন্ত অবহেলিত। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ এবং জগদীশচন্দ্রের কর্মজীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে যে-একটি অনন্যসাধারণ নারী-চরিত্রের মহিমা, আজো কি আমরা তাহার মূল্য দিব না?

তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হইতে চলিল, আজো কি এই মহীয়সী নারীর জীবনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে আলোচিত হইবার সময় আসে নাই?

॥ চব্বিশ ॥

নিবেদিতার জীবনের কাহিনী শেষ হইল।

সেই মহাজীবন, সেই নির্ধূম হোমানল আমাদের জীবনে কী ছাপ কী উত্তাপ রাখিয়া গেল, এখন তাহাই বলিব। একবার মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনার জীবনের লক্ষ্য কি?" উত্তরে নিবেদিতা অমনি বলিলেন—"গুরু বলিতেন, ভারতবর্ষকে ভালবাস, তাই আমার লক্ষ্য, ভারতের কল্যাণ।" প্রকৃতপক্ষে এই একটি কথার মধ্যেই নিবেদিতা তাঁহার জীবনের যাহা কিছু পরিচয় তাহা রাখিয়া গিয়াছেন। তাই নিবেদিতাকে বুঝিতে কষ্ট হয় না, গ্রহণ করিতে দ্বিধা হয় না। নিবেদিতার চারিদিকে জীবনের শতমুখ-বৈচিত্র্য ত্বরিতবেগে আবর্তিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। বিবেকানন্দের বিরাট জীবন আর অখণ্ড বিজয়-গরিমাই ছিল নিবেদিতার জীবনের একমাত্র সম্পদ। সেই সম্পদ তিনি দুই হাতে বিলাইয়া গিয়াছেন তাঁহার বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা ও চিন্তার ভিতর দিয়া।

(বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে আমরা নিবেদিতাকে পাই। আমরা নিবেদিতাকে দেখি—রাষ্ট্রক্ষেত্রে মনস্বী নেতা শ্রীঅরবিন্দ এবং নির্যাতিত ত্যাগী বীর তরুণ সম্প্রদায়ের পার্শ্বে, সাহিত্যক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমীপে, শিক্ষাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর নিকটে, আবার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সন্নিধানে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ইংরেজি

ভাষায় বাংলাভাষার ইতিহাস প্রণয়নে এবং শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য শিল্প-বিশারদ ওকাকুরার শিল্পসম্বন্ধে গ্রন্থরচনায় নিবেদিতা নানাভাবে তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা দিয়া সহায়তা করিয়াছেন। শতদল পদ্মের মতন তাঁহার হৃদয়খানি আত্মনিবেদন, ত্যাগ এবং নিষ্কাম কর্মের জ্যোতিতে দলে দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিয়াছেন :

"নিবেদিতা ছিলেন বিবেকানন্দের উপসংহার। কিন্তু উপসংহার বলিয়া তিনি ঠিক বিবেকানন্দের প্রতিরূপ ছিলেন না। নিবেদিতার জীবনের সামান্যমাত্রও স্পর্শ যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই সেই জ্যোতির্ময় জীবনের বিশালতা, গভীরতা ও শক্তিসঞ্চার দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। একটি দুর্লভ সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাই নিবেদিতার মধ্যে। নিবেদিতার চরিত্রে এবং চিন্তায় দেখিয়াছি ভারতীয় ভাবধারা এবং সাংস্কৃতিক মহিমার সহিত আধুনিক ভাবধারাও উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়াও নিবেদিতা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। ভারতের শিক্ষা কি, সাধনা কি, সমাজের মর্মকথা কি, তাহা তিনি তেমন করিয়াই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যেমন করিয়া বুঝিলে আমরা যথার্থ ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারি—এক বিদেশিনীর পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।"

বিপিনচন্দ্র পাল লিখিয়াছেন :

"ভগিনী নিবেদিতা সারা ভারতে পরিচিত ও ভারতের প্রিয়। নিবেদিতা নাম গ্রহণ তাঁহার সার্থক। ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার ধারাতে তিনি নিঃশেষে আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন। এই ইংরাজ মহিলা সমস্ত জীবন দিয়া ভারতকে যেভাবে ভালবাসিয়াছেন, আমাদের দেশের খুব অল্পলোকই সেভাবে দেশকে ভালবাসেন। নিবেদিতা আমাদের নিকটে আসিয়াছেন শিক্ষা দিতে নয়, শিখিতে; তিনি নূতন কোন বাণীর প্রবক্তারূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ান নাই, দাঁড়াইয়াছেন আন্তরিক শ্রদ্ধার উপাসিকার

রূপ লইয়া। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে ভারতের সাধনার স্বরূপের যে-আভাস তিনি পাইয়াছেন, সেই সাধনার মধ্যে ভালবাসায় নিজেকে মিশাইয়া দিয়া, বিলাইয়া দিয়া—তাঁহার নিজের সত্তাকে তিনি বিকশিত করিতে চাহিয়াছেন। ভারতের সাধনার যে সকল দিকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছে, তাহাদের সত্য রূপটি তাঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন :

"নিবেদিতার মহাপ্রাণতা ও ত্যাগের কথা আমরা ধারণা করিতে পারিব না। দেশ উপযুক্ত হইলে তাঁহার মূল্য বুঝিবে। কতদিন তাহার সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিয়াছি একটি পুতুল বা এক টুকরা পাথর দেখিয়া বিহ্বল হইয়া কি সৌন্দর্য, প্রাচীন ভারতের কি গৌরব তাহার মধ্যে দেখিতে পাইতেন, আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইতাম। এই পরাধীন দেশে জন্মিয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সকল বিষয়ে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। যদি তিনি তাঁহার স্বদেশে য়ুরোপে কাজ করিতেন তবে নাম যশ, অর্থ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িত। সেই সব ত্যাগ করিয়া প্রায় অর্ধাহারে তিনি আজীবন আমাদের দেশের জন্য তিলে তিলে প্রাণ দিলেন। তিনি সত্যই ভারতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

নিবেদিতার মৃত্যুর পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'-তে লিখিয়াছিলেন :

"ইউরোপীয় বংশসম্ভূত যত লোকের কথা আমরা অবগত আছি তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভারতবর্ষকে ভগিনী নিবেদিতা অপেক্ষা অধিক প্রীতি ও ভক্তি করিতেন না। তিনি ভারতভূমিকেই নিজ মাতৃভূমিস্থানে বরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিতেন।"

স্যার যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন :

"ভগিনী নিবেদিতার নিকট হইতে একটি জিনিস আমি শিক্ষা করিয়াছি। তাহা হইল—আত্মমর্যাদাবোধ। আমাকে ইতিহাস-গবেষণার কার্যে প্রেরণা দিবার কালে একটি কথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন,—'কখনো বিদেশীর

নিকট আপনার পতাকা অবনত করিবেন না' ('Never lower your flag to a foreigner')—তাঁহার সেই উপদেশ আমি জীবনে ভুলি নাই।"

এইভাবে ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্যার গুরুদাস, প্রফুল্লচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার, স্বামী অভেদানন্দ, টিলক, লজপৎ রায়, গোখ্‌লে, দাদাভাই নৌরজী, য়্যানী বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু, অবলা বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও তামিল-কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী প্রভৃতি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সার কথা—নিবেদিতা মহিমময়ী নারী। ইঁহারা সকলেই একবাক্যে নিবেদিতার অকৃত্রিম ভারত-প্রীতির প্রশংসা করিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, ভারতের কল্যাণে নিবেদিতা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য ভারতবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। "শুধু বিবেকানন্দের শিষ্যা বলিয়া নহে—তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা এবং ভারতবর্ষের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জগতে বিস্ময় ও প্রশংসার উদ্রেক করিয়াছে। তিনি আইরিশ দুহিতা হইয়াও ভারতবর্ষকে একান্তভাবে তাঁহার স্বদেশ বলিয়াই সরল ও নির্ভীক চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লেগে দুর্ভিক্ষে এবং এই পরাধীন দেশের— বিশেষতঃ বাংলাদেশের অশিক্ষিত ও দুর্দশাক্লিষ্ট নর-নারীর দুঃখমোচনে নিবেদিতার সেবা ও প্রয়াস অতুলনীয়। জগতের ইতিহাসে এই রকম আত্মনিবেদন দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্যিক প্রতিভা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, স্বদেশপ্রেম, ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শে অকপট নিষ্ঠা ও বিশ্বাস, গভীর চিন্তাশীলতা আর অদ্ভুত মনীষা, তাঁহার রচনার প্রতি ছত্রে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। ভারতের শিল্পকলায়, প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় তিনি নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। ভারতের নবজাগরণে তাঁহার দান অসামান্য। নারীর

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান যুগে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে লক্ষ্য রাখিয়া আধুনিক কালোপযোগী যে শিক্ষা-সংস্কার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহার রচনায় সুচিন্তিত সারগর্ভ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

ভারতের বিশিষ্ট জননায়ক ও চিন্তানায়কগণের শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে সুর মিলাইয়া সেই সময়ে ভারতের বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতার অকালমৃত্যুতে যে-সব সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন, সেগুলিতেও তাঁহার প্রতি এই একই শ্রদ্ধা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ নিবেদিতার মৃত্যু-সংবাদে বিচলিত হইয়া সদ্য সদ্য যে-কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, সেটিও অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। সেই কবিতার শেষে সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"এসেছিলে না ডাকিতে, অকালে চলিয়া গেলে, হায়
চ'লে গেলে অল্পআয়ু দুর্ভাগার সৌভাগ্যের প্রায়
দেহ রাখি শৈলমূলে—শঙ্করের অঙ্কে মৃতা সতী!
ওগো দেবতার-দেওয়া ভগিনী মোদের পুণ্যবতী!"

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন, নিবেদিতাও তাই ভারতের সেবায় নিজের জীবনটাকে এমন করিয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অকৃত্রিম ভারত-প্রীতির পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনব্যাপী অকুণ্ঠ এবং অতুলনীয় অবদানের মধ্যে। তাঁহার জীবনেতিহাসে আমরা সবিস্ময়ে দেখিতে পাই সেই তেজস্বিনীর সপ্রেম প্রেরণায় কত জীবন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, কত ভাব প্রকৃত রূপ পাইয়াছে, আবার আমাদের সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সেই বিদেশিনী তপস্বিনীকে কত অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিবেদিতা আমাদের উপেক্ষা ও অনাদর সবই হাসিমুখে বরণ করিয়াছিলেন। কারণ মানুষের মহত্ত্বে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিশ্বাস ছিল ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর। ত্যাগ, তপস্যা ও সেবার

দীপ্তিতে তিনি ভারতের বিংশ শতকের প্রথম দশকের জাগরণকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। অপূর্ব আত্মনিবেদন, গভীর আন্তরিকতা, অফুরন্ত উৎসাহ আর মানবকল্যাণচিকীর্ষা—আমরা দেখিলাম, এইগুলিই প্রধানত নিবেদিতা-চরিত্রের উপাদান। আর সেই, উপাদানের সহিত মিশিয়াছিল অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও সেবার আনন্দ। তাঁহার সৃষ্টির ক্ষেত্র ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষত্বপূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষের আদর্শই ছিল সেই সৃষ্টির উৎস। যে-সৃষ্টি তিনি গড়িতে চাহিয়াছিলেন, আমরা দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কঠোর তপস্যারতা উমার মত নিবেদিতার নবযৌবনে তপঃকৃচ্ছ্রতা যখনই স্মরণ করি, তখনই সেই চরিত্রের অপরিমেয় শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হই। ভারতের চরণে তিনি যে শিক্ষা-দীক্ষা লইয়াছিলেন—একান্ত নিষ্ঠার সহিত নিবেদিতা তাহা উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের মত তিনিও মানবজীবনের পূর্ণ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখে আনন্দে বেদনায় তরঙ্গিত এই পৃথিবীকে পূর্ণভাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন জীবনে। সত্যই তিনি 'জীবন্ত বেদান্তী' ছিলেন। কোনো রকম গণ্ডী তাঁহাকে আড়াল করিতে পারিত না—"সর্ব-মানবচিত্তের মহাদেশে" নিবেদিতা সত্যই আপনাকে প্রসারিত করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার জীবনের সার্থকতা। ভারতকে—ভারতের সংস্কৃতি ও আদর্শকে—পরিপূর্ণভাবে দেখিবার ও দেখাইবার অসীম শক্তিই তাঁহার প্রতিভাকে এমন প্রাণবান জ্যোতিষ্মান করিয়া তুলিয়াছিল। নিবেদিতার মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই না ভারতের কর্মক্ষেত্রে সিংহিনী-সমা এই বিদেশিনী নারীকে স্বামী বিবেকানন্দ সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন।

নিবেদিতার ভিতরে যে মহাশক্তি ছিল তাহাকে সেদিন সম্মান দিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিবেদিতার চরিত্র যে-স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আর গিরিশচন্দ্র নিবেদিতাকে তাঁহার 'তপোবল' নাটকখানি উৎসর্গ করিয়া তাঁহাকে সম্মান দিয়াছিলেন। নিবেদিতার চরিত্র, চিন্তাধারা, কর্মপ্রচেষ্টা ও শক্তি গিরিশচন্দ্রকে মুগ্ধ না করিয়া পারে নাই। তাই তাঁহার 'তপোবল' নাটকের উৎসর্গ-লিপিতে গিরিশচন্দ্র লিখিলেন ঃ

"পবিত্রা নিবেদিতা!

বৎসে!

তুমি আমার নূতন নাটক হইলে আনন্দ করিতে। আমার নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে, তুমি কোথায়? দার্জিলিঙ্ যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলে, 'আসিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি ত জীবিত রহিয়াছি, কেন বৎসে, দেখা করিতে আইস না? শুনিতে পাই, মৃত্যুশয্যায় আমাকে স্মরণ করিয়াছিলে; যদি দেবকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া এখনও আমায় তোমার স্মরণ থাকে, আমার অশ্রুপূর্ণ এই উপহার গ্রহণ কর।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সম্মিলনের মধ্যস্থানে বসিয়া যাঁহারা বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে বীণাবাদন করিয়াছিলেন, মহীয়সী ভগিনী নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতমা। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় ভাবধারার চিরন্তন সত্যের পুনঃ পরীক্ষা ও প্রকাশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যের নিকট ভারতকে যাঁহারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অকৃত্রিম অবদানে মোক্ষমূলর অগ্রণী। জ্ঞানের মধ্য দিয়া কল্পনানেত্রে তিনি ভারতের যে সংস্কৃতিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, নিবেদিতা অনুভূতির রাজ্যে প্রাণের নিত্য মন্দিরে তাহা

সত্য করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া মোক্ষমূলর ভারতের অপার সৌন্দর্য ও গভীরতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নিবেদিতা একেবারে মধ্যস্থলে অবগাহন করিয়া সেই আনন্দরাজ্যে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। এইখানেই তাঁহাকে ভারতীয়ের অধিক ভারতীয় বলিয়া মনে হয়। বাহির হইতে ভিতরে আসিয়া তিনি এত সহজরূপে ভিতরের হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য-দীপ্তিতে ভিতরের সকলেই বিচিত্র বৈভবে রমণীয়তা লাভ করিল। য়ুরোপীয় আবরণে নিবেদিতা শাশ্বত ভারতীয়।

অথচ তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। নিরলস কর্মের আধার ছিলেন নিবেদিতা। এই জাতির শিয়রে ছিল তাঁহার নিত্য অতন্দ্র জাগরণ। অসীম শক্তির আধার হইয়াও তিনি যেন কর্মকে সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃতরূপে দেখিতে চাহিতেন। সেই জন্য সমসাময়িক সকল সমস্যা, আন্দোলন ও সংস্কার-উদ্যমের সহিত তিনি নিজেকে জড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতের আত্মা তাঁহার মধ্যে যেন আত্মপ্রসারণের স্বপ্নে মাতাল হইল। তিনি কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যেই বিচরণ করেন নাই, রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষভাবে নামিয়াছিলেন। ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের তিনি কেবল বিস্ময়ই নহেন, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণারও পূর্ণ অনুভূতি। নিবেদিতা যেন বহু প্রশ্নের সুমীমাংসিত সমাধান, অবিশ্বাসের বিলুপ্তি ও সুন্দরের বিজ্ঞপ্তি। ভারত সম্পর্কে বিদেশীদের সন্দিগ্ধ প্রশ্নসমূহের তিনি যেন চিরন্তন উত্তর। দূর হইতে রোমা রোলাঁ ভারতীয় যে মনীষাকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, তাহাকেই অধিক শ্রদ্ধেয় করিয়াছেন নিবেদিতা। এইখানেই তিনি একেশ্বরী। ভারতের নদী গিরি কান্তার, ভারতের তীর্থ, ভারতের পৌরাণিক কাহিনী, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, ইহার সমাজ—এ-সকলের মূলে নিবেদিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন নূতন ও অপরিসীম সৌন্দর্য।

ভারতের শিব, ভারতের বুদ্ধ তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। ভারত তাঁহার কাছে মহিমার জন্মভূমি, এসিয়ার তীর্থক্ষেত্র। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়াইয়া এই মহামানবী বিশ্ব-দেবতার বন্দনা করিয়াছিলেন। নিবেদিতার জীবনের ইতিহাস তাই তাঁহার এই ভারত-প্রীতির মধ্যেই কেন্দ্রস্থ। আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকের চক্ষে ভারতবর্ষকে দেখিতেন নিবেদিতা—এক দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার ধূসর অতীত হইতে গৌরবোজ্জ্বল মহাভবিষ্যৎ পর্যন্ত। ভারতের ইতিহাসে দর্শন আর ধর্মের সমন্বয়ে যুগশক্তির প্রভাব যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মধ্যে। ভারতের শুভ ও ধ্রুব আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাঁহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। নিবেদিতার চিত্তের প্রতিষ্ঠাভূমি ছিল ভারতীয় আদর্শের মধ্যে, অথচ কোনো রকম সংকীর্ণতার ছায়াপাত হয় নাই সেই চিত্তের উপর।

য়ুরোপ হইতে অনেকে অনেক কিছু লইয়া ভারতে ফিরিয়াছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের মত আর কেহই এমন একটি দুর্লভ রত্ন আনিয়া ভারতমাতার চরণে উপহার দিতে পারেন নাই। সেদিন সন্ন্যাসীর ভিক্ষার ঝুলি ইংলণ্ডের এই একটিমাত্র অযাচিত দানে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিবেদিতার সেবা ও তপস্যা নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, ভারতমাতা প্রসন্ন মনে য়ুরোপের এই দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতার মধ্যে এমন কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা বিবেকানন্দ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এই পবিত্র-হৃদয়, পরসেবোন্মুখ, তীক্ষ্মমেধাশালিনী তেজস্বিনী নারী দ্বারা তাঁহার বহু কাজ হইবে।

"বিবেকানন্দ যদি আর কিছুই না করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও ভারতবর্ষকে যে নিবেদিতার ন্যায় তাঁহার স্বহস্ত গঠিত একটি অপরূপ

ফল প্রদান করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই ভারতের লোক তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাইত। কারণ, নিবেদিতাকে শুধু স্বামীজির একটি মাত্র শিষ্যারূপে দেখিলে চলিবে না। এক নিবেদিতা সহস্র শিষ্যের সমান কাজ করিয়া গিয়াছেন। দেবোপম চরিত্র, অদ্ভুত গুরুভক্তি ও তিতিক্ষা, অসাধারণ ধীশক্তি ও কার্যকারিতা এবং সর্বোপরি এক অপূর্ব শক্তিশালী লেখনী তাহাকে আশ্রয় করিয়া বহুদিকে ব্যক্ত হইয়াছিল।" স্বামীজির বাণীর তিনিই ছিলেন জীবন্ত ভাষ্য। নিবেদিতা না থাকিলে বিবেকানন্দের বাণী জগতের সর্বত্র এমনভাবে প্রচারিত হইত কি না সন্দেহ। কর্মক্ষেত্রে পরিপূর্ণ কর্মী, সাধনক্ষেত্রেও তেমনি উন্নত-সাধিকা। বহু ব্যক্তিত্বের একত্র সমাবেশ নিবেদিতা। জটিল ও বিচিত্র সেই ব্যক্তিত্ব।

নিবেদিতা-প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন :

"নিবেদিতার জীবন সেবা ও আত্মদানমূলক তপস্যার জীবন। বাহিরের শোভযাত্রায়, ধ্বজপতাকায় তাহার জয়-ঘোষণা হয় নাই। গুরুর নিকট হইতে যে অগ্নি তিনি আপন হৃদয়-পাত্রে চয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তেজ তিনি সযত্নে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন—সেই অপরিমেয় শক্তিকে সংবরণ করিয়া, তাহার পাবকশিখায় আপনাকেই নিরন্তর দগ্ধোজ্জ্বল করিয়া, তিনি কেবল তাহার আলোটুকুই বিকিরণ করিয়াছিলেন। গুরু তাঁহার এই আত্মসৃষ্ট কন্যাটিকে যে-ব্রত দিয়াছিলেন এবং নিবেদিতা যেভাবে তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গেল। কাজেই নিবেদিতাকে জানিতে বা বুঝিতে হইলে তাঁহার বাহিরের জীবন-যবনিকার অন্তরালে একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বাংলার মাটিতে নূতন করিয়া হলকর্ষণের পর, যখন নব জীবনের বীজ বপন ও বারিসেচন আরম্ভ হইয়াছে, তখন দিকে দিকে কত অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে নিবেদিতা যেন আর একটি বীজ। এই বীজ যেন সকলের দূরে,

এক কোণে—নিজেকেই ফলপুষ্পে বিকশিত করিবার জন্য নয়, অপরগুলির সাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য, এমন ফসলের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, যাহা বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না; সে কেবল সার হইবার ফসল। বাংলার মাটিতে তাহা মিলাইয়া গিয়াছে। সেই কালের অব্যবহিত পরে আমরা বাংলার উদ্যানে ফলফুলের যে আকস্মিক বাসন্তী-শোভা দেখিয়াছিলাম, ভগিনী নিবেদিতার নীরব আত্মোৎসর্গ তাহার মৃত্তিকাতলে কোন্ রসধারা গোপনে সঞ্চারিত করিয়াছিল—তাহা নির্ণয় করিবে কে? নিবেদিতার আত্মবিলোপের কথা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার জাতি ও দেশ, ধর্ম ও শিক্ষা, রুচি ও সংস্কার এমনই ভিন্ন, এবং বয়োধর্মে এমনই দৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য হইয়াছিল যে, শুধু মনে বা ভাবজীবনে নয়—একেবারে কায়মনোবাক্যে এমন গোত্রান্তরিত হওয়ার কথা কে কোথায় শুনিয়াছে? ধর্মান্তর গ্রহণ বরং সহজ, কিন্তু একই দেহে জন্মান্তর-গ্রহণ কে কোথায় দেখিয়াছে?" এই দিক দিয়া নিবেদিতার জীবন সত্যই অনন্যসাধারণ। ধর্মের মধ্য দিয়া শিক্ষা, সমাজ চেতনা ও দেশপ্রেমকে জাগাইতে হইবে—ইহাই ছিল নিবেদিতার দৃঢ় ধারণা।

নিবেদিতা-আধারে এক মহাশক্তির প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। সে-শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নিকট নতি স্বীকার করে নাই, এমন কি বিবেকানন্দের নিকটে পর্যন্ত না। আপন মতে তাঁহার অবিচল নিষ্ঠা দেখিয়া স্বামীজি পর্যন্ত মুগ্ধ হইতেন। বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন আত্মপ্রত্যয়হীন এই সমাজে, বিশেষ করিয়া ভারতের মেয়েদের মধ্যে, চেতনা আনিবার জন্য প্রয়োজন রজোগুণের। সেই রজোগুণের আধার ছিলেন নিবেদিতা। আমরা দেখিয়াছি, ভারতবর্ষে আসিয়া কলিকাতার এক নগণ্য পল্লীর নিতান্ত সাধারণ একখানি বাড়িকে কেন্দ্র করিয়া নিবেদিতা কেমন করিয়া জনকল্যাণ-সাধনের দুশ্চর ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। কিন্তু কেহ জানিল না, ইহার উৎস

কোথায়? কোথায় পাইলেন তিনি সঞ্জীবনী-সুধা, যাহা তিনি নিঃশেষে বিতরণ করিয়া গেলেন? বিরাট প্রতিভা কি করিয়া এতখানি মাধুর্যমণ্ডিত, নিষ্কাম প্রেমপূর্ণ—কেহ তাহার সন্ধান করিল না। স্বামী বিবেকানন্দ নারীর মধ্যে যে বীরোচিত দৃঢ় সংকল্পের সহিত জননী-সুলভ হৃদয়ের সমাবেশ, তেজ ও সাহসের সহিত মলয়মারুতের কোমলতা একাধারে দেখিতে চাহিয়াছিলেন—কোন্ মন্ত্রে তাহা উদ্‌বোধিত হইবে? বিবেকানন্দের সম্মুখে ছিল রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী, সারদা দেবীর আদর্শ—শাশ্বত মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নারী-মহিমা। তিনি সেই আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহার সিংহিনী-সমা মানস-কন্যা নিবেদিতার মধ্যে। অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের মন্ত্র দিয়াই বিবেকানন্দ নিবেদিতার অভিষেক করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন একমাত্র অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা নারীতেই নারীজনোচিত কোমলতার সঙ্গে বীরোচিত দৃঢ় সংকল্প সম্ভব। বিবেকানন্দের অদ্বৈতবোধ নিবেদিতাকে উদ্বুদ্ধ করিল। নিবেদিতা এই অদ্বৈতজ্ঞান অঞ্চলে বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাই না নিবেদিতা সর্বদা নিজেকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলিয়া পরিচয় দিতেন। মহাপ্রয়াণের এক বৎসর পূর্বে এক চিঠিতে বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে লিখিলেন :

"আমার অনন্ত আশীর্বাদ জানিবে। কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না। ...ক্ষত্রিয় শোণিতে তোমার জন্ম, আমাদের অঙ্গের গৈরিকবাস ত যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু-সজ্জা। ব্রত উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নহে।"

আমরা দেখিয়াছি, নিবেদিতার জীবনে ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। ইষ্ট আর স্বদেশ অর্থাৎ ভারত এবং ভারতের আপামর জনসাধারণ—এই তিন ভিন্ন নিবেদিতা আর কিছুই জানিতেন না; আর কিছুই মানিতেন না। চরিত্র-সুষমায় সুন্দর উজ্জ্বল তাঁহার

জীবন যেন বিকশিত শতদল। সেই শতদলের প্রত্যেকটি পাঁপড়ি বেদান্ত-আভাতে সমুজ্জ্বল।

আমরা দেখিলাম, বিরাগিনী, প্রেমিকা, তপস্বিনী নিবেদিতা "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া ভারতের নারী-সমাজের কল্যাণ-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উপকরণ-বিরল সামান্য বিদ্যালয়, গুটি কয়েক ছাত্রী—ইহারই মধ্যে আমরা তাঁহার প্রতিভার দুর্লভতম বিকাশ দেখিয়াছি। বাগবাজারের একটি সংকীর্ণ গলির নিকট নিবেদিতা সত্যই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সে-আত্মনিবেদনের প্রকৃত মূল্য বাঙালি আজো উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

নিবেদিতার জীবন-কাব্যের আরেকটি মধুর দিক আছে। সেটি তাঁহার সহজাত মাতৃভাব। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে মাতৃভাবের এমন স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ছিল যাহা সহজেই মানুষকে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিত। কলিকাতার প্লেগের সময়ে তাঁহাকে আমরা নিঃসঙ্কোচে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে ঐ ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর পরিচর্যা স্বহস্তে করিতে দেখিয়াছি। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজ পর্যন্ত তাঁহার ঐ কার্যের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। একদিন দেখা গেল, প্লেগে আক্রান্ত নীচজাতির অস্পৃশ্য একটি ছেলে তাঁহার কোলেই মারা গেল, মৃত্যুর পূর্বে সেই ছেলেটি নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত নিবেদিতাকে ঠিক যেন তাঁহার মা মনে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল। স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন বহু ঘটনা নিবেদিতার জীবনে আছে যাহার মধ্যে তাঁহার এই সহজাত মাতৃভাব সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

শিক্ষার প্রতি ভগিনী নিবেদিতার আজন্ম অনুরাগ। আমরা দেখিয়াছি, স্বামীজির সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে তিনি নিজে ছিলেন একজন প্রথিতযশা শিক্ষয়িত্রী। ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার দান ভুলিবার তো নহেই, বরং উহার মধ্যে, অনুসন্ধান করিলে, ভবিষ্য জাতিগঠনের বহু উপাদান পাওয়া যাইবে। ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যে কত চিন্তা করিতেন এক কথায় তাহা বলিবার নহে। 'হিন্টস্ অন ন্যাশনাল এডুকেশন' গ্রন্থখানি তাঁহার এই চিন্তার ফল। প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর এই মূল্যবান বইখানি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা উচিত এবং ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার উপদেশগুলি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে এমন অভ্রান্ত দিক্-নির্দেশ শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেন নাই যেমন করিয়াছেন নিবেদিতা।

শিক্ষা বলিতে নিবেদিতা সেই প্রাণদ তথা জীবন্ত ভাবরাশিকেই বুঝিতেন যাহা বালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করিয়া তুলে। নিবেদিতা বলিয়াছেন ঃ

"কেবল শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জদ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না। শুধু বুদ্ধির উৎকর্ষ দ্বারা যে শিক্ষা মানুষকে কেবল ধূর্ত বা চতুর করে,—যাহা শুধু জীবন-নির্বাহের পাথেয় সংগ্রহের উপায়মাত্র হইয়া দাঁড়ায়,—তাহা দ্বারা অনুকরণপ্রিয় একটি মর্কট গড়িয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা মানুষকে যথার্থ মানুষ করে না, তাহার অন্তর্নিহিত শৌর্য, ও মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে না। যে সত্যকে লাভ করিলে আমাদের জীবনকে সরল ও আনন্দময় করিয়া তোলা সম্ভব, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সাবলীল চিন্তাশীলতা যে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র হইয়া না দাঁড়ায়, ততদিন আমাদের হৃদয় বুদ্ধির দ্বারা কোন মহৎকার্য ও উচ্চচিন্তার প্রতি উন্মুক্ত হইবে না।"

নিবেদিতার পরিকল্পিত শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি,—সেবায়, আত্মত্যাগে। আত্মত্যাগই প্রকৃত বীরহৃদয়ের চিরন্তন সঙ্গীত ও শাশ্বত প্রেরণা। নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া জনসাধারণের শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করাকেই নিবেদিতা প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি তাই বলিতেন :

"স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের শিক্ষা শুধু একটি শুভ কামনা বা কল্পনায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তাহাকে যেদিন একটি মহান কর্তব্য বা দায়রূপে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারিবে, সেইদিন শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন সম্ভব হইবে। শিক্ষা কেবল জাতীয়তা-বোধ জাগাইবে না, পরন্তু উহা জাতি-গঠনমূলকও হইবে।"

স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক শিক্ষায়তনে নিবেদিতার এই মূল্যবান কথা কয়টি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মতন! জাতীয়তা-বোধকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা আরম্ভ হইলেই, দেশকে অন্তর দিয়া ভালবাসা ও সেবা করা সম্ভব। তাই নিবেদিতা শিক্ষার প্রথম সোপানে আন্তর্জাতিকতাকে বড় একটা উচ্চ আসন দেন নাই। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বদেশপ্রীতির ভিত্তিভূমিতে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে না পারিলে, বা দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে শ্রদ্ধা করিতে না শিখিলে, প্রথম হইতেই শুধু আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে সব কিছু দেখিতে আরম্ভ করিলে তাহা দ্বারা স্বদেশের প্রতি প্রীতি জাগিবে না—দেশবাসীর কল্যাণ সাধিত হইবে না; বরং জাতীয়তাবোধের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইবে।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার আদর্শ বিবেকানন্দের আদর্শেরই অনুরূপ। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, একটি জাতিকে যদি বাঁচিতে হয় তবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমবেত শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইবে। নিবেদিতা প্রাচীন ভারতের নারী-চরিত্রের অত্যুজ্জ্বল ও অতুলনীয় আলেখ্যকে বার বার লক্ষ্য

করিতে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন—প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও ইতিহাসে নারীজাতির যে উজ্জ্বল আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া যদি স্ত্রী-শিক্ষার সম্যক ব্যবস্থা না হয়, তবে সে-শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সেই সঙ্গে নিবেদিতা, ইহাও উপলব্ধি করিতেন যে, এই বিপ্লবযুগে কেবল সনাতন-পন্থী হইয়া শুধু প্রাচীনকে ধরিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, বর্তমানের সঙ্গে প্রাচীন আদর্শকে সমন্বিত করিয়া তাহাকে আরো প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

নিবেদিতা একবার বলিয়াছিলেন :

"শিক্ষা, হায়, ইহাই তো ভারতের প্রধান সমস্যা। কেমন করিয়া প্রকৃত শিক্ষা—জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কেমন করিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্তান হিসাবে তোমাদের গড়িয়া উঠিতে হইবে, য়ুরোপের অক্ষম অনুকরণ নয়—ইহাই ত সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হইবে হৃদয়ের বিস্তার সাধন আর আত্মচেতনার উন্মেষ সাধন এবং মস্তিষ্কের উন্নতি সাধন। জগৎ ও জীবনের মধ্যে একটি জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করাই হইবে তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য।"

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—রামচন্দ্রের প্রকৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া ভবভূতি ইহা বলিয়াছেন। মহাকবির এই উক্তি নিবেদিতা-চরিত্রের পক্ষেও বর্ণে বর্ণে সত্য। কোমলে-কঠোরে তাঁহার প্রকৃতি ছিল আশ্চর্য। তাঁহার জীবনের একাধিক ঘটনার ভিতর দিয়া এই সত্যই প্রকাশ পাইয়াছে যে :

"অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে নিবেদিতা দৃপ্তা সিংহীর মত উত্তেজিতা হইয়া উঠিতেন, সে সময়ে তিনি জগতে কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহার রোষাগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে অতি গর্বিতকেও মস্তক অবনত করিতে হইত। অপরদিকে তাহার নম্রতাও অনন্ত-সুলভ ছিল। সে-নম্রতা মৌখিক

বিনয় নহে, তাহা আন্তরিক সৌজন্যতাপ্রসূত ছিল। তিনি অতি দরিদ্রের সহিত যেরূপ সসম্ভ্রম ব্যবহার করিতেন, সেরূপ ব্যবহার কেবল তাঁহাতেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটি সদা জাগ্রতভাব ছিল, সেইটিকে তাঁহার যোদ্ধভাব বলা যাইতে পারে। একদিকে তিনি যাহা বুঝিতেন, তাহার ভিতর যেমন তিল মাত্র জটিলতা বা সংশয়ের সম্পর্ক রাখিতেন না, তেমনি আবার অন্যদিকে যাহা বুঝিয়াছেন, জীবনের প্রতিক্ষণেই তাহা সফল করিবার জন্য, যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, সেইরূপ ভাবে তিনি সমগ্র অন্তরের সহিত সদা জাগ্রত থাকিতেন। সেইজন্য তাঁহার কথায় ও কাজে বিন্দুমাত্র অমিল দেখা যাইত না। মনুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধা নিবেদিতার স্বভাবগত ধর্ম ছিল। মানুষ যেন মানুষ হয়, ইহাই তিনি চাহিতেন।...সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রেম অথচ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিতে বিতৃষ্ণা—তাঁহার গুরুদেব হইতেই তিনি এই অপূর্ব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। বৈরাগ্য ও কৌমার্যের প্রতিমা নিবেদিতার জীবন একনিষ্ঠতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিবেদিতা যে-পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন সে-পথের কঠোরতা ও সিদ্ধিবিলম্ব তাঁহার নির্মল হৃদয়াকাশে কখনও বিন্দুমাত্র সংশয়মেঘের সঞ্চার করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র ধ্রুবতারকাকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি নিঃসংশয়ে আপন পথে চলিয়া গিয়াছেন। এক পূর্ণচন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্নায় তাঁহার চিত্ত মধুময় হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি মাতৃরূপে সকলকে বুকে ধরিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসা সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধরহিত ছিল, এইজন্যই উহা প্রতিদানের অপেক্ষা রাখিত না এবং অপ্রতিদানেও ম্লান না হইয়া সমভাবে উজ্জ্বল থাকিত। কখনও তিনি লোক-শিক্ষয়িত্রী; কখনও স্নেহবিগলিত জননী, কখনও কর্তব্যৈকনিষ্ঠ মায়ামমতা-বর্জিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখনও বিনীতা ছাত্রী অথবা সেবিকা, আবার কখনও বা ভগবদ্ভাবে বিভোরা।”

এমনই ভাবময়ী ছিলেন নিবেদিতা। তপস্যা ও তাঁহার জীবন যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

নিবেদিতা-চরিত্র সকল দিক দিয়াই অসাধারণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা অনন্যসাধারণ। পুরাতনের সমস্ত মাধুর্য এবং নূতনের সমস্ত

ঐশ্বর্য, লইয়াই নিবেদিতা। একটি সাম্রাজ্য-পরিচালনার প্রতিভা যাঁহার ছিল, তিনি কেমন করিয়া সামান্য একটি বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনার মধ্যে তাঁহার সকল কর্মশক্তি নিঃশেষ করিলেন—ইহা চিন্তা করিলেই সেই আশ্চর্য-চরিত্রের নারীর স্বাতন্ত্র্যটি বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সমসাময়িক কালে বাংলার তরুণ-চিত্তে আর কোন নারীই এমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই যেমন পারিয়াছিলেন নিবেদিতা। এক প্রাণময়ী নারীসত্তা, এক 'জীবন্ত বেদান্তী' এই মানবীর ভিতরে বাহিরে সর্বদা বিরাজ করিত, তাই নিবেদিতা যাহা করিতেন, তাহা কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতেই করিতেন না, তাহাতে হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া দিতেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, নিবেদিতা ভালবাসিয়াই ভারতবর্ষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, ভালবাসিয়া উমার মত তপস্যা করিয়া ভারতের আত্মস্বরূপ শিবকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে করেন নাই। লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে গুরুর নির্দেশে পুনরায় কেন্দ্রস্থ, আত্মস্থ ও জীবন্ত করিয়া তুলিবার কঠোর সাধনাতেই সার্থক নিবেদিতার আত্মনিবেদন। ত্যাগ, তপস্যা ও সেবার দীপ্তিতে তিনি সত্যই আমাদের নবজাগরণকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন।

নিবেদিতার সাহিত্য-সৃষ্টি? তাহাও বিস্ময়কর। ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা, চারুকলা এবং রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁহার দান মহিমময় ও সুদূরপ্রসারী। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার রচনার কথাই মনে পড়ে পরিমিত হইলেও, তাঁহার রচনা শাণিত স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল এবং চিন্তার গভীরতায় শিক্ষাপ্রদ। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতা বিষয়ে প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, ভারতপ্রেম—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তানায়কদের পরম শ্রদ্ধার বিষয়

ছিল। তাঁহার রচিত বারখানি গ্রন্থের মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। য়ুরোপীয় ভাব ও তেজ দুই-ই আত্মসাৎ করিয়া আপন প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে নিবেদিতা যে ভাবে ভারতীয় ভাব, ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় আদর্শকে তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে বিকশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরকালের সম্পদ হইয়া রহিবে। নিবেদিতার সমগ্র রচনার পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন[১]। তাঁহার বহুমুখী কর্মের গতি অনুসরণ করা বা তাহার যথাযথ বিবরণ দেওয়া যেমন সহজ নহে, তেমনি তাঁহার বহুমুখী সাহিত্য-সৃষ্টির সম্যক্ পরিচয় কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া সেই চেষ্টা হইতে আপাতত বিরত রহিলাম। এখানে শুধু ইহাই উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, ধর্ম, ইতিহাস, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, অর্থ-নীতি, লোককাহিনী, পুরাণ, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ভারতের তীর্থ-মহিমা, ভারতের নারী—এমন কোনো বিষয় নাই যাহা নিবেদিতা আলোচনা করেন নাই। জীবনের যে পনেরো বৎসর তিনি এই দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা ছিল নিরলস কর্মের জীবন।

তাঁহার বারখানি গ্রন্থের মধ্যে চারখানি সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম, 'দি মাষ্টার য়্যাজ আই স হিম'; দ্বিতীয়, 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ'; তৃতীয়, 'ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম্'; চতুর্থ, 'দি ফুট্‌ফলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি'। এই চারখানির মধ্যে প্রথমখানিই নিবেদিতার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। জগৎ-সাহিত্যে মানবাত্মার এক অপূর্ব আত্মকাহিনী হিসাবে এই গ্রন্থ অমর হইয়া থাকিবে। এই কাহিনীতে বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে যে আত্মিক সম্পর্ক, তাহা অনবদ্য ভাবে ও অনুপম ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুরু ও শিষ্যের

১ লেখকের 'নিবেদিতা-নৈবেদ্য' দ্রষ্টব্য

চিরন্তন আত্মিক সম্পর্কের গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ আলেখ্য এই বইখানি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাহিত্যের ইতিহাসে তো বটেই, এমন কি, পৃথিবীর আধ্যাত্মিক সাহিত্যের ইতিহাসেও নিবেদিতার এই বইখানি তাই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পুস্তকখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন 'হিবার্ট জার্নাল' পত্রিকার এক সংখ্যায় ইহার সমালোচনাপ্রসঙ্গে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টি. কে. চেইনী লিখিয়াছিলেন :

"নানা ধর্মশাস্ত্রের পরই ধর্ম-বিষয়ক যত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আছে তাহাদের ন্যায় অমূল্য এই গ্রন্থ। ইহা 'দি কনফেসনস্ অব সেণ্ট আগস্তিন' এবং সেবেতিয়ার প্রণীত 'লাইফ অব সেণ্ট ফ্রান্সিস্' নামক বই দুইখানির পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য।"

শুধু কী তাহাই? বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের অপূর্ব ভাষ্য এই বইখানি। নিবেদিতা দেখাইয়াছেন যে, স্বামীজি সর্বাগ্রে দেশের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই আনিতে চাহিয়াছিলেন শিক্ষার বিপ্লব, কেন না তিনি জানিতেন যে মানুষ তৈরি হইলেই তবে অন্য বিপ্লব সম্ভবপর হয় এবং স্বাধীনতার বনিয়াদ দৃঢ় হইয়া থাকে। স্বামীজির বিশ্বাস ছিল ভারতের সুপ্ত প্রাণকে জাগাইবার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন আছে। নিবেদিতা এই গ্রন্থে বিবেকানন্দের সেই বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারার একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

•

'দি ওয়েব্ অব্ ইণ্ডিয়ান লাইফ' পুস্তকে নিবেদিতা ভারতবর্ষের জীবনধারার এমন সুনিপুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্বে কোন ভারতবাসীও করিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে নিবেদিতাকে পথিকৃৎ বলিতে পারা যায়। রমেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এক বাক্যে বইখানির প্রশংসা করেন। ভারতের চিরন্তন ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মাধুর্যভরা ছোটখাট আচার-অনুষ্ঠানের যোগ

কত গভীর, এই পুস্তকে নিবেদিতা তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। কবি ইহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হন যে নিজে ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া নিবেদিতাকে সম্মানিতা করিয়াছিলেন। ভূমিকা-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন :

"বহিরাগত দর্শকের উদ্ধত কৌতূহল লইয়া ভগিনী নিবেদিতা আমাদের মধ্যে আসেন নাই, কিম্বা তিনি উচ্চ আসনে বসিয়া ক্ষণকালের দৃষ্টি দিয়া দূর হইতে ভারতীয় সমাজ-জীবনের পরিচয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি আমাদের মধ্যে আমাদের মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন, ঘনিষ্ঠভাবে জনসাধারণের সহিত মিশিয়াছিলেন, তাই তিনি তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনধারার সহিত গভীরভাবে পরিচিত হইতে পারিয়াছিলেন। আদর্শবাদী নিবেদিতার দৃষ্টিতে তাই ভারতীয় অন্তঃপুরের সকল মর্মকথা নিখুঁত ভাবেই ধরা পড়িয়াছিল এবং আপন অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি উহার একটি নূতন ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লইয়া বিরচিত 'ক্র্যাডল্ টেলস্ অব হিন্দুইজম্' বইখানি লিখিয়া নিবেদিতা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের গল্প পড়িবার জন্য বিদেশী বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ঈসপের গল্প বা আরব্য উপন্যাসের গল্প অপেক্ষা ছেলেমেয়েদের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের পক্ষে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলি যে বিশেষ উপযোগী, তাহা এই বইখানি পাঠ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহার প্রতিভা যে জিনিস স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ইতিহাসকে এক নূতন ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করিয়াছেন নিবেদিতা তাঁহার 'দি ফুটফলস্ অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি' বইতে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের পাঠ তিনি বহু যত্নে গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে। অজন্তা, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, বারাণসী

প্রভৃতি প্রবন্ধে নিবেদিতার ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধ লক্ষ্য করিবার মতন। প্রচলিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সহিত নিবেদিতার এই জাতীয় রচনার একটি পার্থক্য আছে। বস্তু ছাড়া ইতিহাসের আর একটি দিক আছে—সে-দিক ইতিহাস-আশ্রিত ঐতিহ্যের দিক, রসের দিক। নিবেদিতা ইতিহাসের বস্তু-অংশকে যেমন গবেষকের দৃষ্টিদ্বারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তেমনি তিনি হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ইতিহাস-রসকে। নিবেদিতার ঐতিহ্যনিষ্ঠ শিল্পীমন প্রাচীন ভারতের একাধিক ঐতিহাসিক স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ভাবচ্ছটার বর্ণ-বিচিত্র কলাপ বিস্তার করিয়াছে—বাসনায় ও বেদনায় সে রূপ তুলনাহীন। এই পুস্তকের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে অতীত-স্মৃতির মনোরম পর্যালোচনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ধর্ম-জীবনের পরিচয়-রেখা সুস্পষ্ট। নিবেদিতার চক্ষে প্রত্যেকটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান ভারতবর্ষের ধর্ম-জাগরণ ও শিল্পবৈভবের নিদর্শন। বর্তমানের হৃতগৌরব ভারতের সহিত ঐশ্বর্যময় প্রাচীন ভারতের তুলনা দিতে যাইয়া নিবেদিতার অকৃত্রিম ভারতানুরাগের কথাই বেদনার ভাষায় রূপ পাইয়াছে এই পুস্তকের প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধে। ভুবনেশ্বরের প্রস্তরপুঞ্জে নিবেদিতা অতীত ইতিহাসের স্তম্ভিত মূর্তি দেখিয়াছেন। রাজগৃহের পরিত্যক্ত জীর্ণ ধ্বংসস্তূপ অবলম্বন করিয়া নিবেদিতার ভাষা ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে। ইতিহাসের পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপে নিবেদিতা সর্বত্রই ভারতীয় সভ্যতার পতন-অভ্যুদয়ের গভীর সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিয়া উহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতিহাস-সাহিত্যে নিবেদিতার এই বইখানির তুলনা নাই।

নিবেদিতার জীবন-বিধাতা তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত এই ভারত-তীর্থে। নিবেদিতার জীবন তাই এক

মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত। তিনি যেন ভারতের বীণাপাণি'। বাধামুক্ত সর্বসংস্কারমুক্ত চিত্তে তিনি ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের শিক্ষায়-দীক্ষায় ভারতীয় সভ্যতাকে হিন্দু-সভ্যতা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাই না তিনি ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যথার্থই সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় এবং অখণ্ড বিশ্বাসে জগৎসভায় তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। নিবেদিতার জীবন শুধু আত্মনিবেদনেই সার্থক হয় নাই, উহা কর্মেও সার্থক হইয়াছিল। সমসাময়িক বহু প্রতিভার আলোকের সহিত আপন প্রতিভার আলোক মিলাইয়া দিয়া নিবেদিতা সত্যই একটি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

সে-ইতিহাস কোন দিনই মুছিবার নহে।

॥ প্রমাণ-পঞ্জী ॥

এই পুস্তক রচনা করিতে যে-সব পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ লওয়া হইয়াছে, এবং স্থান-বিশেষে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, ঐইখানে সেইগুলির নাম উল্লেখ করা হইল।

The Master As I Saw Him, Notes of Wanderings with Swami Vivekananda, The Web of Indian Life, Hints on National Education,. Footfalls of Indian History—Sister Nivedita; Myths of Hinduism and Buddhism—Sister Nivedita & Ananda K. Coomaraswamy; Ideals of the East—Kakusa Okakura; The Life of Swami Vivekananda—Eastern & Western Disçiples; Vivekananda - Romain Rolland, Swami Vivekananda—Dr. Bhupendra Nath Dutta; Lady Minto's Journal; Sri Aurobindo on Himself; Character Sketches - Bipin Chandra Pal, The Dedicated (A biography of Nivedita) - Lizelle Reymond. *Periodicals*: Dawn, Bande Mataram, Karmayogin, Indian World, Indian Mirror, Bengali, Amrita Bazar Patrika, Modern Review, Statesman, Prabuddha Bharat and Hindusthan Standard.

পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; পত্রাবলী—জগদীশচন্দ্র বসু; পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ; মার্কিনে চারিমাস—বিপিনচন্দ্র পাল; লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত; ভগিনী নিবেদিতা—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী; সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ; রবীন্দ্রজীবনী (৩য় খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা—শান্তা দেবী। নিবেদিতা—শ্রীসরলাবালা সরকার। সাময়িক পত্র: যুগান্তর, সন্ধ্যা, প্রবাসী, উদ্বোধন, জয়শ্রী, ও সমকালীন।

॥ এই লেখকের ॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র
কামালপাশা ছোটদের ছত্রপতি ছোটদের
অরবিন্দ ছোটদের বার্ণার্ড শ ছোটদের
বিবেকানন্দ ছোটদের গৌতম বুদ্ধ
লীলা-কঙ্ক কাজলরেখা মহাচীনে শ্রীনেহরু
নিবেদিতা নিবেদিতা-নৈবেদ্য গৌতম বুদ্ধ
SISTER NIVEDITA OUR BUDDHA

॥ পরবর্তী বই ॥

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস নানাসাহেব
বিদ্যাসাগর মানুষের আত্মকথা